মাসুদ রানা

মহাবিপদ সঙ্কেত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মহাবিপদ সঙ্কেত

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

একজন সিলেব্রিটি যেভাবে ব্যগ্র রিপোর্টারদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যান, সাদা থোকা থোকা মেঘগুলোকে ঠিক সেভাবেই সরিয়ে উঁচু আসমান দিয়ে উড়ছে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান ৭৪৭ বোয়িং। দুশো বিশ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। পাঁচতলা বাড়ির ছাদের সমান উঁচুতে ককপিট, তৈরি করতে সব মিলিয়ে যন্ত্রাংশ লেগেছে ষাট লাখ।

প্রকাণ্ড প্লেনটা নিঃসঙ্গ নয়। ওটার পিঠে অর্থাৎ ফিউজিলাজের উপর জুত করে বসে আছে একটা স্পেস শাটল। বোয়িং তো শুধু দুনিয়াকে চক্কর দিতে পারে, কিন্তু ওই স্পেস শাটল চাঁদ তো বটেই, এমনকী মঙ্গলগ্রহ থেকেও এক-আধবার ঢু মেরে আসতে পারবে। অর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছে খেয়াযানটা। বোয়িং-এর পিঠে ওটার স্থূল কাঠামোর আউটলাইন দেখা যাচ্ছে, গায়ে হিন্দি আর ইংরেজিতে বড়-বড় হরফে লেখা—পক্ষিরাজ। দূর থেকে তাকালে শাটলটাকে দৈত্যাকার মাছ মনে হবে, একটা তিমির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কন্ট্রোল কেবিনের ভিতর ক্যাপটেন সিধুভাই ত্রিপাঠির অস্থির চোখ জোড়া একাধিক ইন্সট্রুমেন্টস প্যানেলের ডায়াল, কাঁপা-কাঁপা কাঁটা, ঝাঁক-ঝাঁক রঙিন আলো আর ডজন-ডজন অন-অফ করা সুইচের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব ঠিক আছে, কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। সাতশো সাতচল্লিশ নিজে থেকেই উড়ছে। অনভ্যস্ত বোঝা বহন করবার কারণে বিপজ্জনক কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। সামান্য একটু হলেও বিস্মিত ক্যাপটেন, তবে স্বস্তিবোধটুকু পরম পাওয়া।

আসলে তাঁর বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই, সেই উনিশশো সাতাত্তর সাল থেকে ৭৪৭ বোয়িং-এর রয়েছে স্পেস শাটল বহন করবার ঐতিহ্য; শুধু তাই নয়, বোয়িং-এর পিঠ থেকে স্পেস শাটল লঞ্চ করবার ঘটনাও প্রচুর। তিনি উপলব্ধি করলেন অ্যারোপ্লেন হিসেবে ৭৪৭-এর কোন তুলনা হয় না। কিন্তু তারপরই আবার সেই পুরানো প্রশ্নটা ফিরে এল—স্পেস শাটল পক্ষিরাজকে বাংলাদেশে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? কোন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে? কেন? তাতে কার কী লাভ? স্পেস শাটল দেখে কিছু কি শিখবার আছে বাংলদেশীদের? নাহ্! ভারতের গোটা মহাশূন্য-কর্মসূচিই যেখানে বাজেট ঘাটতি আর স্যাবটাজের কারণে মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছে সেখানে এ-ধরনের প্রদর্শনী চরম বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। তা হলে?

ক্যাপটেনের পাশে বসা ফার্স্ট অফিসার আশিস কাপুর হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে শুকনো ঠোঁট জোড়া একটু চুষে ভিজিয়ে নিলেন। প্লেন নয়, এই মুহূর্তে

প্রেমই তাঁর মন দখল করে রেখেছে। মোহিনী সাকসেনা আর তাঁর ভালবাসার বয়েস বর্তমানে তিন বছর। মোহিনী একজন নামী ফ্যাশন ডিজাইনার, সেজন্যই বোধহয় তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে নতুন-নতুন কাপড় পরে মনের মানুষটিকে চমকে দেওয়া; অথচ আশিস কাপুর মানুষের তৈরি কোন ডিজাইন নয়, ত্বকে মোড়া রক্তমাংসের যে ডিজাইন প্রকৃতি তৈরি করে দিয়েছে সেটার নিরাবরণ সৌষ্ঠব দেখতেই বেশি উৎসাহী।

কিন্তু তাঁর তিন বছরের সাধনা সাফল্যের মুখ দেখেনি। সব কুছ হো গা, মাগার 'শাদীকে বাদ'–অর্থাৎ সবই হবে, তবে বিয়ের পরে, এ-কথা বলে তাঁকে হতাশায় ডুবিয়ে দাবিয়ে দিয়েছে মোহিনী। অগত্যা অবশেষে বিয়েতে রাজি হয়েছেন আশিস, এনগেজমেন্টও হয়ে গেছে–আগামী মাসের তৃতীয় হপ্তার রোববারে মুম্বাইয়ের অফিসার্স ক্লাবে ওদের বিয়ের দিন পাকা। তারপর অবিশ্বাস্য এবং কাকতালীয়ভাবে একটা নয়, দু-দু'টো ঘটনা ঘটল। বোয়িং নিয়ে ঢাকায় আসছেন আশিস, এটা মোহিনী জানত; কিন্তু আশিস জানতেন না যে ঢাকার একটা ফাইভ স্টার হোটেলে ফ্যাশন শো-র আয়োজন করেছে মোহিনী। এটা একটা চমক। তারচেয়ে বড় চমক, মোহিনী তাঁকে জানিয়েছে ঢাকায় ওর হোটেল স্যুইটেই থাকতে পারবেন তিনি। অর্থাৎ বিয়ের আগেই আশিসের স্বপ্নপূরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

'একা একা কী মনে করে হাসছ, কাপুর?' হঠাৎ ক্যাপটেন ত্রিপাঠি জানতে চাইলেন।

চেহারা লালচে হয়ে উঠল আশিসের। 'না, মানে, এমনি...'

'শুনলাম মোহিনী নাকি ঢাকায় শো করছে?'

'ও, জানেন তা হলে–হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন, ক্যাপটেন।' প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি বদলাবার জন্য ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন ফার্স্ট অফিসার আশিস। 'আমরা কেমন এগোচ্ছি, মিস্টার সামাদ?'

ভারতীয় স্পেশ শাটল পক্ষিরাজকে তামিল নাড়ুর মহাকাশ রিসার্চ সেন্টার থেকে পথ দেখিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসবার জন্য বাংলাদেশ বিমান-এর নেভিগেশন অফিসার শাইখ সামাদকে পাঠানো হয়েছিল। আশিস কাপুরের প্রশ্ন শুনে প্লটার থেকে মুখ তুললেন সামাদ। 'মন্দ নয়, মিস্টার কাপুর। অর্ধেক পথ পার হয়ে এসেছি। পিছনে যে-রকম বাতাস পাচ্ছি, শেডিউলের দশ মিনিট আগেই জিয়া ইন্টারন্যাশনালে পৌঁছে যাব আমরা।'

'গুড,' মন্তব্য করলেন ক্যাপটেন ত্রিপাঠি।

নেভিগেশন অফিসার শাইখ সামাদ নিজের চার্টের দিকে তাকালেন। পনেরোশো মাইল দূরত্ব পাড়ি দিচ্ছেন তাঁরা, রাত ও দিনের মধ্যবর্তী সময়ের রহস্যময় আলোয় বঙ্গোপসাগরের কিনারা নীচে ঝাপসামত দেখা গেলেও, উপকূলীয় কোন শহর চিনবার উপায় নেই। তবে চার্ট দেখে তিনি বুঝতে পারছেন যে অন্ধ্রপ্রদেশকে পিছনে ফেলে এসেছে সাতশো সাতচল্লিশ। বাঁয়ে এই মুহূর্তে

রয়েছে উড়িষ্যা। এরপরই পাশ কাটাবে পশ্চিমবঙ্গকে। তারপর দুই দেশের সুন্দরবনের উপর দিয়ে খুলনা হয়ে ঢাকা।

শাইখ সামাদ তাঁর ছোট্ট মা-মণির কালো দীঘল চোখ আর ফোলা-ফোলা গাল কল্পনায় দেখতে পেয়ে আপনমনে মিটি-মিটি হাসছেন। একমাত্র মেয়ের জন্য দুই সুটকেস ভর্তি খেলনা, পুতুল, চকলেট আর জামা-কাপড় কিনেছেন তিনি। তারপর হাসিটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। বিমান-এর চাকরি, ডিউটি খুব কড়া, মা মরা মেয়েটিকে তিনি যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না; অথচ স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এই মেয়ের কথা ভেবেই তিনি আর বিয়ে না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মেয়ে অবশ্য তার নানীর কাছে যথেষ্টই আদর-যত্ন পায়, তারপরও…একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক।

সুখ-দুঃখ কার না আছে। ব্যতিক্রম নন ক্যাপটেন সিধুভাই ত্রিপাঠিও। তাঁর সমস্যা একদিকে যেমন জটিল ও করুণ, অপর দিকে তাঁর মত সৌভাগ্যবান মানুষ খুব কম আছে। তাঁরও একটি মাত্র সন্তান—সাতাশ বছরের সুপুরুষ লালুভাই ত্রিপাঠি। ঠিক জানা যায় না, সম্ভবত কিশোর বয়সে কোন যুবতীর একতরফা প্রেমে পড়েছিল ছেলেটা। বিয়ে হয়ে স্বামীর সঙ্গে বিদেশে কোথাও চলে যায় মেয়েটা।

পড়াশোনায় মন না বসায় পর-পর দু'বছর ফেল করল লালু। রাতে ঘুমাতে পারে না, দিনের বেলা একা-একা কথা বলে। ডাক্তার দেখানো হলো। তাঁরা বললেন, মানসিক বৈকল্যের প্রাথমিক লক্ষণ, তবে আদর-যত্ন পেলে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ভাল হওয়া দূরের কথা, দিনে-দিনে অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকল। এই সময় মাথায় প্রায় বাজ ফেলে দিয়ে তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী নিজের চেয়ে বয়সে ছোট এক তরুণের হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

তিন মাস পর কানাডা থেকে ডিভোর্স লেটার পান সিধুভাই ত্রিপাঠি। জয়শ্রী ক্ষমা চেয়েছে, স্বীকার করেছে স্বামী ও অসুস্থ সন্তানকে অসহায় অবস্থায় ফেলে এসে অনেক বড় অপরাধ করেছে সে, তবে তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। আরও বলেছে, নিজের জীবনকে অসম্ভব ভালবাসে সে, এতটাই বেশি, যে সুখী হওয়ার প্রয়োজনে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ করতেও তার বাধত না। ইঙ্গিতে জয়শ্রী হয়তো বোঝাতে চেয়েছে, নিজের সুখের জন্য পাগল সন্তানকে খুন করে ফেলত সে, তাই একজনের হাত ধরে চলে যাওয়াটাকেই অনেক ভাল মনে করেছে। সিধুভাই ত্রিপাঠিও তাই দুঃখ পেলেও খুশি—তাঁর ছেলে মাকেই শুধু হারিয়েছে, মায়ের হাতে খুন তো হতে হয়নি তাকে।

তারপর ঘটল অকল্পনীয় একটা ঘটনা। যে ডাক্তার দীর্ঘদিন লালুর চিকিৎসা করছিলেন, সেই রাধিকা ঝঙ্কার, সিধুভাই ত্রিপাঠির এরকম বিপদের সময় স্বেচ্ছায় বাড়িতে এসে তাঁর রোগীকে সময় দিতে লাগলেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও কখনও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ধীরে-ধীরে ব্যাপারটা জানা গেল। রাধিকা ঝঙ্কার নিঃসন্তান, তাঁর স্বামী দশ বছর আগে মারা গেছেন। মা হয়ে নিজ সন্তানকে

ফেলে চলে গেছে জয়শ্রী, এ-কথা শুনে নিঃসন্তান ঝঙ্কারের মাতৃহৃদয় কেঁদে ওঠে। সেই থেকে রোগী হিসেবে নয়, আপন সন্তানের মত লালুর চিকিৎসা আর যত্ন নিতে শুরু করলেন তিনি।

এভাবেই চলতে থাকে ব্যাপারটা। ডাক্তার রাধিকা ঝঙ্কারের সাধনায় দু'বছরের মধ্যে লালুর আশাতীত উন্নতি হয়। এরপর আরও উন্নততর চিকিৎসার জন্য লালুকে তিনি বিদেশে নিয়ে যেতে চান।

আমেরিকায় চিকিৎসা করিয়ে লালু পুরোপুরি সুস্থ না হলেও, সে এখন কারও বোঝা নয়–নিজের সব কাজ নিজেই করতে পারে, টিভিতে কার্টুন দেখে হাসে, পার্টি উপলক্ষে বাবার বন্ধুরা বাড়িতে এলে সে-ই দরজা খুলে দেয়, কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। ডাক্তারকে মা বলে সে, এই মা বলে ডাকার অধিকার বাবাই তাকে পাইয়ে দিয়েছেন–আমেরিকায় থাকতে ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছেন তিনি। বলা বাহুল্য যে দু'জনেরই শুভাকাঙ্ক্ষীরা খুশি হয়েছেন; সবাই জানত এক সময় এটা ঘটবেই।

তো, সব মিলিয়ে সিধুভাই ত্রিপাঠি নিজেকে সুখী একজন মানুষ ভাবতেই পারেন।

তাঁরা সবাই ভালমানুষ। কিন্তু তাঁরা জানেন না…

দেখা যাক পক্ষিরাজ-এর ভিতর কী ঘটছে।

স্পেস শাটলের লোয়ার ডেক। অভ্যস্ত যে-কেউ কম্পন আর অস্পষ্ট শব্দটা টের পেয়ে যেত। সবই ঘন অন্ধকারে মোড়া। শাটলের গোটা কাঠামো কাঁপছে। তারপর অন্য এক ধরনের শব্দ শুরু হলো। ভোঁতা, চাপা একটা হিস্-হিস্, যেন টিনের একটা কৌটার ভিতর আতসবাজি বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু শব্দটা থামছে না, কোন বিস্ফোরণও ঘটছে না। জোরাল হলো না, আগের মতই চাপা হিস্-হিস্, তবে ধীরে-ধীরে অন্ধকারে ফুটে উঠল আলোর একটা আভা। ওয়াল লকার-এর এক কোণে সরু একটা রেখা। আলোর ওই রেখা ক্রমশ লাল, তারপর সাদা হয়ে উঠে তালা আর তালাকে জায়গামত বসিয়ে রাখা ক্যাচ-এর চারদিকে সরু ফাটল তৈরি করছে। কালো ধোঁয়ার সরু একটা রেখা তৈরি হলো। পনেরো সেকেন্ড পর তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করে খুলে গেল লকার।

যে আলো বা আগুন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল, নিভলও সেটা অতি দ্রুত। তারপর লাল হয়ে ওঠা পাতটাও রঙ হারাল। পক্ষিরাজের লোয়ার ডেক আবার ঢাকা পড়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে। শাটল আগের মতই কাঁপছে। এবার আরেক রকম শব্দ হলো–কাপড়ের খসখস। লকার থেকে বাইরে বেরুল একজোড়া পা। টর্চের সরু আলো অন্ধকারকে ভেদ করল, তারপর একটা লেযার ওয়েল্ডার ছুঁড়ে ফেলা হলো কাছাকাছি বাঙ্ক লক্ষ্য করে। অসহিষ্ণু আঙুলের মত আলোর সরু টানেল এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে কী যেন খুঁজল। পেয়েও গেল সঙ্গে সঙ্গে–উল্টোদিকের লকার আর লকারের ওপেনিং ডিভাইস। দ্রুত চাপ দিয়ে খোলা হলো ওটা। বেরিয়ে এল আরও দুটো পা।

নিষ্প্রভ আলোয় একজোড়া ভূত মনে হচ্ছে ওদেরকে। গায়ে আঁটসাঁট হয়ে আছে কালো ইউনিফর্ম, ঢেকে রেখেছে পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। ইউনিফর্মে জোড়া হয়েছে টিউবসহ প্রেশারাইজড অক্সিজেন মাস্ক। আই লেভেলে রিইনফোর্সড গ্লাস প্যানেল আছে, সেগুলো থেকে বেরিয়ে টিউবগুলো পৌঁছেছে তাদের পিঠে আটকানো সিলিন্ডারে। কোন রকম দ্বিধা বা সময় নষ্ট না করে দু'জন একসঙ্গে প্যাঁচানো সিঁড়ির দিকে এগোল। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় সামনে থাকল প্রথম লোকটা। তার মাথার উপরেই রয়েছে স্পেস শাটল পক্ষিরাজের কন্ট্রোল কেবিন।

৭৪৭ মাটি থেকে পঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ছে। ককপিটে বসে দুই হাত এক করে ঘষছেন ফার্স্ট অফিসার আশিস কাপুর। 'কেমন এগোচ্ছি, মিস্টার সামাদ?'

'এই তো, পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলছি।'

'শেডিউল ঠিক হ্যায় না, ভাইসাব?' মোহিনীর মুখটা স্মরণ করে হাসছেন কাপুর, বোধহয় খেয়ালই করছেন না যে হিন্দিতে কথা বলছেন তিনি।

'বারো মিনিট এগিয়ে,' বাংলায় জবাব দিলেন শাইখ সামাদ।

ফার্স্ট অফিসার আরও কয়েক মুহূর্ত হাত কচলালেন। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন হোটেলের স্যুইটে অঘোরে ঘুমাচ্ছে মোহিনী। খুব বেশি হলে সকাল সাতটায় ওই স্যুইটের দরজায় নক করবেন তিনি। হঠাৎ বাধা পড়ল তাঁর চিন্তায়। ঝট করে সামনের দিকে ঝুঁকলেন।

'কী হলো?' জানতে চাইলেন ক্যাপটেন।

কন্ট্রোল প্যানেলের ডান প্রান্তে লাল একটা আলো ঘন-ঘন জ্বলছে আর নিভছে।

'শাটলের রকেট স্টার্ট নিচ্ছে!'

'নো! নেভার! সিস্টেমে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি আছে। সার্কিট চেক করো!'

ফার্স্ট অফিসার ক্যাপটেনের নির্দেশ পালন করবার সময় পেলেন না। কান ফাটানো একটা গর্জন শোনা গেল, সেই সঙ্গে ৭৪৭ বোয়িং এমন প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো যেন মাঝ আকাশে অদৃশ্য একটা হাত ঘুসি মেরেছে তাকে। থরথর করে কাঁপছে ককপিট। গর্জনের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে আরও।

'কী ঘটছে!'

'ভাগওয়ানকে লিয়ে···

'ও, মাই গড!' শাইখ সামাদ জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ধাক্কাটা হজম করবার চেষ্টা করছেন। 'আপনাদের শার্টল পক্ষিরাজ তো টেক-অফ করছে!'

'এ সম্ভব নয়–' ভয়ঙ্কর বাস্তবতা গলাটাকে যেন চেপে ধরল। একাধারে ভৌতিক অথচ যান্ত্রিক একটা আর্তনাদ ওঁদের কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার উপক্রম করল। তারপর যেন তিন জোড়া চোখকে অন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশে অকস্মাৎ ওঁদের মুখের সামনে খুলে দেওয়া হলো একটা ব্লাস্ট ফারনেসের দরজা।

স্পেস শাটল পক্ষিরাজের অরবিটাল ইঞ্জিনগুলো পূর্ণ শক্তি নিয়ে জ্বলে উঠেছে, ফলে আগুনের প্রকাণ্ড একটা গোলক চোখের পলকে মুড়ে ফেলল ককপিটকে, ক্যাপটেন সহ ক্রুদের আর্তচিৎকার থামিয়ে দিল মাঝপথে। যেন মারাত্মক হুল ফোটাবার পর একটা পোকা ওড়ার জন্য তৈরি, পক্ষিরাজ মাঝ-আকাশে থরথর করে কাঁপছে, লেজ থেকে বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত গ্যাস ৭৪৭-এর ককপিটকে এখনও বিরতি না দিয়ে পোড়াচ্ছে। তারপর অকস্মাৎই সগর্জনে প্রায় খাড়া হয়ে মহাকাশের দিক লক্ষ্য করে ছুটল ওটা। ৭৪৭-এর জ্বলন্ত নাক নিচু হলো, আগুনের শিখা লাল চাদরের মত ফিউজিলাজের দু'পাশ ঢেকে দিচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা লম্বা, জ্বলন্ত কয়লার মত আকাশ থেকে খসে পড়তে শুরু করল ওটা।

পাথুরে মূর্তি বললেই হয়, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান তাঁর ছয়তলার অফিস কামরার জানালার সামনে পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা; কাছে এবং দূরে কাঁচ, কংক্রিট আর ডিশ অ্যান্টেনার একটা জঙ্গল। চোখে সবই ধরা পড়ছে, কিন্তু কিছুই তিনি দেখছেন না। টের পেলেন বাম চোখের নীচে একটা শিরা বার কয়েক লাফিয়ে স্থির হয়ে গেল। পিছনে খুট-খাট, অস্পষ্ট আওয়াজ হচ্ছে; ডেস্কের জিনিস-পত্র যতটা সম্ভব গুছিয়ে রাখছে প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা। সেদিকে তাঁর মন নেই।

মন নেই গোমড়া মুখো আকাশের দিকেও। রাহাত খান খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। তারপর যখন পায়চারি শুরু করলেন, চেম্বার থেকে তার আগেই বেরিয়ে গেছে ইলোরা। হঠাৎ কী মনে করে ডেস্কের সামনে থেমে টেলিফোনটার দিকে তাকালেন, যেন তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এইমাত্র সতর্ক করে দিল যে ওটা এখনি বাজবে। রিসিভারের ঠিক নীচে লাল একটা আলো আছে, ওটা শুধু তখনই জ্বলবে যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোন টপ সিক্রেট কল আসবে। আর জ্বলবে প্রধানমন্ত্রী মারা গেলে বা কোন মন্ত্রী খুন হলে।

রাহাত খান আবার পায়চারি শুরু করতে যাবেন, এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল–লাল আলোটাও জ্বলছে।

পালস্ রেট এক চুল বাড়েনি, বাক্স থেকে একটা চুরুট বের করে ধীরেসুস্থে ধরালেন বিসিআই চিফ, তারপর রিসিভার তুলে বললেন, 'রাহাত খান।' মন দিয়ে, প্রায় ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে অপর প্রান্তের বক্তব্য শুনে যাচ্ছেন। তাঁর মুখের কোণ আর কপালের রেখাগুলো গভীরতর হচ্ছে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বৈশাখ,' এক সময় বললেন তিনি। 'ব্যাপারটা আমরা দেখছি।' ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর হাত বাড়ালেন ইন্টারকমের দিকে।

ইলোরার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ইয়েস, সার?'

বড় করে একটা শ্বাস নিলেন রাহাত খান। কণ্ঠস্বরে কোন আবেগ বা উদ্বেগ, কিছুই থাকল না। 'ইলোরা। এমআরনাইনকে দরকার আমার। কোথায় আছে

খোঁজ নাও। ওর প্লেন যদি এরইমধ্যে টেক-অফ করে থাকে, আমার কথা বলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করো।'

'ইয়েস, সার!'

দুই

'এই যে, রানা! এসো।' ইলোরার চোখে শুধু গভীর স্বস্তি নয়, সাদর অভ্যর্থনার শশব্যস্ত একটা ভাবও ফুটে উঠল।

কামরার ভিতর ফ্লাওয়ার ভাস থেকে ছড়ানো গোলাপের সুবাস তো আছেই, ভারী মিষ্টি অচেনা একটা সেন্টের ঘ্রাণও পেল মাসুদ রানা। তবে উদ্বেগ আর উত্তেজনায় এমন থরহরি কম্প অবস্থা যে এ-সব ওকে স্পর্শ করছে না। 'প্লেন থেকে আমাকে নামিয়ে আনা হয়েছে, ইলোরা। ব্যাপারটা কী?'

ইলোরা মাথা নত করে আছে, ইন্টারকমে ঘোষণা করছে ওর আগমন-বার্তা। ফলে তৎক্ষণাৎ কোন সাড়া পাওয়া গেল না। টিপ দিয়ে বাটন-সুইচটা অফ করল সে। 'সত্যি বলছি, কিচ্ছু জানি না। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিমন্ত্রী ভদ্রলোক যে-কোন মুহূর্তে এসে পৌঁছাবেন। বস্ তোমাকে সোজা ভেতরে ঢুকতে বলে দিয়েছেন।' শেষ কথাটা রানার পিঠের দিকে তাকিয়ে বলতে হলো ইলোরাকে, কারণ এরইমধ্যে রাহাত খানের চেম্বারের সামনে পৌঁছে গেছে ও। ক্রিং-ক্রিং করে ডেস্কের একটা টেলিফোন বেজে উঠল। 'সোহেল জানে তুমি ফিরেছ?'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'এয়ারপোর্ট থেকে তা হলে আমাকে তুলে আনল কে? দেখো, ওই শালাই হয়তো টেলিফোন করেছে: তোমাকে নিষেধ করবে, যাতে আমাকে কিছু না বলো।'

উত্তর দেওয়ার সময় পেল না ইলোরা, দরজা খুলে বসের চেম্বারে ঢুকে পড়ল রানা; নিজের পিছনে কবাটটা প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল।

কামরার চেহারা পরিচিত, কোথাও এতটুকু বদলায়নি। গাঢ় সবুজ কার্পেট ঠিক যেন তাজা ঘাস অথচ তুলোর মত নরম, সেই দূরপ্রান্তের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেয়ালটার সবটুকু ফিরোজা রঙের পর্দায় ঢাকা। ভিতরে ঝুলে আছে বহুরঙা পৃথিবী; মেহগনি কাঠের ডেস্কটা ওই মানচিত্রের একপাশে, রিভলভিং চেয়ারে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন এসপিওনাজ জগতের প্রবাদপুরুষ। এয়ারকুলার কোন শব্দ করছে না, তবে ঘরটাকে হিম করে রেখেছে। তারপরও মাথার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে কেন?

অসহিষ্ণু একটা হাত নেড়ে ডেস্কের সামনের চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন রাহাত খান। 'বসো। শুনেছ নিশ্চয় যে, তোমার ত্রিপুরা অ্যাসাইনমেন্ট

বাতিল করা হয়েছে? ওখানে জাহিদ যাবে।'

'কই, না, আমি তো...'

'কিছু জানো না, এই তো? বেশ, এখন জানলে।' অকারণ ধমকের সুরে কথা বলছেন রাহাত খান। 'ওই কাজটা থেকে সরিয়ে এনে অন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হচ্ছে তোমাকে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।' রানাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে বলেই বললেন। 'এরকম আগেও হয়েছে। যাই হোক, এবার কাজের কথা।' চুরুট রেখে দিয়ে পাইপে তামাক ভরতে শুরু করলেন। 'ভারতীয় স্পেস প্রোগ্রাম সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

'ওরা চাঁদ না মঙ্গল কোথায় যেন যাবে, তাই মহাশূন্যে একটা স্পেস স্টেশন বানাচ্ছে। রাশিয়ার কাছ থেকে রকেট আর স্পেস শাটলও কিনেছে। ওদের স্পেস রিসার্চ সেন্টারটা তামিল নাড়ুতে। সিকিউরিটি খুব কড়া, কারণ কারা নাকি ওদের প্রোগ্রাম স্যাবটাজ করতে চাইছে।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'এই প্রথম ওরা সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে পাকিস্তানকে দায়ী করেনি। আভাসে বরং যেন বলতে চাইছে দায়ী নাসা।'

বসকে যদি সন্তুষ্ট করতে পেরেও থাকে, রানা কোন প্রশংসা আশা করছে না; শুধু অপলক নরম চোখে খুঁজছে প্রাচীন খাঁজ-ভাঁজ আর কোঁচকানো রেখাগুলোয় কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে কি না।

'হুম।' রাহাত খানের চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। 'আর শাটলটা সম্পর্কে? বিস্তারিত কিছু জানো?'

'ওটার নাম পক্ষিরাজ,' বলল রানা। 'রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে পাঠানো যাবে। প্রথম দফায় কয়েকবার পৃথিবীকে চক্কর দেবে ওটা। তারপর অ্যাটমসফিয়ার-এ রিএন্ট্রি করবে। ল্যান্ড করবে একটা কনভেনশন্যাল এয়ারক্রাফটের স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। স্থায়ীভাবে মানুষ থাকবে, এরকম স্পেস স্টেশনকে প্রয়োজনীয় সার্ভিস দেয়ার জন্যে এ-ধরনের শাটলই দরকার।'

'ভারতীয়রা তাদের পরবর্তী স্পেস প্রোগ্রামে পক্ষিরাজকে কাজে লাগাতে যাচ্ছে। তুমি জানো ওদের ওই শাটলটা ঢাকায় আসছিল, আমাদের টেকনিকাল ব্রাঞ্চ যাতে ওটার ওপর একবার চোখ বুলাতে পারে?'

'না!' রানার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'গুড,' বললেন বিসিআই চিফ। 'তোমার জানবার কথা নয়। কারুরই জানবার কথা নয়।'

'এখন কি আমাকে বলা যায়, কেন আসছিল?' রানার বিস্ময় কাটছে না।

'এখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে যায়,' বললেন রাহাত খান, যত্নের সঙ্গে পাইপে তামাক ভরা শেষ করে তাতে আগুন ধরালেন। 'আমাদের টেকনিকাল ব্রাঞ্চের জাদুকররা প্রফেসর মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে গবেষণা করছিল. S.H.I.E.L.D. অর্থাৎ স্পেস হিট আইডেনটিফিকেশন অ্যান্ড আর্লি লিকুইডেশন ডিভাইস নামে একটা জিনিস আবিষ্কার করে বসেছে।' কাঁচাপাকা ঘন ভুরুর

আকস্মিক কুঞ্চন দেখেই বোঝা গেল নামটা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। 'ওটার বৈশিষ্ট্য হলো, কোন স্পেস শাটলে ইনস্টল করা হলে, সিস্টেমটার কাজ হবে ইন্টারসেপটিং কোন মিসাইলকে ধারে কাছে ঘেঁষতে না দেয়া, যথেষ্ট দূরে থাকতেই হিটসোর্স লক্ষ্য করে ছুটে যাবে লেযার বীম, ফলে মাঝ আকাশে আগুন ধরে যাবে মিসাইলে। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, ডিভাইসটা প্রতিবার সফল হয়।'

'কী করে পরীক্ষা করা হলো?' জিজ্ঞেস না করবার কোন কারণ দেখছে না রানা। 'আমাদের তো স্পেস শাটলও নেই, নেই মিসাইলও...'

'তুমি জানো নেই, তবে তোমার জানাটা সত্যি নাও তো হতে পারে,' রাহাত খানের সুর আগের চেয়ে একটু নরম। 'শুধু এইটুকু জেনে খুশি থাকো যে পরীক্ষা করেই আমাদের বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন।

'তারপর শোনো। আমাদের এই আবিষ্কারের খবরটা গোপন রাখা যায়নি। যাদেরই স্পেস প্রোগ্রাম আছে–আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ব্রাজিল এবং ভারত–তারাই ডিভাইসটা কিনতে চেয়েছে। আমরা বলে দিয়েছি, ডিভাইসটা কার কাছে আমরা বিক্রি করব, কিংবা কাকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে উপহার দেব, সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয়। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই, একটা ব্যাপারে কোন আপস নেই।

'সেটা হলো, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়ে দিয়েছে, এই ডিভাইস বা প্রযুক্তির ফর্মুলা কোন অবস্থাতেই দেশের বাইরে পাঠানো হবে না। আমাদের এই শর্ত ভারতই প্রথম মেনে নিয়েছে। ওদেরকে আমরা জিনিসটা বিনা পয়সায় উপহার দিতে যাচ্ছিলাম। সেটা নিতেই ওদের স্পেস শাটল পক্ষিরাজ তামিল নাড়ু থেকে ঢাকায় আসছিল। কিন্তু,' রাহাত খানের চোখ-মুখ থমথমে হয়ে উঠল, থেমে গেলেন ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোনটা বেজে উঠতে। রিসিভার তুলে অপরপ্রান্তের কথা শুনবার সময় পাইপে টান দিলেন ঘন-ঘন। 'গুড। ঠিক আছে। আমরা এখনই আসছি।' ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে রানার দিকে ফিরলেন। 'তো, রানা। বাকিটা তুমি অপারেশন রুমে শুনবে।' চেয়ার ছেড়ে কোন রকম আড়ষ্টতা বা বিরতি ছাড়াই ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে আসছেন তিনি, রানা আগেই পৌঁছে গিয়ে দরজা খুলে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে একপাশে।

ইলোরার ডেস্কটাকে পাশ কাটাবার সময় তার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন রাহাত খান। 'আমরা অপারেশন রুমে থাকব। ইমার্জেন্সি কিছু না হলে কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'ইয়েস, সার।' রানার দিকে তাকিয়ে হাসল ইলোরা, যেন মানবিক উষ্ণতা বিনিময়ের জন্য কাউকে পেয়ে ধন্য মনে করছে নিজেকে। একটা প্রশ্ন রানার মনে প্রায়ই উঁকি দেয়, ঠিক কী ধরনের আনুগত্য আর স্নেহ ইলোরা আর বসকে দীর্ঘদিন একটা বিশেষ সম্মানজনক পর্যায়ে বেঁধে রেখেছে। গুরুদায়িত্ব পালনের কারণে প্রায় সারাক্ষণ যাঁর মেজাজ চড়ে থাকে, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ দুনিয়ার কঠিনতম কাজের একটা। অথচ কেউ কোনদিন শোনেনি ইলোরা বসের

বিরুদ্ধে একটা টুঁ-শব্দ উচ্চারণ করেছে। সম্পর্কটা যে ঠাণ্ডা, তা-ও নয়; ছুটির দিনগুলোয় রাহাত খানের বাড়িতে প্রায় নিয়মিতই দেখা যায় তাকে–কখনও কাজে, কখনও বেড়াতে। ওদেরকে নিয়ে বেশ কিছু গুজব শোনা যায়, সত্যি-মিথ্যে বলা কঠিন। ইলোরার নাকি একবার বিয়ে হয়েছিল, রাহাত খানের নিজের পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে। ওদের বিয়েতে তিনি নাকি একটা গাড়ি আর একটা মোবাইল ফোন উপহার দিয়েছিলেন–মোবাইল ফোন তখন দেশে একেবারে নতুন ছাড়া হয়েছে, অসম্ভব বেশি দাম। কিন্তু ইলোরার সেই বিয়ে টেকেনি। শোনা যায়, এই দামী উপহারগুলোই নাকি ইলোরার স্বামীর মনে সন্দেহের বীজ বপন করেছিল। এটুকু টের পেয়েই রাহাত খান ইলোরাকে চাকরি ছেড়ে সাংসারিক জীবনে সবটুকু সময় দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইলোরা অন্য ধাতুতে গড়া মেয়ে। স্বামীর অকারণ এবং অন্যায় সন্দেহ দূর করবার জন্য যা-যা দরকার সব সে করেছে, তারপর ব্যর্থ হয়ে ডিভোর্স দিয়েছে তাকে, একটা অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করে অনুদার, সন্দেহবাতিক স্বামীর ঘর করেনি। রানা শোনেনি, তবে অনেকেই শুনেছে, বাড়িতে ইলোরাকে মা বলে সম্বোধন করেন বস্।

সরলার্থে ব্যাপারটা তা হলে এরকম দাঁড়ায় যে, রাহাত খান আসলে নিজগুণে অন্তত রানা আর ইলোরার জন্য পিতৃকল্প অভিভাবক হিসেবেই গণ্য হচ্ছেন, যিনি অনায়াসে ওদের কাছ থেকে বিপুল সম্মান, শ্রদ্ধা আর মনোযোগ আদায় করে নিতে সক্ষম।

লম্বা করিডর ধরে এগোচ্ছে ওরা, রাহাত খান সামনে রয়েছেন। এলিভেটরের উল্টোদিকে পৌঁছে বাঁয়ে ঘুরলেন। অভিজ্ঞতা থেকে রানা জানে হাঁটবার সময় তিনি কোন কথা বলবেন না। সমবয়েসী একজন কর্মচারীর উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকানো এই সংক্ষিপ্ত জার্নির একমাত্র ঘটনা। করিডরের দ্বিতীয় দরজার সামনে থেমে হাতল ধরে অনায়াসে একটা মোচড় দিলেন রাহাত খান।

অপারেশন রুমটা ছোটখাট একটা সিনেমা হলের মত, সারি-সারি সিটগুলো ঢালু হয়ে একটা স্ক্রীনের দিকে নেমে গেছে। স্ক্রীনের পাশে নিচু কাঠের ছোট মঞ্চ, পিছনে কালো ব্ল্যাকবোর্ড। ম্যাপসহ অন্যান্য ভিজুয়াল এইডস ভাঁজ খোলা পর্দার মত নিচু করা যায়, নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্রজেকশন বুদ থেকে।

কামরার ভিতর দুই ভদ্রলোককে অপেক্ষা করতে দেখল রানা। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) ইমরুল কায়েস। রানা জানে, সেনাবাহিনীতে যখন ছিলেন, কর্নেল কায়েস রাহাত খানের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন; সম্পর্কটা সেই তখন থেকেই গুরু-শিষ্যের মত। প্রতিমন্ত্রীকে আজও তাঁর ডাক নাম বৈশাখ বলেই ডাকেন রাহাত খান।

গায়ের কোটটা খুলে বিসিআই রিসেপশন-এর একজন কর্মচারীর হাতে এইমাত্র ধরিয়ে দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। রাহাত খানকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি, রানার উদ্দেশে শুধু মাথা ঝাঁকালেন। পরস্পরের সঙ্গে আগে ওদের পরিচয় হয়েছে; ভদ্রলোককে একটু ঈর্ষাকাতর, একটু আহত, সামান্য

অভিমানী বলে মনে হয়েছে রানার–ভাবটা যেন বসের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সমস্ত স্নেহ আর ভালবাসা একাই কেড়ে নিয়েছে ও।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের নাম কর্নেল আতাহার সিদ্দিক। ইনি বিসিআই টেকনিকাল ব্রাঞ্চের নতুন হেড। পুরানো, কালো একটা সুট পরেছেন, পকেটগুলো খানিকটা হাঁ হয়ে থাকে সারাক্ষণ। তিনিও রানার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন। কোটটা একটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে কামরা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রিসেপশনের লোকটা।

'তুমি সময় করে আসতে পেরেছ, সেজন্যে আমি খুশি, বৈশাখ,' প্রতিমন্ত্রীকে বললেন রাহাত খান। 'ইন্ডিয়ান স্পেস শাটল কেন আসছিল, ব্যাকগ্রাউন্ডটা রানা জানে। তবে কী নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন তা জানে না। কর্নেল সিদ্দিক, আপনি যদি আরেকবার সব স্মরণ করেন তো ভাল হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাঠের মঞ্চে উঠে গেলেন কর্নেল সিদ্দিক। বাকি তিনজন থিয়েটারের পিছন সারির সিটে বসলেন। বস্ আর প্রতিমন্ত্রীর কাছ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসল রানা। নতুন কোন অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার মুহূর্তে উত্তেজনায় ভরা যে প্রত্যাশা ওকে উজ্জীবিত করে তোলে, সেটা পুরোমাত্রায় অনুভব করছে। প্রতিটা পেশি আর সবগুলো ইন্দ্রিয় টান-টান, কর্নেল সিদ্দিক কী বলেন শুনবার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছে।

'একটা সাতশো সাতচল্লিশের পিঠে তুলে তামিল নাড়ু থেকে আনা হচ্ছিল স্পেস শাটল পক্ষিরাজকে। সাতশো সাতচল্লিশ সুন্দরবনের আমাদের অংশে এসে বিধ্বস্ত হয়েছে।'

এক নিমেষে পরিস্থিতির গুরুত্ব গাঢ় ছায়া ফেলল রানার চেহারায়। 'অ্যাক্সিডেন্ট?'

রাহাত খান মাথা ঘোরালেন না। 'কর্নেল সিদ্দিক কী বলেন শোনো, তারপর বলো তোমার কী মনে হয়।'

মঞ্চের পিছনের দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেন কর্নেল সিদ্দিক। কামরার সমস্ত আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। আরেকটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। স্ক্রীনে এবার একটা ছবি ফুটে উঠল। দু'পাশে গভীর জঙ্গল, মাঝখানে শুকনো একটা নদীর ঢাল, সেই নদী আর ঢালে যে ধাতব আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে সেটাকে একটা প্রকাণ্ড বিমানের ধ্বংসাবশেষ বলে চিনতে কারুরই বিশেষ অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

'কেউ বাঁচেনি।' এটা কোন প্রশ্ন নয়। এমনিই কথাটা বেরিয়ে গেল রানার মুখ থেকে।

প্রতিমন্ত্রী কর্নেল ইমরুল কায়েস ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি রানার চোখে তাকালেন। 'কিন্তু স্পেস শাটলটা পাওয়া যায়নি,' বললেন তিনি।

রানা কিছু বলবার সুযোগ পেল না, কর্নেল সিদ্দিক আবার শুরু করলেন। 'আমাদের পুলিশ ও বিডিআর-এর সাহায্য নিয়ে ভারতীয় স্পেস ফ্যাসিলিটির

বিজ্ঞানীরা প্রতিটি ইঞ্চিতে চিরুনি অভিযান চালিয়েছেন।' স্ক্রীনে আরও মোচড়ানো, পুড়ে বিকৃত হয়ে যাওয়া ধাতব আবর্জনা চলে আসতে মুহূর্তের জন্য থামলেন। 'কিন্তু স্পেস শাটলের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি কোথাও।'

এ-সব রানার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। 'তার মানে কি আপনারা বলতে চাইছেন আকাশ থেকে হাইজ্যাক করা হয়েছে ওটাকে?'

'আর কোনওভাবে তো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না,' রাহাত খান বললেন। 'তামিল নাড়ু থেকে রওনা হওয়ার সময় স্পেস শাটল পক্ষিরাজ সাতশো সাতচল্লিশের পিঠেই ছিল।'

'প্লেনটা ক্র্যাশ করবার আগে কন্ট্রোল টাওয়ারকে ক্রুরা কিছু জানায়নি?'

'না।'

'তাদের...'

'সবার লাশ উদ্ধার করা গেছে। পজিটিভ আইডেন্টিফিকেশন সবার বেলায় সম্ভব না-ও হতে পারে, তবে এমন সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই যে তারা কেউ শাটল নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়িত।'

'ভারত অবশ্য আগে থেকেই আভাস দিচ্ছে তাদের স্পেস প্রোগ্রাম আমেরিকানরা স্যাবটাজ করতে চাইছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই কাজটার পিছনে চিনের হাত থাকতে পারে,' বলল রানা। 'ভারতের মত চিনও মহাশূন্যে একটা স্পেস স্টেশন তৈরি করবার চেষ্টা করছে। দেশ দুটো পরস্পরের পুরানো শত্রু। পক্ষিরাজকে একেবারে হাতের কাছে পেয়ে হাইজ্যাক করবার লোভ হয়তো সামলাতে পারেনি ওদের অতি-উৎসাহী কোনও টেকনোক্র্যাট। এক হাজার মাইল উড়িয়ে নিয়ে গেলেই তো হয়, তিব্বতের কোথাও লুকিয়ে ফেললে কে আর খুঁজে পাবে।'

'চিনের ব্যাপারে ভারত অত্যন্ত সতর্ক। সেজন্যে বিশেষভাবে সেনসিটিভ আর্লি-ওয়ার্নিং সিস্টেম বসানো হয়েছে দু'দেশের সীমান্তে,' রাহাত খান বললেন। 'ওই সিস্টেমে কিছু ধরা পড়েনি।'

'ঝুঁকি নিয়ে খুব নিচু দিয়ে উড়ে যেতে পারে না?'

'এরকম ঝুঁকি নেয়াটা নেহাতই বোকামি,' বিসিআই চিফ যুক্তিটা মেনে নিতে পারছেন না। 'একটা স্পেস শাটলের ডিজাইন এমন নয় যে গাছপালার মাথা ছুঁয়ে ছুটতে পারবে।'

'সার, আপনিও কি তা হলে নাসা অর্থাৎ আমেরিকানদের সন্দেহ করছেন?' জানতে চাইল রানা।

'এখনই আমি কাউকে সন্দেহ করছি না, শুধু সম্ভাবনাগুলো বিশ্লেষণ করছি। আমি বরং তোমার সঙ্গে একমত–চিন কাছে, ভারতের সঙ্গে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আছে, কাজেই প্রথম সন্দেহটা ওদের ওপরই পড়ে। তবে চিন আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, বাংলাদেশের আকাশে এ-কাজ তারা করবে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'গোটা পরিস্থিতি চরম বিব্রতকর,' প্রতিমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুকনো কাঠকাঠ।

'পক্ষিরাজ এখানে আসছিল, কারণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চায়নি আমাদের টেকনিক্যাল নো-হাউ দেশের বাইরে চলে যাক। ভারত এটাকে খুব ভাল চোখে দেখেছে বলে আমার মনে হয় না। তার ওপর এই বিচ্ছিরি ঘটনা। বিড়ম্বিত বোধ করবার আরও একটা কারণ হলো, ওদের সাতশো সাতচল্লিশের নেভিগেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন আমাদের এয়ার ফোর্সের একজন অফিসার। এমনিতেই দু'দেশের সম্পর্ক বেশির ভাগ সময় আড়ষ্ট, সেটাকে স্বাভাবিক করবার একটা সুযোগ কাজে লাগাতে গিয়ে হিতে-বিপরীত হয়ে গেছে। নিউজ ব্ল্যাকআউট ঘোষণা করা হয়েছে, তাই খবরটা এখনও ছড়ায়নি–ছড়ালে যে কী হবে আল্লাহ মালুম।'

'আপনার ধারণা, ভারত আমাদেরকে দায়ী করবে?' রানার কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস।

অস্বস্তিকর কয়েকটা নীরব মুহূর্ত পার হয়ে যাচ্ছে। 'না,' অবশেষে প্রতিমন্ত্রী কর্নেল কায়েস বললেন। 'ওরা এরকম বোকার মত কিছু ভাববে বলে আমি মনে করি না।'

'কে আমাদের দায়ী করল কি করল না, এক্ষেত্রে এ-সব প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। 'আমাদের আকাশে ঘটনাটা ঘটেছে। আমাদের একজন লোক নিহত হয়েছেন। নিহত হয়েছেন আমাদের দু'জন অতিথিও। তাদের স্পেশ শাটলটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এখন এটা আমাদের দায়িত্ব–জানতে হবে কীভাবে কেন কী ঘটল।' রানার অপলক চোখে দৃষ্টি হানলেন তিনি। 'এটাই তোমার অ্যাসাইনমেন্ট।'

উত্তেজনায় অধীর, আবার একই সঙ্গে কর্তব্যবোধে গম্ভীর, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'ইয়েস, সার।' কর্নেল সিদ্দিকের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'সাতশো সাতচল্লিশের টুকরো-টাকরা থেকে কোন ক্লু পাওয়া যায়নি?'

'না। ল্যাবরেটরি টেস্ট এখনও চলছে, তবে ওরা কিছু পাবে বলে আমি মনে করি না।'

'বোয়িং-এর পিঠে চড়ে আসছিল স্পেস শাটলটা, তাতে কেউ ছিল না?'

মাথা নাড়লেন কর্নেল সিদ্দিক। 'না।'

'তবে,' রাহাত খান বললেন, 'তামিল নাড়ু থেকে বলা হয়েছে, ওদের স্পেস রিসার্চ সেন্টারের দু'জন রাশিয়ান এক্সপার্টকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'রুশ এক্সপার্ট?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন কর্নেল সিদ্দিক। 'শাটলের সঙ্গে ছয়জন এক্সপার্টও পাঠায় রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। অ্যাস্ট্রোনটদের ট্রেনিং দান, শাটলের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের জন্যে। তবে পক্ষিরাজ নিখোঁজ হওয়ার পর রাশিয়ার থলে থেকে একটা আমেরিকান বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে।'

হাসি চেপে রানা জানতে চাইল, 'সেটা কী রকম?'

'যে যার যতই বন্ধু হোক, কেউ তো আর নিজের হাঁড়ির খবর কাউকে জানায়

না, তেমনি রাশিয়াও ভারতকে জানায়নি যে বাজেটের অভাবে রকেট আর স্পেস শাটল তৈরির কারখানাগুলো তারা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। অথচ ভারত যখন স্পেস শাটল তৈরির অর্ডার দিল, অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সেটা গ্রহণ করল মস্কো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকার কাছ থেকে একটা স্পেস শাটল সস্তায় কিনে ভারতকে বেশি দামে সাপ্লাই দেবে। অর্ডার পাওয়ার পর তারা নাসার সঙ্গে যোগাযোগ করল। কিন্তু নাসা জানাল, নানা দিক চিন্তা করে তারাও রকেট আর স্পেস শাটল তৈরির কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। এ-সব তারা প্রাইভেট কোম্পানির কাছ থেকে কিনে ভালই কাজ চালাতে পারছে। স্পেস ট্র্যাভেল যে অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব জনপ্রিয় হতে যাচ্ছে, এ তো সবাই জানে; কাজেই দেশে দেশে মহাশূন্যে স্টেশন তৈরির ধুম লেগে গেছে। যে-সব কারখানা রকেট আর স্পেস শাটল তৈরি করে তারা তিন শিফটে কাজ করেও ক্রেতাদের মন রক্ষা করতে পারছে না।

'যাই হোক, মস্কোর অনুরোধে নাসা লাম্বাডা করপরেশনকে দেখিয়ে দিল—ওরা নাসার টেকনিকাল সহায়তা নিয়ে আজ কয়েক বছর ধরে রকেট আর স্পেস শাটল তৈরি করছে…'

'সংক্ষেপে,' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ভারতের স্পেস শাটল পক্ষিরাজ তা হলে লাম্বাডা করপরেশনের কারখানায় তৈরি হয়েছে? আমেরিকার কোথায় সেটা?'

'ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

'লাম্বাডা…আলবার্তো কার্তেজ লাম্বাডা। বিখ্যাত একজন ল্যাটিন আমেরিকান বিলিওনেয়ার। ইনি যে আমেরিকান স্পেস প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত, আমার জানা ছিল না।'

'এটা একাধারে নেশা আবার জনহিতকর কাজও বটে,' বললেন প্রতিমন্ত্রী কর্নেল ইমরুল কায়েস। 'নাসারও সমস্যা ছিল বাজেট ঘাটতি, ঠিক ওই সময় ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে এগিয়ে আসেন লাম্বাডা। ল্যাটিন আমেরিকার মেক্সিকো-ব্রাজিল সহ বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েক বছর থাকতে হয়েছে আমাকে, তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। অত্যন্ত স্মার্ট আর বুদ্ধিমান মানুষ, মনটা উদার, সারাক্ষণ চিন্তা করছেন দুনিয়ার কীসে ভাল হবে।'

'এখানে আমরা লাম্বাডার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে বসিনি,' সহাস্যে মৃদু তিরস্কার করলেন রাহাত খান। কর্নেল সিদ্দিকির দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনার কথা শেষ করুন, কর্নেল।'

'তো, যাই হোক, পক্ষিরাজ নিখোঁজ হওয়ার পর মাত্র গতকাল ভারত জানতে পেরেছে রাশিয়ায় নয়, ওটা তৈরি করা হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়, লাম্বাডা করপরেশনের কারখানায়। রাশিয়া শাটলটার সঙ্গে যে ছ'জন এক্সপার্টকে তামিল নাড়ুতে পাঠিয়েছিল তারা রুশ হলেও, রাশিয়ান মহাশূন্য গবেষণা সংস্থার কেউ নয়। ছয়জনই আসলে লাম্বাডা করপরেশনের বেতনভুক কর্মচারী।'

অপারেশন রুমে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

তারপর রানাই কথা বলল, 'মনে হচ্ছে কাজটা আমার লাম্বাডা করপরেশন থেকেই শুরু করতে হবে। ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাব বলে আশা করি। দু'একটা ক্লু-ও পেয়ে যেতে পারি।'

'রাইট,' সমর্থন করলেন বিসিআই চিফ। 'আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হয়ে যাও তুমি।'

'মিস্টার লাম্বাডাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনি যাচ্ছেন,' প্রতিমন্ত্রী খুশি হয়ে বললেন। 'দেখবেন কেমন খাতির করে আপনাকে।'

'আমি নিজে অবশ্য নাসার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করব,' বললেন রাহাত খান। 'মিস্টার লাম্বাডা সম্পর্কে ওদের কী বক্তব্য, জানা দরকার।' আবার তিনি কর্নেল সিদ্দিকের দিকে তাকালেন, ভাবছেন তাঁর আরও কিছু বলবার আছে কি না।

কর্নেল নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন।

এই সময় সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রতিমন্ত্রী ইমরুল কায়েস। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, সার। যখন যা দরকার হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন, প্লিজ। মিস্টার রানা। কখন কী ঘটে না ঘটে জানতে পারলে খুশি হব আমরা।' যেন রানাকে সাহস যোগাচ্ছেন, চোখে-মুখে এরকম একটা ভাব নিয়ে রানার দিকে তাকালেন তিনি, 'গুড লাক।'

রাহাত খানের সঙ্গে, তারপর এবার রানার সঙ্গেও, করমর্দন করে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল ইমরুল কায়েস।

রানা ভাবল মীটিং শেষ হয়েছে। কিন্তু বসের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল, ভুল ভেবেছে।

'এক মিনিট, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'আমাদের টেকনিকাল ব্রাঞ্চ তোমার জন্যে নতুন একটা আইটেম তৈরি করেছে।'

রাহাত খান কথা বলছেন, কর্নেল সিদ্দিক পকেট থেকে ছোট একটা বাক্স বের করলেন। বাক্স থেকে যে জিনিসটা বেরুল, প্রথমদর্শনে মনে হলো রিস্টওয়াচের একটা লেদার স্ট্র্যাপ বুঝি। 'হাতটা লম্বা করুন, এমআরনাইন।'

রানার কব্জিতে বেঁধে দেওয়া হলো জিনিসটা। কাছ থেকে ভাল করে দেখে মিনিয়েচার কার্ট্রিজ হোল্ডার মনে হলো। খুদে লেদার খাঁজগুলোর ভিতর কী কী সব গুঁজে রাখা হয়েছে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে কর্নেলের দিকে তাকাল ও।

'স্ট্যান্ডার্ড ইকুইপমেন্ট হিসেবে আমাদের প্রথম সারির নয়জন এজেন্টকে বরাদ্দ করা হবে এটা,' কর্নেল সিদ্দিক ব্যাখ্যা করলেন। 'রিস্টমাস্‌লে যে নার্ভ আছে, সেই নার্ভের স্পন্দন এটাকে অ্যাকটিভেট করবে।' কাঁধে হাত রেখে রানাকে ঘোরালেন তিনি। কামরার আরেক প্রান্তে একটা কর্ক প্যানেল রয়েছে, রানা এখন সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। 'হাত লম্বা করুন, তারপর ঝাঁকি দিয়ে কব্জিটা পিছন দিকে টেনে নিন।'

কথামত কাজটা করল রানা–সরু ডাল ভাঙার মত তীক্ষ্ণ শব্দ ঢুকল কানে। খুদে একটা বর্শা কর্কের ভিতর এমনভাবে সেঁধিয়েছে, প্রায় অদৃশ্যই বলা যায়।

খোলা বাক্সটা রানার সামনে বাড়িয়ে ধরলেন কর্নেল। 'এখানে দশটা বর্শা আছে। পাঁচটার মাথা নীল, ওগুলো আর্মার ভেদ করে যাবে। পাঁচটা লাল। ওগুলোয় আছে সায়ানাইডের প্রলেপ। মৃত্যু ঘটবে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে।'

কব্জির দিকে তাকিয়ে এদিক-ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'আমি যদি এটা পরতে না চাই, সার?'

'পরতে তুমি বাধ্য,' জবাব দিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। 'এটা অফিশিয়াল অর্ডার।'

'জ্বী।'

তিন

ইংল্যান্ড হয়ে আমেরিকা। অর্থাৎ লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক, মাঝখানে তিন হাজার দুশো সত্তর মাইল উত্তর আটলান্টিক। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরোটা দৈর্ঘ্য পাড়ি দাও, নিউ ইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস, তাও কমবেশি পৌনে তিন হাজার মাইল। তারও আগে এশিয়ার ঢাকা থেকে পশ্চিম ইউরোপের লন্ডনে আসতে বার কয়েক প্লেন বদল করে প্রায় নয় হাজার মাইল পেরোতে হয়েছে। রানা ক্লান্ত, তবে বিধ্বস্ত নয়। যার স্বভাব ও পেশা দুটোই দুনিয়া চষে বেড়ানো, অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়ে দেয় একাধিক আকাশ ভ্রমণের মাঝখানে কীভাবে দু'চোখের পাতা এক করতে হয়, কীভাবে শান্ত রাখতে হয় স্নায়ুকে, জেট ল্যাগ এড়াবার কী উপায়।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা সাতশো সাতচল্লিশ বোয়িং ওকে লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছে দিয়েছে। খোলা টারমাক ধরে আরোহীদের মিছিলটা অ্যারাইভাল লাউঞ্জের দিকে এগোচ্ছে, রানা রয়েছে প্রথম দশজনের মধ্যে। রোদ পিছনে ফেলে ঠাণ্ডা ছায়ায় পা রাখবার খানিক পরেই লাউডস্পীকার থেকে শোনা গেল: 'মিস্টার মাসুদ রানা, লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে এসেছেন, দয়া করে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ডেস্কে চলে আসুন। ধন্যবাদ।'

ঘোষণাটা শুনে দীর্ঘ লাইন থেকে নিজেকে বের করে আনল রানা–প্লেন থেকে ওর ব্রিফকেস আর সুটকেস পৌঁছেছে কি না পরে খোঁজ নেবে। ইন করে পরা লাল শার্ট, সাদা ট্রাউজার আর নিখুঁত কামানো দাড়ি নিয়ে ঝকঝকে এক তরুণ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, উর্ধ্বমুখী পেন্সিল হাতে প্রস্তুত, শার্টে সাদা হরফে ছাপা–'তুমি সুখী হলেই আমি সুখী।'

ডেস্কের পাশে দাঁড়ানো মেয়েটাকে নীল অগ্নিশিখা বললে মহিলা ছাড়া আর কারও কোন আপত্তি করা উচিত নয়–সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, পরে আছে গাঢ় নীল

স্ল্যাকস আর ব্লাউজ, এমনকী মাথার হ্যাটেও নীলেরই অন্য এক আভা। পাটের রশি দিয়ে তৈরি স্যান্ডেল জোড়া নীলচে-বেগুনি। চেহারায় মার্কিন ভাব স্পষ্ট। হাসিটা কৃত্রিম নয়, উষ্ণতা আছে। দাঁতগুলো শুধুই সাদা নয়, দ্যুতি ছড়াচ্ছে। বড় বড় চোখ, মাঝখানে যথেষ্ট ব্যবধান। নাকটা ছোট, তবে তীক্ষ্ণ। সোনালি চুল পরিমাণে এত বেশি, ওগুলো যেন তার স্বাস্থ্য আর প্রাণ-প্রাচুর্যও প্রমাণ করে।

প্রকাণ্ড পদ্মপাতায় বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে থাকলে ওই মেয়েকে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীনাস বলে চালিয়ে দেওয়া কোন ব্যাপারই নয়। দূর থেকে দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল না মেয়েটার ব্লাউজে, ডান স্তনের ঠিক উপরে, ব্যাজটা কীসের। কাছাকাছি আসার পর ব্লাউজের পকেটে লাম্বাডা করপোরেশনের ট্রেড মার্ক দেখল রানা—নীল জমিনের উপর, একটা বলয়-এর ভিতর, নেবুলা বা নীহারিকা প্রিন্ট করা। রানার আগ্রহ লাফ দিয়ে বাড়ছে। মেয়েটা চোখে-মুখে উজ্জ্বল প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'মিস্টার রানা?' কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস আর বিস্ময় এতবেশি যে আসলে যেন জানতে চাইছে—'সত্যি তুমিই তো!'

'হ্যাঁ, আদি এবং অকৃত্রিম—মাসুদ রানা।'

'হাই। আমি রোঁনা—ফিলিপা রোঁনা। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মিস্টার লাম্বাডা আমাকে পাঠালেন।' মেয়েটার হাবভাব স্বাভাবিক, কথাবার্তা স্বতঃস্ফূর্ত। তবে···চোখে পলক পড়ছে না বা রানার উপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছে না। তৃতীয় কেউ এটাকে স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারে, কারণ সে তো মেয়েটার রূপ আর স্বভাব যেমন দেখতে পাবে তেমনি খেয়াল করবে সুদর্শন রানার পুরুষালি বৈশিষ্ট্য, রুচিসম্পন্ন ভোগী হিসেবে সুন্দরী সঙ্গিনীর প্রতি ওর তীব্র আকর্ষণ।

'মিস্টার লাম্বাডাকে ধন্যবাদ দিতে হয়,' বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে সদ্য আগত আরোহীদের লাইনটা দেখল, যে-যার লাগেজ সংগ্রহ করতে যাচ্ছে। সেদিকে পা বাড়াতে যাবে ও, মেয়েটা তার একটা সরু হাত লম্বা করে বাধা দিল ওকে।

'তোমার ব্যাগেজ ট্যাগটা দাও আমাকে। আমাদের লোক আছে, ওগুলো তারা নিয়ে যাবে। তুমি বললে এখান থেকে এখনি আমরা বেরিয়ে যেতে পারি।'

কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো ঝকঝকে তরুণ আঙুলের ভিতর পেন্সিল নাচিয়ে ট্যাগটা এমন যত্নের সঙ্গে নিল, ওটা যেন মহামূল্য কোন গিফট্। সন্দেহ নেই দুনিয়ার এদিকটায় মিস্টার লাম্বাডা অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মানুষ।

'এসো, পথ দেখাই,' বলে রওনা হলো মেয়েটা। পিছু নিতে রানার খারাপ লাগছে না। কৃতিত্বটা দিতে হয় রোঁনার হাঁটার ভঙ্গিটাকে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে শরীরটাকে উঁচু করবার পর দ্বিতীয় পা সামনে বাড়ায়। ফলে লাফিয়ে নাচ শুরু করতে যাচ্ছে, এরকম একটা ভঙ্গি তৈরি হয়। রোঁনার কাঁধ দুটো চওড়া, তৈরি করা পেশিও আছে, একটা হাত যেন অপর হাতের চেয়ে একটু বেশি পুরুষ্ট রানা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল মেয়েটা নিয়মিত সাঁতার কাটে আর খুব সম্ভব ক্লাব মানের

লন টেনিসও খেলে। এমন একটা করিডর ধরে রানাকে নিয়ে যাচ্ছে সে, দেয়ালে কোন সাইনবোর্ড বা ফ্লাইট নম্বর লেখা নেই। এই পথে আর কেউ আসা-যাওয়াও করছে না। অবশেষে একটা র‍্যাম্প বেয়ে মিষ্টি রোদে বেরিয়ে এল ওরা।

কয়েকশো গজ দূরে কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফটের একটা সারি দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি দাঁড়িয়ে আছে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনের করিডরের মুখের সামনে। ওদের সরাসরি সামনে, রানওয়ে বরাবর, একটা হেলিকপ্টার; এরকম ডিজাইন আগে কখনও দেখেনি রানা—প্রায় গোল একটা বুদ্বুদ। গায়ে লেখা—লাম্বাডা এয়ারলাইন্স। লেখাটার নীচে সেই প্রতীক চিহ্ন, রোঁনার ব্যাজে যেটা রয়েছে—বলয়ের ভিতর নীল জমিন, তাতে নেবুলা বা নীহারিকা আঁকা।

'তুমি আমার গাইড আর বন্ধু?'

'আমি শুধু তোমার পাইলট।'

অবাক হলেও সেটা প্রায় অনায়াসেই গোপন রাখতে পারল রানা। এমনকী ক্যালিফোর্নিয়ার সৈকতে টপলেস হয়ে যারা ঘুরে বেড়ায় তারাও সহজলভ্য নয়, জিভে জল বা চোখে লোভ নিয়ে হাজার মাইল দূরে বসে যে-যাই ভাবুক না কেন। দুনিয়ার এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে স্বল্পবসনা নারী মানেই নোংরামি নয়, নয় অশ্লীল আহ্বান। 'তোমাদের এই হেলিকপ্টার আমি চিনতে পারছি না।'

'তোমার চিনতে পারার কথাও নয়। মিস্টার লাম্বাডা একটা বিশেষ মডেল ডেভলপ্ করছেন, এটা তার প্রোটোটাইপ।'

'জানতাম না যে ভদ্রলোক একটা এয়ারলাইন্সেরও মালিক।'

'কমিউনিকেশনেই তো মিস্টার লাম্বাডা সবচেয়ে বেশি সফল,' শান্ত, স্বাভাবিক সুরে কথা বলছে রোঁনা। 'দক্ষিণ আমেরিকায় তিনটে রেল কোম্পানি। জাপানে স্টীমশিপ কোম্পানি আর পাতাল রেল। হঙকঙ আর সিঙ্গাপুরে সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি হচ্ছে বছরে বারো থেকে বিশটা। তাঁর এই সব ব্যবসার সিকি ভাগের খবরও জানি না আমি। সব মিলিয়ে ক'টা ব্যবসা, এমনকি মিস্টার লাম্বাডাও তা জানেন কি না সন্দেহ। অ্যাকাউন্ট্যান্টদের একটা বাহিনী আছে, তারা হয়তো বলতে পারবে।' ইঙ্গিতে আরেকটা হেলিকপ্টার দেখাল রোঁনা, কাঁধে ব্যাজ নিয়ে ককপিটে বসে আছে পাইলট। 'কয়েক মিনিট পর তোমার ব্যাগ নিয়ে ফিরবে ও।'

'আমার খুব যত্ন নেয়া হচ্ছে,' বলল রানা।

'আমরা স্রেফ বসের হুকুম পালন করছি।' হাতের ইঙ্গিতে হেলিকপ্টারটা দেখাল রোঁনা। 'আশা করি আগে এ-সবে চড়বার সুযোগ হয়েছে?'

'তা হয়েছে।'

'ভাল। তোমাকে তা হলে সাহস যোগাবার দরকার নেই।' ককপিটে উঠে বসল রোঁনা।

তার পিছু নিয়ে রানাও উঠল, পাশের সিটে বসে সিট বেল্ট আটকাল অভ্যস্ত হাতে। 'মিস্টার লাম্বাডা সম্পর্কে কৌতূহল থাকাটা স্বাভাবিক। সংক্ষেপে কিছু

বলবে আমাকে?'

'অত্যন্ত সফল একজন মানুষ। আমেরিকা সাফল্যকে শ্রদ্ধা করে। শুধু তাই নয়, সাফল্যকে তারা প্রায় ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়েছে।'

'তারা?'

'আমি নিজেকে ঠিক এখনও পুরোপুরি আমেরিকান ভাবতে পারি না। মা-বাবা, দু'জনেই ফ্রেঞ্চ ছিলেন। বাবা এখানকার একটা ভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতে এসে আর ফিরে যাননি। তবে জন্মসূত্রে আমাকে সবাই আমেরিকানই বলবে।' রেডিও অন করে কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলল রোঁনা, টেক-অফ করবার অনুমতি চাইছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রায় খাড়া ভাবে আকাশে উঠে এল কপ্টার, তারপর আধ পাক ঘুরে সগর্জনে ছুটল উত্তর দিকে। ওর নীচে অসংখ্য লম্বা রাস্তা, কাটাকুটি দাগের মত একটার উপর দিয়ে আরেকটা চলে গেছে; চওড়া হাইওয়েগুলো হারিয়ে গেছে দূর দিগন্তে।

'কত দূর?' জিজ্ঞেস করল রানা, মনে মনে বলল, '...আমাকে নিয়ে যাবে, হে সুন্দরী?'

'বহুদূর–দু'ঘণ্টার পথ। ক্যালিফোর্নিয়ায় কি এর আগে আসা হয়েছে?'

শান্ত শিথিল ভঙ্গি হলেও, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কপ্টার চালাচ্ছে রোঁনা। সুন্দরী কোন মেয়েকে ভালভাবে মেশিন অপারেট করতে দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারে না রানা; ওর নিজের নেশা হলো, চিতার মত ক্ষিপ্র একটা গাড়ির ড্রাইভিং সিটটা দখল করা। 'বেশ ক'বারই আসা হয়েছে,' বলল ও। 'তবে ইস্ট কোস্টটাই ভালভাবে চিনি।'

'তোমাকেও ল্যাটিন মনে হচ্ছে। মিস্টার লাম্বাডার কেউ হও নাকি?'

'সুর শুনে মনে হলো না প্রশংসা করলে!' রানা হাসছে।

রোঁনাও। 'এ-কথাও বলতে পারবে না যে নিন্দা করেছি।' উইন্ডস্ক্রীনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই দেখো হলিউড।'

'পাহাড়ের গায়ে ওই সাইনবোর্ড আগেও কয়েকবার দেখেছি,' বলল রানা। 'কারও মনে থাকে না যে ওটা রঙ করা দরকার।'

'কেউ বেগার খাটলে খুব খুশি হবে ওরা।' কন্ট্রোলে আঙুলের চাপ দিল রোঁনা, দিক বদলে উত্তর-পুবে ছুটল কপ্টার।

মনে-মনে হাসল রানা। মেয়েটাকে ভাল লাগছে ওর। দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল মেয়েরা সাধারণত রসকষহীন শুকনো টাইপের হয়, রোঁনা তাদের দলে পড়ে না, তার কৌতুকপ্রিয় একটা তাজা মন আছে। সরল বলেই মনে হচ্ছে, ভান বা ভণিতা করতে জানে না। একই সঙ্গে, অত্যন্ত যোগ্য একজন পাইলটও। এবারই যে প্রথম তা নয়, কথাটা আগেও ওর মনে জেগেছে–রূপ-সৌন্দর্য একটা মেয়ের জন্য কতটুকু অসুবিধে সৃষ্টি করতে পারে। বেশিরভাগ পুরুষেরই ধারণা, ঈশ্বরের কাছ থেকে মেয়েরা রূপ কিনেছে মেধার বিনিময়ে। প্রথমদর্শনে রোঁনাকে দেখে ওর মনে হয়েছিল ফ্যাশন ম্যাগাজিনের কাভার গার্ল, টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে পোজ

দেয়। কাঠামোটা যদি সাদামাঠা হত, কাঁধ হত মোটা আর নরম, পরনে থাকত হাঁটু ঢাকা ঢোলা স্কার্ট, ধরে নিত এই মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ায়।

'আমাদের বাঁয়ে সানফ্রান্সিসকো,' ইশারায় দেখাল রোঁনা।

নিজেকে তিরস্কার করল রানা। রোঁনা মেয়েটা ওর চিন্তা-ভাবনায় একটু বেশিই থেকে যাচ্ছে। যত সুন্দরী বা গুণান্বিতাই হোক, এরকম একটা মেয়ের খোঁজে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসেনি ও। 'তুমি বোধহয় জানো কেন এখানে এসেছি আমি।'

মাথা নাড়ল রোঁনা। 'নাহ্। আমাদের এখানে প্রচুর লোকজন আসে। এখানকার সব খবর আমার জানবার সুযোগ হয় না। লাম্বাডা করপরেশনের সামান্য একজন পাইলট আমি।'

'তবে তুমি জানো বাংলাদেশে বিধ্বস্ত হয়েছে ওটা।'

একটু গম্ভীর হলো চেহারা; এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রোঁনা বলল, 'হ্যাঁ, ঘটনাটা কানে এসেছে। স্পেস শাটল পক্ষিরাজকে নিয়ে ইন্ডিয়ান সাতশো সাতচল্লিশ ওদিকেই কোথাও যাচ্ছিল। বোধহয় ভারত থেকে বাংলাদেশে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' দুর্ঘটনা সম্পর্কে অফিশিয়াল বক্তব্য পুনরুচ্চারিত হতে শুনল রানা। স্পেস শাটল পক্ষিরাজ যে নিখোঁজ হয়ে গেছে, এটা মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়নি। 'ওই দুর্ঘটনা তদন্ত করছি আমি।'

'তারমানে তুমি বাংলাদেশ থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ।'

'গড! সে তো আরেকটা আলাদা দুনিয়া!'

চোখের কোণ দিয়ে মেয়েটাকে লক্ষ করছে রানা। কিন্তু না, ও বাংলাদেশ থেকে আসছে শুনে রোঁনার মধ্যে বিস্ময় ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া হলো না।

লস অ্যাঞ্জেলেস্ আর সংলগ্ন গুচ্ছ শহরগুলো ইতোমধ্যে পিছিয়ে পড়েছে, প্রায় বুদ্বুদ আকৃতির ওদের কপ্টার অবাক করা দ্রুত গতিতে এই মুহূর্তে সমতল প্রান্তর ধরে ছুটছে, দূরে দেখা যাচ্ছে দিগন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় সারি। এদিকটা মরুভূমি-প্রবণ এলাকা। রানা আন্দাজ করল, ওরা সম্ভবত মোহাভি মরুভূমির প্রান্তসীমায় রয়েছে। এলাকাটা বৈরী আর একঘেয়ে, অস্বাভাবিক লম্বা নালা আর শুকনো নদীর তলা ছাড়া দেখবার মত তেমন কিছু নেই। মাটির রঙ লালচে-খয়েরি, এখানে-সেখানে বেঁটে ও শুকনো ঝোপ গজিয়েছে। উত্তপ্ত লু হাওয়া ধুলোর ছোট ছোট ঝড় তৈরি করছে, মাঝে মাঝেই ঝাপসা হয়ে উঠছে বুদ্বুদের ফাইবার গ্লাস। কপ্টারের গতিপথ লক্ষ করে অবাক হলো রানা। ওর ধারণা ছিল মিস্টার লাম্বাডার স্পেস ভেঞ্চার তাঁর মূল ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটলেশন-এর কাছাকাছি কোথাও বুঝি হবে, বেকারস্ফিল্ড-এর উত্তরে জ্যাকুইন উপত্যকায়।

'আমরা লাম্বাডা এস্টেটের ওপর চলে এসেছি,' বলল রোঁনা। 'তোমার চোখ চারদিকে যতদূর যাচ্ছে, সবটুকুর মালিক মিস্টার লাম্বাডা।'

'ভদ্রলোকের প্রচুর আছে, তাই না?'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল রোঁনা, এই মুহূর্তে চোখে-মুখে কৌতুকপ্রিয়তার কোন ছাপই নেই। 'যা নেই, তা তিনি চান না বলেই নেই।'

খোলা প্রান্তরে এখন ফ্যাকাসে হলুদ ঝোপ আর কিছু ঘাস দেখা যাচ্ছে। দূরের পাহাড় ধীরে ধীরে বিরাট, নিরেট আর কঠিন হয়ে উঠছে, অনুর্বর মরুভূমি জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ঘাস আর ঝোপগুলোকে। লম্বা শিংওয়ালা গবাদি পশুগুলো কপ্টারের শব্দ গ্রাহ্যই করল না। সামনের ঘাস আরও সবুজ আর লম্বা লাগল রানার চোখে। তারপর দৃষ্টিপথে চলে এল ব্যবধান রেখে তৈরি করা দালান-কোঠা, সুরম্য অট্টালিকা, ঝকঝকে পাকা রাস্তা, পানির ট্যাংক, ইলেকট্রিক ট্র্যান্সফর্মার, লাইটপোস্ট, ডিশ অ্যান্টেনা ইত্যাদি–সব মিলিয়ে ছোট একটা শহর।

'এটাই মূল কমপ্লেক্স,' বলল রোঁনা।

রানার চোখজোড়া ব্যস্ত হয়ে উঠল। নীচে তাকিয়ে প্রথমে দেখতে পেল রেললাইনটা। তারপর ছোট আকারের একটা মার্শালিং ইয়ার্ড–ওখানে বগি বা কমপার্টমেন্ট জোড়া লাগিয়ে বা খুলে ট্রেন ছোট-বড় করা হয়। মাঝারি আকৃতির একটা পাওয়ার স্টেশন। প্রকাণ্ড আকৃতির পাঁচটা হ্যাঙ্গার; ছাদে বড়-বড় হরফে লেখা–'আবাবিল স্পেস শাটল ফ্যাক্টরি'।

মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো রানা। ওর যতটুকু জানা আছে, আবাবিল একটা পৌরাণিক পাখি। কোরানে এই পাখির উল্লেখ আছে–আবরাহা-র বাদশা কাবাঘর ধ্বংস করতে আসছিল, এই সময় আবাবিল পাখি আকাশ থেকে পাথর ফেলে তা প্রতিহত করে। কিন্তু আলবার্তো কার্তেজ লাম্বাডা, একজন ল্যাটিন আমেরিকান, তাঁর স্পেস কমপ্লেক্সের হ্যাঙ্গারে এই শব্দ লিখে রাখবেন কেন? ভদ্রলোক নিশ্চয় খ্রিস্টানই হবেন। তবে কি কোরানের এই কাহিনী বাইবেলেও লেখা আছে? হতে পারে। হলিউড লেখা সাইন-এর কথা মনে পড়ল রানার। আবাবিল-এর হরফগুলো আরও বড়।

ল্যান্ডিং স্ট্রিপ আর কন্ট্রোল টাওয়ার হ্যাঙ্গারগুলোর পাশেই। ছোট আকৃতির লোকজনকে একটা টানেলের ভিতর ঢুকতে দেখল রানা। এরকম টানেল একটা নয়, পাঁচটা। ভিতরে ঢোকার মুখই শুধু দেখা যাচ্ছে–স্ট্রিপ-এর পাশ থেকে নেমে গেছে এক প্রস্থ করে সিঁড়ি। কিন্তু কোন টানেলেরই অপরপ্রান্ত দেখা যাচ্ছে না। রানা আন্দাজ করল, পাঁচটা টানেল সম্ভবত পাঁচটা হ্যাঙ্গারে পৌঁছেছে। বড়সড় একটা দালানও দেখতে পেল ও, অর্ধবৃত্ত আকৃতির–ওটা বোধহয় একটা উইন্ড টানেল।

'তাহলে এখানেই স্পেস শাটলগুলো তৈরি হয়?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। ওঅর্কশপ, হ্যাঙ্গার, ডিজাইন অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল ব্লকস, টেস্ট সেন্টার–একের ভেতর বহু–সব।'

কপ্টার অনেকটা নীচে নেমে আসায় হ্যাঙ্গারগুলোর মাঝখানের গভীর উপত্যকায় ওভারঅল পরা লোকজনকে ফর্ক-লিফট্ ট্রাক অপারেট করতে দেখতে

পাচ্ছে রানা। যে-কোন লোক একবার চোখ বুলালেই বুঝতে পারবে, এটা একটা ফ্যাক্টরি। কিন্তু তার মনে এ প্রশ্নও জাগবে, মরুভূমির মাঝখানে লুকানো কেন? অ্যামিউনিশন ফ্যাক্টরির মত?

সামনে তাকিয়ে লম্বা পপলার গাছের দীর্ঘ একটা সারি দেখে বিস্মিত হলো রানা। তবে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। একটু সামনে দৃষ্টি পড়তে নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে কি না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। একটা ফ্রেঞ্চ রেঁনেসা শ্যাতো, আকারে প্রকাণ্ড, রোদ লেগে ঝলমল করছে দুর্গের প্রাচীর, টাওয়ারের মাথায় বসানো প্রতিটি কামানের ওজন কয়েক টনের কম নয়। রানা যেন রূপকথার একটা রাজ্যে এসে পড়েছে। যা-ই দেখুক, বিশ্বাস করতে রাজি হচ্ছে না ওর মন। গোটা ব্যাপারটা আসলে বড়জোর মুখোশ বা আবরণ হতে পারে; ভিতরে কিছু নেই, ফাঁকা বা ফাঁপা। কোন সিনেমার শুটিং হয়েছিল এখানে, তখন বোর্ড আর কাগজ দিয়ে এ-সব তৈরি করা হয়। মজা করবার উদ্দেশ্যে ভেঙে না ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। পিছন দিকে নিশ্চয়ই অবলম্বন আর ভারা আছে, গোটা কাঠামোটাকে খাড়া করে রাখবার জন্য। তবে পাথরগুলো কিন্তু আসল আর নিরেট বলেই মনে হচ্ছে, যেমন অকৃত্রিম মনে হচ্ছে যত্নের সঙ্গে তৈরি পাতাবাহারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ফ্রেঞ্চ গার্ডেন। বাগানের ভিতর সরু পথ? শ্বেত পাথরের তৈরি নগ্ন পুরুষ ও নারী মূর্তি? ছড়ানো-ছিটানো বিশটার মত ফোয়ারা? নাহ্, এগুলো শুটিঙের প্রয়োজনে তৈরি করা হয়নি। রোঁনার দিকে তাকাল রানা, দেখল ওকে বিস্মিত হতে দেখে কৌতুক বোধ করছে মেয়েটা।

'প্রতিটি পাথর লোয়া ভ্যালি থেকে বয়ে আনা হয়েছে,' বলল সে।

'মিস্টার লাম্বাডা...'

'নয়তো কে?'

শ্বেত-পাথরের রাজসিক বিস্তৃতি আর দেয়াল কেটে তৈরি করা সারি সারি জানালাগুলোর দিকে আবার তাকাল রানা, মাছের গায়ে সাজানো আঁশের মত চিক-চিক করছে। 'সত্যি সুন্দর। ভদ্রলোক আইফেল টাওয়ারটাও কিনে আনলে পারতেন।'

রোঁনা হঠাৎ হাসতে গিয়ে বিষম খেলো। 'তুমি সত্যি জানো না?' নিজেকে সামলে নিয়ে রানাকে বেসামাল করতে চাইল সে। 'মিস্টার লাম্বাডা তো ওটা কিনেছিলেন। কিন্তু ফ্রেঞ্চ সরকার তাঁকে এক্সপোর্ট পারমিট দিতে রাজি হয়নি।'

নিঃশব্দ হাসিটা ফিরিয়ে দিল রানা। 'তবে একটা কথা ঠিক, যার অঢেল আছে সে কেন আরামে বসবাস করবে না।'

প্রায় গোলাকার কপ্টার দুর্গের কোণ ঘুরে আরেক পাশে চলে এল। অবলম্বন বা ভারার খোঁজে বৃথাই এদিক ওদিক চোখ বুলাল রানা। দুর্গের সামনে পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে সযত্নে তৈরি করা হয়েছে গাঢ় সবুজ লন। ওখানে পঞ্চাশজন নারী-পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে পাঁচ সারিতে, প্রতি সারিতে দশজন করে।

রানা দৃশ্যটার উপর তীক্ষ্ণ নজর ফেলতে যাচ্ছে, এই সময় সবাই তারা লাফ

দিয়ে সিধে হলো, হাত তুলল যে-যার মাথার উপর, তারপর নিতম্ব ও কোমরে ভর রেখে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বৃত্তাকারে ঘোরাতে শুরু করল। অ্যাক্রব্যাটদের মত আঁটসাঁট কালো ড্রেস পরেছে তারা, প্রথমদর্শনে মনে হতে পারে ব্যালে ক্লাসে অনুশীলন করছে। কিন্তু মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে মুখগুলো উপরে তুলে ধরায় রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর একদল তরুণ-তরুণীকে দেখতে পাচ্ছে ও।

অন্তত, এ-কথা হলপ করে বলা যায় যে এত সুন্দর মানুষ আগে কখনও ওর চোখে পড়েনি। চোখে শুধু প্রশ্ন নয়, অবিশ্বাস নিয়ে রোঁনার দিকে তাকাল ও।

'ওরা অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার ট্রেনিং নিচ্ছে। প্রজেক্টটাকে মিস্টার লাম্বাডা নিজের কলজের একটা টুকরো হিসেবে গণ্য করেন, ওরা সেটার অংশবিশেষ। দা লাম্বাডা করপরেশন অ্যাস্ট্রোনট ট্রেনিং স্কীম।'

'কিন্তু আমার ধারণা ছিল...'

'যেখানে যতই যুদ্ধ হোক, সন্ত্রাস হোক, মৌলবাদ মাথাচাড়া দিক, একদল লোক কিন্তু গবেষণা করে ধনী লোকদের মনোরঞ্জনের জন্যে আশ্চর্য সব জিনিস আবিষ্কার করে যাচ্ছে। ওদের পকেট কাটবার জন্যে উন্নত বিশ্বে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে স্পেস ট্র্যাভেল এজেন্সি। তুমি চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে যেতে চাও? কোটি কোটি টাকা খরচ করে টিকিট কাটো, প্রস্তুতি নাও, তোমার সাধ অবশ্যই পূরণ করা হবে। মিস্টার লাম্বাডার দূরদৃষ্টি আছে, তিনি কয়েক বছর আগেই ব্যবসাটা দেখতে পেয়ে কাজে নেমে পড়েছিলেন। মহাশূন্যে একটা স্টেশন এরইমধ্যে তৈরি করে ফেলেছেন। অ্যাস্ট্রোনটদের ওখানে দু'বছরের জন্যে পাঠানো হবে। বলা হচ্ছে, ওই দু'বছরও তাদের ট্রেনিং পিরিয়ড। ওটা শেষ হলে এখান থেকে পাঠানো ট্যুরিস্টদের নিয়ে চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহ থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবে ওরা।'

'নাসা মিস্টার লাম্বাডাকে অনুমতি দিল?'

'উনি নাসার পিছনে কয়েক বিলিয়ন টাকা ঢালেননি?' অধৈর্য হয়ে উঠল রোঁনা। 'একদল অ্যাস্ট্রোনটকে ট্রেনিং দিতে যে খরচ, রাজার ভাণ্ডারও শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। সব খরচ মিস্টার লাম্বাডা দিচ্ছেন। শুধু কি তাই, সারা দুনিয়ায় তল্লাশী চালিয়ে সবচেয়ে সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান তরুণ-তরুণী খুঁজে আনছেন তিনি...'

'ওদেরকে আমার মিস্টার আর মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার ফাইনালিস্ট বলে মনে হলো।'

রোঁনা হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। 'অনেকেই ওদেরকে দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।'

'কি রকম?'

'মানে...কারও কারও ধারণা, ওরা সম্ভবত এই পৃথিবীর মানুষ নয়। মিস্টার লাম্বাডা ওদেরকে কোনও ভিনগ্রহ থেকে আমদানি করেছেন।' তারপরই খিলখিল

করে হেসে উঠল রোঁনা। হাসি থামতে বলল, 'না, ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত। ওদেরকে দেখলে কেমন যেন লাগে আমার। ঠিক ভয় নয়, আবার ঘৃণাও নয়—যেন অচেনা, যেন আমাদের সঙ্গে মেলে না। মানুষ কি সত্যি এত সুন্দর হয়?'

'এয়ারপোর্টে তোমাকে দেখেও কিন্তু এই প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছিল।'

কন্ট্রোল কলাম ধরা রোঁনার হাত শক্ত হয়ে উঠল। 'তুমি একটা সরল মেয়ের মাথা খাচ্ছ, মিস্টার রানা।' হাত চালাল সে, কপ্টার নীচের দিকে নামতে শুরু করল।

রোটর ব্লেড প্রায় থেমে এল। ইঞ্জিনের গর্জন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। বুদ্বুদের ঢাকনি সরে যেতে সিট-বেল্ট খুলে ছোটখাট টেক-অফ প্যাডে নামল রানা। 'কষ্ট করে নিয়ে এলে, সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল ও।

রোঁনার ঝকঝকে হাসি উজ্জ্বল রোদকেও যেন চ্যালেঞ্জ করতে চায়। 'এনি টাইম,' বলে পাথরের এক প্রস্থ ধাপ দেখাল ইঙ্গিতে।

ধাপ বেয়ে উঠছে রানা, মুখে মরুভূমির গরম বাতাস অনুভব করল। চারপাশ এমন বেখাপ্পা লাগছে যে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ঠিক কোথায় রয়েছে ও। যেন হঠাৎ একটা স্বপ্নের ভিতর চলে এসেছে, যে স্বপ্নটা আসলে বাস্তবতার ফাঁদে আটকা। ধাপগুলোর মাথায় উঠে আসছে ওরা, এই সময় কালো জ্যাকেট আর ডোরাকাটা গ্রে ট্রাউজার পরা এক শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান পরিচারককে ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

'মিস্টার রানার লাগেজ মিনিট কয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবে, মাইকেল,' তাকে বলল রোঁনা। 'ওকে আমি ওর কামরায় পৌঁছে দিচ্ছি।'

'ইয়েস, মিস রোঁনা।' রানা তাকে পাশ কাটাবার সময় ওর উদ্দেশে মাথা নত করে সম্মান জানাল লোকটা। তবে ধাপগুলোর মাথা থেকে নড়ল না, দুই হাত নাভির নীচে এক করে বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তির মত—এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলাচ্ছে আকাশে, যেন শিকারি কুকুর প্রথম ঝাঁক থেকে একটা হাঁস খসে পড়বার প্রতীক্ষায় আছে।

টেরেসের উপর দিয়ে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রোঁনা। লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা পাতাবাহার আর রঙিন ঝোপগুলোকে পাশ কাটাল রানা। তারপর কয়েকটা ফ্রেঞ্চ-উইন্ডো পেরুল, প্রতিটি ফ্রেমের উপর দিক রানার চেয়ে তিনগুণ বেশি উঁচু, তারপরও নকশা খোদাই করা পাথরের সিলিং থেকে বারো ফুট খাটো। ড্রইংরুমটা বিশাল পিকচার গ্যালারির মত বিস্তৃত, অ্যান্টিক ফার্নিচারের গুদাম বললেও অতিরঞ্জিত হবে না, প্রতিটি পালিশ দিয়ে ঝকঝকে করে রাখা হয়েছে। নকশা দেখেই বোঝা যায় পায়ের নীচে পুরু কার্পেটটা পারস্য অর্থাৎ ইরান থেকে আমদানি করা।

বিশাল একজোড়া দরজা দিয়ে মার্বেল হলওয়েতে পৌঁছানো যায়। অসংখ্য কুলঙ্গি আর চোরা-কুঠরির দরজাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। অস্বাভাবিক চওড়া একজোড়া সিঁড়ি পড়ল সামনে, মাঝখানের দেয়ালে ঝুলছে বড় একটা অয়েল

পেইন্টিং–হয় রেমব্র্যান্ট, কিংবা তাঁর নিখুঁত অনুকরণ। বিচার করে রায় দেওয়ার ব্যাপারে নিজেকে প্রায় অজ্ঞ আর অনভিজ্ঞ মনে হলো রানার, যদিও ধারণা করল নকল হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। এরকম বিপুল ধন-সম্পদ প্রদর্শন করবার মধ্যে সামান্য স্থূলতা থাকলেও থাকতে পারে, তবে এ-সব বাইরের চাকচিক্য কি না কে বলবে, আসল উদ্দেশ্য হয়তো ভিতরের কোন রহস্য গোপন করা।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তরতর করে উঠে গেল রোঁনা, পেইন্টিংটাকে ডানে রেখে হাঁটছে। 'এখানে আমরা শুধু দু'জন,' বলল সে। নিজের অজান্তেই রানার একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো। 'মানে, বলতে চাইছি, দুজনের বেডরুমই দৈবক্রমে এই উইং-এ পড়েছে। এরকম বেডরুম গুণে শেষ করা যাবে না।'

দশ কদম পরপর দেয়ালে ঝুলছে ধাতব বর্ম। ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, ভারতীয়, ইরাকি–সব ধরনের বর্মই দেখা যাচ্ছে। ফ্রেঞ্চগুলোর ফেস-পীস বাঁকা ও ধারাল লোহার সিকের মত বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। করিডরটা চওড়া, সিলিং ঢাকা হয়েছে পেইন্ট করা কাঠের ফালি দিয়ে। জানালার কাঁচেও নকশা দেখা গেল, অ্যান্টিক গ্লাসে যেন হলুদ আর নীল হীরের টুকরো বসানো হয়েছে।

একটা দরজার সামনে থেমে কবাট খুলল রোঁনা। 'এটা তোমার অ্যাপার্টমেন্ট। পাশেরটা আমার দরজা।'

'খুব কাছে। এক গ্লাস পানি দরকার হলে কথাটা মনে পড়বে।'

'স্যুইটে ঢুকেই দেখে রাখছি আমার নকল দাঁত ভিজিয়ে রাখার গ্লাসটা ধোয়া আছে কি না।' হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ আবার কর্তব্যসচেতন হয়ে উঠল রোঁনা। 'এখনি আমি মিস্টার লাম্বাডাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তুমি পৌঁছেছ। তোমার লাগেজ এই চলে এল বলে। শাওয়ার ইত্যাদি সেরে তৈরি হতে আধ ঘণ্টা যথেষ্ট তো?'

'ধরে নাও।'

'গুড। ফার্নান্দেজ, মিস্টার লাম্বাডার চিফ বাটলার, তোমাকে নিতে আসবে। তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে আমার।'

'আশা করি,' বলল রানা, করিডর ধরে রোঁনার হাঁটা দেখছে। তারপর নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল ও।

প্রথমেই সিটিংরুম। সমস্ত ফার্নিচার আধুনিক, সম্ভবত ফ্রান্স থেকে আমদানি করা। বেডরুমটা নিশ্চয়ই পুরানো কোন ফরাসী রাজপ্রাসাদ থেকে তুলে এনে বসানো হয়েছে এখানে। বড়সড় ফোর-পোস্টার বেড, মাথার উপর রঙধনু আঁকা সিল্ক-শামিয়ানা। এই বিছানায় কত ফরাসী রাজা আর রানীই না শুয়েছে। সিলিঙে নর-নারীর ছবি আঁকা, সবাই তারা নিজেদের লজ্জা ঢাকতে ব্যর্থ হচ্ছে পরনের কাপড় খসে পড়তে দিয়ে।

দরজায় নরম টোকা পড়ল। কবাট ঠেলে ভিতরে ঢুকল মাইকেল, রানার সুটকেস আর ব্রিফকেস বিছানার কিনারায় রাখল। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা।

তিনদিকে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত টাইলস। একদিকের দেয়াল আর সিলিঙের সবটুকুই আয়না। বাথটাবটা ছোট একটা সুইমিংপুল। সোনালি ব্রাকেটে ঝুলছে তোয়ালে আর রোব।

প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। সুটকেস থেকে নতুন আন্ডারওয়্যার আর ইস্ত্রি করা শার্ট বের করে পরল। বাঁধার পর খুঁটিয়ে দেখে নিল টাইয়ের নটটা নিখুঁত হয়েছে কি না। মিস্টার লাম্বাডার তীক্ষ্ণ বা ধারাল দৃষ্টির সামনে দাঁড়াবার আগে শুধু ক্লান্তি দূর করাটা ওর একমাত্র লক্ষ্য নয়–সযত্নে তেলপানি দেওয়া একটা মেশিন, নিজের সম্পর্কে এই অনুভূতিটাও ফিরে পেতে চাইছে ও। মানানসই পোশাক এতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তবে ওর প্রস্তুতির মধ্যে একটা জিনিসের অভাব থেকে যাচ্ছে। একটা ড্রিঙ্ক হলে খুব ভাল হত।

সিটিংরুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে একটা কেবিনেট দেখতে পেল রানা, দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা চারটে বুলডগ পায়ের উপর। টান দিয়ে একটা দেরাজ খুলতেই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। কেবিনেটটা আসলে বড়সড় রিফ্রিজারেটর, দেরাজগুলো বিভিন্ন কমপার্টমেন্টের দরজা। রিফ্রিজারেটরের ভিতরে দুনিয়ার নাম করা প্রায় সব ধরনের শ্যাম্পেন আর হুইস্কির বোতল পাওয়া যাবে বলে ধারণা করল রানা।

শিভাস রিগালের একটা বোতল দেখতে পেয়ে বের করল। টাম্বলারে বরফের পাঁচটা টুকরো ফেলে দু'আউন্স হুইস্কি ঢালল ও। একটু ঝাঁকিয়ে তিন ঢোকে গলাধঃকরণ করল, প্রতি ঢোকের মাঝখানে দু'মিনিট করে সময় নিয়ে। শরীরটা এখন সতেজ, অথচ এটুকু মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। রানা টের পেল, শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও ভাল কাজ করছে। ফার্নান্দেজ আসতে এখনও দশ মিনিট দেরি আছে, সিদ্ধান্ত নিল দেরিতে হলেও জরুরী কাজটা সেরে ফেলা দরকার।

বেডরুম থেকে শুরু করল রানা। বিছানার পায়ের দিকে একটা হেডবোর্ড রয়েছে, ওটাই প্রথমে দৃষ্টি কাড়ল। কাঠের উপর খোদাই করা একজোড়া মৎস্যকুমারী ভয়ালদর্শন একটা সামুদ্রিক দানবের সঙ্গে প্রেম করছে। দানবটার মুখ খোলা, ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। এরকম কুৎসিত দর্শন একটা সামুদ্রিক প্রাণীর রতিক্রিয়া সুস্থ রুচির কোন মানুষ দেখতে আগ্রহী হবে না। তবে রানা বেশ সময় নিয়ে তাকিয়ে আছে।

তাকিয়ে আছে, কারণ দানবটার বিস্ফারিত চোখ আর বেরিয়ে থাকা সারি সারি দাঁতগুলোর মধ্যে জ্যান্ত একটা ভাব আছে। রানার মনে আছে, ছোটবেলায় খেলনা বাঘ-ভাল্লুক আর কুমিরের খোলা মুখের ভিতর কী প্রচণ্ড সাহস নিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিত ও। কিছু না, স্রেফ নস্টালজিক একটা ঝোঁকের বশে বিছানার উপর উঠে দু'সারি কাঠের দাঁতের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দিল। ভিতরে কিছু নড়ছে দেখে রানা অবাক।

এরপর আর কৌতূহল চেপে রাখে কী করে। ফাঁকটা অনেক লম্বা, আঙুল নাগাল পাচ্ছে না। সুটকেস-এর লাইনিং থেকে সরু একটা মেটাল পিক বের করে আনল ও। সেটা দানবের মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে এক মিনিট চেষ্টা করতেই জিনিসটা বের করে আনতে পারল। চিনল রানা, অত্যন্ত শক্তিশালী একটা মিনিয়েচার মাইক্রোফোন। কপালে চিন্তার রেখা, জিনিসটা ভাল করে দেখে আবার জায়গামত রেখে দিল ও।

রানা জানে, ওটার সুইচ যদি অন করা থাকে, ওর খোঁচাখুঁচির শব্দ সংশ্লিষ্ট সচেতন কানে অবশ্যই পৌঁছেছে। অর্থাৎ ওদের উদ্দেশ্য যাই হোক, ওরা এখন জানে মাইক্রোফোনটার অস্তিত্ব আর গোপন নেই। রানা ভাবল, ঘুমের ঘোরে বলা কথা শুনবার বাতিক আছে নাকি দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী মিস্টার লাম্বাডার? কিংবা আরও নোংরা কোন দুর্বলতা? শ্রবণ করবার যন্ত্র থাকলে চাক্ষুষ করবার যন্ত্র না থাকাটা অবিশ্বাস্য। সেক্ষেত্রে উল্টোদিকের দেয়ালটাই তো মনে হয় আদর্শ জায়গা, তাই না? মাইক্রোফোন পাওয়া আর ক্যামেরা পাওয়া বা না পাওয়ার ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, মেজবানের মুখোমুখি হওয়ার আগ্রহ হঠাৎ করেই কয়েক গুণ বেড়ে গেছে ওর।

দ্রুত বেডরুমটা সার্চ করে রানা কোন খুদে ক্যামেরা দেখতে পেল না।

মৃদু নক হলো দরজায়। সিটিংরুমে এসে দরজা খুলল ও। সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় সাদা চুল নিয়ে প্রায় বুড়ো একজন লোক—চোখে-মুখে বিদ্রূপের ছাপ নেই, কেবল সবজান্তার ভাব, বিগলিত না হয়েও বিনয়ী, আভিজাত্যের অভাব পূরণ করছে পরিচ্ছদ ও আচরণে মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়ে। কালো ট্রাউজার পরেছে, ফ্রক-কোটটাও কালো, তবে আড়াআড়ি ডোরাকাটা ওয়েসকোটটা ধূসর। কালো বো-টাইটা হাতে বোনা। এ লোক মিস্টার লাম্বাডার চিফ বাটলার না হয়েই যায় না।

'আমার নাম ভিনতাস ফার্নান্দেজ, সার। মিস্টার লাম্বাডা আপনার জন্যে তাঁর স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাটলারের পিছু নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। সেটা পার হয়ে আরেকটা করিডরে চলে এল ওরা, এটা অনেক বেশি চওড়া। নতুন এক প্রস্থ সিঁড়িও ভাঙতে হলো। সিঁড়িতে এক তরুণ পাশ কাটাল ওদেরকে, দেখে মনে হলো দ্বিতীয়বার জন্ম নেওয়া শেকস্‌পীয়ার। কাছেই কোথাও কেউ পিয়ানোয় ওয়ালস্ বাজাচ্ছে। কার মনে করতে না পারলেও, রানা জানে সুরটা বিখ্যাত। যেই বাজাক, প্রায় নিখুঁত বাজাচ্ছে। একটা আকাঙ্ক্ষা জাগাবার সার্থক চেষ্টা আছে; কিন্তু ব্যাকুল ভাবটুকু প্রকাশ করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসার প্রবণতা মনে টনটনে একটা ব্যথা ছড়িয়ে দেয়—সঙ্গীতের স্বাধীন সত্তার কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবার অক্ষমতা।

ফার্নান্দেজ একটা হলওয়ে পেরুল। মিউজিকের শব্দ এখানে আরও বেশি। ওরা একটা দরজার দিকে এগোচ্ছে। ওয়ালস্-এর আওয়াজ ওই কামরা থেকেই

বেরুচ্ছে বলে মনে হলো। কিন্তু ফার্নান্দেজ যখন হাত দিয়ে দরজাটা খুলতে গেল, নাটকীয়ভাবে তার ঠিক আগের মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল বাজনাটা। 'মিস্টার মাসুদ রানা, সার।'

রানা চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকছে, অনেকটা দূরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পিয়ানো ছেড়ে সিধে হতে দেখে স্বভাবতই ভূত দেখার মত চমকে উঠতে হলো। স্বপ্ন দেখছে? বিস্ময়ে স্তম্ভিত হওয়ারও সময় পাওয়া গেল না, অশীতিপর বৃদ্ধ ভদ্রলোক অবিশ্বাস্য দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছেন ওর দিকে। দূরত্ব কমছে, সেই সঙ্গে রানার বিস্ময়ও। না, হুবহু টেগোর নন। ললাট মেলে, মেলে দাড়ি, নাক, পক্বকেশ; কিন্তু মেলে না দৈর্ঘ্য, গায়ের ত্বক, শারীরিক কাঠামো। আলবার্তো কার্তেজ লাম্বাডা প্রায় ছয় ফুট লম্বা, চওড়ায় একটা গরিলার সমান, তাঁর খাড়া কাঠামো একটু পিছন দিকে হেলানো, গায়ের চামড়া উজ্জ্বল হলদেটে।

বিস্ময় কেটে যাওয়ার পর রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল স্টাডির আয়তন। স্টাডি শুনে ওর ধারণা হয়েছিল বই-পত্রে ঠাসা ছোটখাট একটা কামরা হবে। বই বলতে এখানে দেখা যাচ্ছে চামড়া দিয়ে বাঁধানো ভলিউম-এর অসংখ্য স্তম্ভ, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঠে গেছে। কামরাটা আকারে ছোটখাট একটা কনসার্ট হল, তবে এরচেয়ে ছোট কিছু উপস্থিত ভদ্রলোকের সঙ্গে মানাত বলে মনে হয় না। অ্যান্টিক ফার্নিচারগুলোকে পাশ কাটিয়ে ত্রস্ত ভঙ্গিতে এখনও ওর দিকে এগিয়ে আসছেন তিনি।

আরও কাছে আসতে অন্য আরেক রকম বিস্ময় জাগল রানার মনে। ভদ্রলোকের বয়স যে আশির উপর, তাতে কোন সন্দেহ নেই—অথচ নিজেকে তিনি একজন তরতাজা তরুণের ভূমিকায় দেখাতে চাইছেন, এবং কী এক জাদুবলে তাতে তিনি সফলও হচ্ছেন।

'মাসুদ রানা!' গমগম করে উঠল ল্যাটিন বাচনভঙ্গিতে সমৃদ্ধ, ভরাট কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো, ফ্রেন্ড, হ্যালো। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' প্রকাণ্ড থাবাটা শুকনো চামড়া দিয়ে মোড়া মনে হলো, রানা ভাবছে এই কর্কশ হাত দিয়ে একজন মানুষ এত সুন্দর পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন কীভাবে।

'সত্যি কথা বলতে কী, তোমাদের সরকার এরকম একটা স্পর্শকাতর মিশনে তোমাকে পাঠানোয় আমি সম্মানিত বোধ করছি।' মিস্টার লাম্বাডার কণ্ঠে ঝাঁঝাল বিদ্রূপের সুর রানার ভাল লাগল না।

'স্পর্শকাতর?'

'সশরীরে উপস্থিত হয়ে আমার স্পেস শাটল খোয়ানোর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছ, কাজেই ব্যাপারটাকে আমি এভাবেই দেখছি।' বয়সের তুলনায় অবিশ্বাস্য দ্রুত বেগে ঘুরলেন কার্তেজ লাম্বাডা, দেয়ালের একটা ব্রাকেট থেকে রুপোর তৈরি একজোড়া সাঁড়াশি নিলেন, তারপর হাত তুলে র‍্যাক থেকে নামালেন ঢাকনি সহ একটা প্লেট। কামরার দূরপ্রান্তে কী যেন নড়ে উঠল। পর মুহূর্তে দেখা

গেল গ্র্যান্ড পিয়ানো থেকে যে-পথ ধরে মনিব হেঁটে এসেছেন সেই একই পথ ধরে এগিয়ে আসছে একজোড়া ডোবারম্যান পিনশার। ওগুলো সরাসরি রানার সামনে এসে দাঁড়াল, এমন লোভাতুর দৃষ্টিতে ওকে দেখছে যেন বুঝতে চায় খেতে কেমন স্বাদ লাগবে। প্লেটের ঢাকনি খুলে কাঁচা মাংসের দুটো বড় টুকরো ওগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিলেন কার্তেজ লাম্বাডা। মাংসের দিকে তাকাল ডোবারম্যান দুটো, তারপর চোখে প্রত্যাশা নিয়ে মুখ তুলল মনিবের দিকে।

ভদ্রলোক রানার দিকে ফিরলেন, মুখের টান-টান চামড়ায় কিছু রেখা তৈরি হলো, ফলে হাসিটা হয়ে উঠল শ্লেষাত্মক। 'অস্কার ওয়াইল্ড বেঁচে থাকলে কীভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করতেন? একটা এয়ারক্রাফট হারানোকে হয়তো দুর্ভাগ্যজনক বলা যেতে পারে। কিন্তু দুটো হারিয়েছে দেখলে মনে হয় অবহেলা দায়ী। এ-ধরনের অবহেলাকে অনেকেই অক্ষমনীয় অপরাধ বলে গণ্য করেন।'

রানাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তর্জনী খাড়া করলেন কার্তেজ লাম্বাডা। কুকুর দুটো মাংসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, প্রায় চোখের পলকে দেখা গেল যেখানে মাংস ছিল সেখানকার কার্পেট চাটছে ওগুলো। কার্তেজ লাম্বাডাকে অপছন্দ হওয়ার গতি ও মাত্রা এত দ্রুত বাড়ছে, রানা নিজেই অবাক হয়ে গেল। হাতের সাঁড়াশি অকারণে এমন ভাবে দোলাচ্ছেন ভদ্রলোক, রানার জুতো ছুঁতে ছুঁতেও ছুঁচ্ছে না। ও কথা বলল শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে।

'আপনি এত বড় সফল একজন ব্যবসায়ী হয়ে এরকম হাস্যকর ভুল করছেন, বিশ্বাস করতে পারছি না। দুঃখ প্রকাশ যদি কাউকে করতেই হয়, সেটা প্রথমে করবে ভারতের কাছে রাশিয়া, কারণ রাশিয়ানরাই নাসার মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে কিনে নিজেদের তৈরি বলে ভারতের কাছে বিক্রি করেছিল ওই পক্ষিরাজকে। এরপর ক্ষমা চাওয়ার কথা আপনার।'

'আমার? আমার!' কার্তেজ লাম্বাডার হতচকিত ভাবটা রানার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলে মনে হলো।

'এই জন্যে যে ওই স্পেস শাটলে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি ছিল বা কন্ট্রোল মেকানিজমে এমন কোন কারিগরি ফলানো হয়েছিল যে সেটা আপনা থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'অদৃশ্য হয়ে গেছে?'

'অন্তত তাই ধরে নিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটার ভাঙা টুকরোগুলো আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি,' বলল রানা। 'সুন্দরবনের যেখানে বোয়িংটা ভেঙে পড়েছে ওখানে নদীটা বেশ চওড়া। যাই হোক, এই ঘটনার জন্যে বাংলাদেশ নিজেকে দায়ী বলে মনে করছে না, আমিও আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে আসিনি। আমি এসেছি গোটা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে, কেউ যাতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক অপবাদ দিতে না পারে।'

প্রকাণ্ড হাত দুটো উদার ভঙ্গিতে দু'পাশে মেলে ধরলেন কার্তেজ লাম্বাডা। 'তোমার দেশপ্রেম সত্যিই আমার মনে শ্রদ্ধা জাগায়–সিনসিয়ারলি অ্যান্ড

সিরিয়াসলি স্পিকিং, মিস্টার রানা।' ঠিক বোঝা গেল না কথাটা ব্যঙ্গ করে বলা কী না।

'পক্ষিরাজের নিখোঁজ রহস্য নিয়ে আপনার মনেও নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ আছে,' বলল রানা। 'দয়া করে আমাকে যদি বলেন সেটা কী।'

'নিখোঁজ হওয়ার জায়গা থেকে আপনাকে স্রেফ পাঁচ-সাতশো মাইল উত্তরে তাকাতে হবে। ডচন, মিস্টার রানা!' কার্তেজ লাম্বাডার কণ্ঠ থেকে কৃত্রিম উল্লাস ঝরে পড়ল। 'সাধ্য নেই, কিন্তু চাঁদে যাওয়ার সাধ আছে, কাজেই একটা স্পেস শাটল চুরি না করে ওদের উপায় কী বলুন। তবে কাজটা ওরা ভাল করেনি। আমাকে বললেই পারত, আমি অনেক কম দামে একটা স্পেস শাটল দিতে পারতাম ওদেরকে। প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, জিজ্ঞেস করায় কোন গর্ব বা অহংকার প্রকাশ পাবে বলে মনে করি না–তুমি জানো তো, ব্যক্তি হিসেবে আমি একাই আমেরিকার স্পেস প্রোগ্রামের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছি? একটা কেলেঙ্কারির মত শোনায়, তাই না?'

'সব বড় ব্যবসাই আসলে তাই,' বলল রানা। 'তবে অনেক বড় ব্যবসায়ীর মধ্যে দেশপ্রেমও দেখা যায়। আপনার বেলায় বোধহয় কথাটা খাটে না, কারণ আপনি তো ঠিক মার্কিন নন, অর্থাৎ উত্তর আমেরিকান নন।'

'আমি জন্মসূত্রে উত্তর আমেরিকান হলেও যা কিছু করেছি আর করছি তার মধ্যে দেশপ্রেম আছে বলে দাবি করতাম না।' কার্তেজ লাম্বাডা হাসছেন, তবে সে হাসিতে প্রচুর তিরস্কার। 'মিস্টার রানা, আমি আশা করেছিলাম বিশ্ব কবির সঙ্গে আমার চেহারার খানিকটা মিল দেখে তুমি শুধু বিস্মিতই হবে না, আমার সম্পর্কে একটা ধারণাও করে নিতে পারবে। তা তুমি পারোনি, কাজেই নিজের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হবে আমাকে। আমি দেশ নয়, মিস্টার রানা, বিশ্বকে ভালবেসেছি। এ প্রসঙ্গ আজ এখানেই শেষ হোক, পরে যদি কখনও সুযোগ পাও বিশদ শুনবে।'

ক্লিক করে একটা আওয়াজের সঙ্গে হঠাৎ কামরার ভিতর তৃতীয় এক ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটল। একজন জাপানি; কাঠামোটা ছোটখাট, কিন্তু দেখতে যেন দৈত্যাকার একটা লাটিমের মাথা। ঘাড় আছে কি নেই বোঝা যায় না, শরীরের ফুলে ওঠা মধ্যভাগের পরিধি তার মাংসের উপর প্রবল টান সৃষ্টি করাতেই বোধহয় চোখ দুটোকে শুকনো ক্ষতের মত সরু একজোড়া দাগ বলে মনে হচ্ছে, নীচের দিকে ঝুঁকে যেন কানের লতি ছুঁতে চায়। মাথার সমস্ত চুল পিছনে এক করে বেঁধে ছাগলের লেজ তৈরি করা হয়েছে। কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে সে, হাতে একটা রূপালি ট্রে, তাতে চায়ের সরঞ্জামসহ স্যান্ডউইচ দেখা যাচ্ছে। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রানার মনে হলো ওটা চোখের চেয়েও সরু আরেকটা দাগ। দুচোখের চকচকে, ভেজা-ভেজা ভাব বলে দিচ্ছে চামড়ার ভাঁজের পিছন থেকে রানাকে খুঁটিয়ে পরখ করবার চেষ্টা চলছে।

'টেবিলে, কোইচি,' বললেন লাম্বাডা, হাত দিয়ে টেবিলের নির্দিষ্ট একটা

জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন। 'বৈকালিক চা, প্লিজ, মিস্টার রানা।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার লাম্বাডা।' মাথা নাড়ল রানা। 'চা খুব কমই খাই আমি।'

বৃদ্ধের চোখে হতাশার ম্লান ছায়া পড়ল। 'তুমি আমাকে অতিথি সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারো না, ইয়াংম্যান। অন্তত একটা কিউকাম্বার স্যান্ডউইচ নাও।'

'না, ধন্যবাদ, শশা আমি পছন্দ করি না।' কোইচি প্লেটটা সামনে বাড়িয়ে ধরতে একটা হাত তুলে বাধা দিল রানা, আরেকবার লক্ষ করল চকচকে ফাটল দুটো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে ওকে। লোকটার হাতের উপরের অংশ সাধারণ একজন মানুষের ঊরুর চেয়ে কম মোটা নয়। লোকটা যেন সুমো কুস্তিগিরের বনসাই সংস্করণ। তার শারীরিক শক্তি ভয় পাওয়ার মতই প্রচণ্ড হওয়ার কথা। 'আপনার ফ্যাক্টরির নাম আবাবিল কেন রাখলেন?' কার্তেজ লাম্বাডার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না দেখবার জন্যই হঠাৎ প্রশ্নটা করল রানা।

'পাখির নামে নাম। স্পেস শাটল তো আসলে যান্ত্রিক পাখিই: মহাশূন্যে উড়তে পারে। তুমি কি এই নামকরণের পিছনে গূঢ় কোন তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছ, মিস্টার রানা?'

'আবাবিল পাথর ছুঁড়েছিল, তাই না?' তীরটা ছুঁড়ে চুপ করে থাকল রানা।

'ভেরি স্মার্ট!' প্রকাণ্ড ধড় থেকে বেরিয়ে আসা হাসিটাও গমগমে শোনাল রানার কানে। 'তবে আমি তোমাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আমার বিশ্বপ্রেম আশীর্বাদ বর্ষণ করবে, কখনওই অভিশাপ নয়।'

'আবাবিল বা পক্ষিরাজ, যাই বলি, এ-পাখির পুরোটাই কি ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরি করা হয়েছে?'

বার দুই চিবিয়েই একটা কিউকাম্বার স্যান্ডউইচ গিলে ফেললেন লাম্বাডা, তারপর জবাব দিলেন। 'জোড়া লাগানো হয়েছে, হ্যাঁ। তৈরি করা, না। সারা দুনিয়া জুড়েই লাম্বাডা করপরেশনের অসংখ্য সিস্টার কনসার্ন ছড়িয়ে আছে, সুবিধে মত জায়গায় কমপোনেন্টগুলো তৈরি করা হয়।' শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। 'স্পেস শাটল তৈরি ও বিক্রি ব্যবসা হলেও, আমার আদর্শ ও লক্ষ্য কিন্তু শুধুই টাকা কামানো নয়। স্পেস বা মহাশূন্যকে আমি একটা অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করি। প্রচলিত অর্থে ক্ষতিকর অস্ত্র নয়। মানবজাতির জন্যে মস্ত উপকারী একটা অস্ত্র।'

রানা লক্ষ করল, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন কার্তেজ লাম্বাডা। খোলা মাঠে অ্যাস্ট্রোনটদের নানারকম কসরত করতে দেখা যাচ্ছে। এরা সম্ভবত নতুন একটা ব্যাচ। 'আপনি বিশ্ব-প্রেমিক, আপনার বিশ্বপ্রেম অভিশাপের বদলে আশীর্বাদ বর্ষণ করবে, মহাশূন্যকে আপনি মানব জাতির জন্যে মস্ত উপকারী একটা অস্ত্র বলে বিবেচনা করেন–এসব শুনতে কেমন যেন লাগছে। আপনার শরীর খারাপ করেনি তো?'

'ওদিকেই তো মহাত্মা গান্ধীর জন্ম, তাই না? তবে না, তুমি তাঁর ভক্ত নও।'

'কি করে বুঝলেন?'

'খোঁচাও তো এক ধরনের ভায়োলেন্স।' অশীতিপর বৃদ্ধ, অথচ এখনও শক্ত-সমর্থ কার্তেজ লাম্বাডা হাসছেন। 'মহাত্মা গান্ধী নন-ভায়োলেন্ট পন্থা অবলম্বন করতে বলে গেছেন।' একটু পিছিয়ে রাইটিং ডেস্কের পাশে থামলেন, চাপ দিলেন একটা বোতামে। 'সব ব্যবস্থা করা আছে, যাও, ঘুরে দেখে এসো আমার ইনস্টলেশন। আমরা এখানে কীভাবে কী করছি তোমার জানা দরকার। আবাবিল···পক্ষিরাজকে নিয়ে কথা হবে ডিনারে বসে। তোমাকে আমি ঠিক সাড়ে সাতটায় ডাইনিং হলে দেখতে পাব বলে আশা করি।'

তিনি থামতেই একটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রোঁনা।

'মিস ফিলিপা তোমাকে ডক্টর রায়-এর কাছে পৌঁছে দেবে। ডক্টর রায় কোথায় কী আছে সব জানেন। প্লিজ, মনে যে প্রশ্নই জাগুক, জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ বোধ কোরো না।'

'যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা, ঠাণ্ডা মুখে কোন রকমে একটু শুকনো হাসি ফোটাতে পারল।

'আ প্লেজার।' একটা পা বাড়ালেন কার্তেজ লাম্বাডা, যেন অতিথিকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু কী মনে করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'কুকিমোরা কোইচি,' বলে হাতের খালি কাপটা জাপানি লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। ইতোমধ্যে কামরা থেকে রানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে রোঁনা। 'আমি চাই মিস্টার রানার ওপর তুমি নজর রাখো,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি। 'লক্ষ রাখো, ওর যাতে কিছু ক্ষতি হয়।'

চার

গলফ্ কার্ট-এর মত দেখতে ছোট একটা গাড়িতে চড়িয়ে কাঁকর ছড়ানো ড্রাইভওয়ে ধরে রানাকে নিয়ে যাচ্ছে রোঁনা। রানার ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করে উঠল, অনুভব করল লম্বা জানালা দিয়ে ওর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে কেউ। গাড়িটা বাঁক নেওয়ার সময় উঁচু জানালাগুলোর দিকে চোখ বুলাবার সুযোগ পাওয়া গেল। কেউ কোথাও নেই, অথচ অনুভূতিটা থেকেই গেল।

রোঁনা কোন কথাই বলছে না। ওর মন-মানসিকতা লক্ষ করে মেয়েটা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছে মিস্টার লাম্বাডার সঙ্গে ইন্টারভিউটা ভাল হয়নি। 'তোমার মালিক কেমন মানুষ?' এ-ধরনের প্রশ্ন করে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করবে কি না ভাবল রানা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। কাউকে এখন বিশ্বাস করাটা উচিত হবে না। পরে দেখা যাবে।

পপলার গাছের সারিকে ছাড়িয়ে এসে একটা সেতু পার হলো ওদের কার্ট, পিছনে পড়ে থাকলো ফ্রেঞ্চ রেনেসাঁ শ্যাতো। খোলা একটা মাঠের ওপারে প্রকাণ্ড আকারের প্রথম হ্যাঙ্গারটা। মাঠে সারি সারি ঝোপ আর ফুলের চারা লাগানো হয়েছে, তবে এখনও সেগুলো বড় হয়নি। হ্যাঙ্গারটাকে পাশ কাটাল ওদের খুদে গাড়ি, থামল এসে কাঁচ দিয়ে মোড়া একটা দালানের সামনে। দেখে মনে হলো অফিস বিল্ডিং।

'আমি তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি,' বলল রোঁনা। 'ভেতরে ঢুকে একটা প্যাসেজ পাবে। রিসেপশন ডেস্ক ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে। শেষ মাথার দরজাটাই ডক্টর রায়ের।'

'আজ রাতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে,' বলল রানা।

'আসলে বলতে চাইছ সন্ধ্যায়।' শুভ কামনা জানাবার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে নাড়ল রোঁনা, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দুর্গের দিকে ফিরে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রানা ভাবল ডক্টর রায় কেমন মানুষ কে জানে। সম্ভবত শুকনো খটখটে চেহারার একজন বিজ্ঞানী, দুর্বোধ্য টেকনিক্যাল ভাষায় ছাইপাঁশ কী বলেন কিছুই বোঝা যায় না। এ-ধরনের মানুষ আগেও দেখেছে ও–অ্যাটম ভাঙতে পারেন, কিন্তু জানেন না নিজের সাদা কোটের কাঁধে খুস্‌কি পড়া কীভাবে বন্ধ করা যায়।

দালানের ভিতর ঢুকে করিডর ধরে এগোচ্ছে রানা। খালি রিসেপশন ডেস্কটাকে পাশ কাটিয়ে এল। আরও কিছুদূর যেতে উল্টোদিক থেকে পরমাসুন্দরী একটা মেয়েকে হেঁটে আসতে দেখল, পরে আছে কাঁধ থেকে উরুসন্ধি পর্যন্ত ঢাকা কালো লিটার্ড–অ্যাক্রব্যাট বা ব্যালে ডান্সাররা যেমন পরে। গায়ের রঙ লিটার্ডের সঙ্গে ম্যাচ করে, কাঁধে ফেলে রেখেছে উল দিয়ে বোনা একটা জ্যাকেট। উপরের ঠোঁট যেখানটায় দুষ্ট ভঙ্গিতে বাঁক নিয়েছে, তার ঠিক উপরে খুদে দুফোঁটা ঘাম জমেছে; রানা আন্দাজ করল, অ্যাস্ট্রোনট যারা ট্রেনিং নিচ্ছিল তাদের সঙ্গে এই মেয়েটিও বোধহয় ছিল। বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকবার সুযোগ হলো রানার। মেয়েটা কে বা কী? হঠাৎই প্রশ্নটা জাগল মনে। সে-ও অপলক চোখে দেখছে ওকে। তারপর আশ্চর্য এক চিলতে হাসি ফুটল মুখে, যেন রানার সঙ্গে কোন এক প্রতিযোগিতায় এই মাত্র জিতেছে।

এই হাসি দেখেই তার চেহারার সঙ্গে প্রিন্সেস ডায়ানার মিল খুঁজে পেল রানা। হাঁটার ভঙ্গিটা এমন সাবলীল, এমন অনায়াস, যেন সে উড়ে আসছে। এমন ভরাট যৌবন কোন মেয়ের শরীরে থাকতে পারে, বিশ্বাস হতে চাইছে না। রানাকে পাশ কাটাল যেন ভিনগ্রহের কোন মায়াবিনী। ও ঘামতে শুরু করেছে। এক মুহূর্ত পর ঘাড় ফিরিয়ে যখন পিছনে তাকাল, মেয়েটা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। চোখের পলকে এতটা দূরে কীভাবে গেল, রানার মাথায় ঢুকছে না। নাকি ঘাড় ফেরাতে অনেক বেশি সময় নিয়েছে ও? সময়ের বিচিত্র কারসাজি হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে সেই অনুভূতিটা আরেকবার ফিরে এল মনে–ও যেন অবাস্তব একটা

জগতে চলে এসেছে। প্রাচীন ফ্রেঞ্চ দুর্গের সঙ্গে ম্যানিকিন মানের অতিমাত্রায় সম্পদশালী নারীদেহ বা স্পেস ল্যাবরেটরির আলট্রা-মডার্ন টেকনোলজি একদমই মানায় না।

করিডর ধরে আরও কিছুদূর এগোবার পর 'ডক্টর টি. রায়' লেখা একটা দরজার সামনে থামল রানা। নক করল, কিন্তু ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। চাপ দিতে কবাট নিজে থেকেই খুলে যাচ্ছে দেখে করিডরের দু'পাশে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। কেউ কোথাও নেই। দ্বিতীয়বার নক করতেও কেউ সাড়া দিল না। চৌকাঠ পেরিয়ে একটা আউটার অফিসে পা রাখল। সেক্রেটারির একটা ডেস্ক আর কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে সাঁটা কিছু চার্ট। তবে খালি কামরা। হয়তো ইনার অফিসে কেউ আছে। ওটার দরজা আধ ইঞ্চির মত ফাঁক হয়ে রয়েছে। এগিয়ে এসে কবাটে একটু চাপ দিল রানা।

ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে জাম্পসুট পরা মেয়েটা; কাঠামোটা একহারা হলেও, ভরাট নিতম্ব আর সরু কোমর সহ ফর্সা পিঠ এত উত্তেজক যে রানার গলা নিমেষে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসতে চাইল। আরে!–ভাবল রানা–এ দেখছি 'চাঁদের আলোয় যার পানে চাই তারেই লাগে ভালো!'

কাঁধ দুটো অল্প ঢালু। মাখনের মত ঘাড় দেখা যাচ্ছে, কারণ সব চুল এক করে মাথার উপর খোঁপা বাঁধা হয়েছে। একটা ফ্লো চার্টে চোখ বুলাচ্ছে সে, কেউ ভিতরে ঢুকছে বুঝতে পেরে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, কালো দীঘল চোখ থেকে যেন তীর বেরিয়ে এসে গেঁথে ফেলতে চাইল রানাকে।

মেয়েটার কপাল একটু উঁচু, নাকটা খাড়া, ঠোঁট লম্বা। চোয়ালে কর্তৃত্বের একটা ভাব কারুরই দৃষ্টি এড়াবে না। তবে সুগঠিত স্তনযুগলের বাইরে ফুটে থাকা রেখা বা আকৃতি ওই ভাবের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। এ যেন এমন এক মেয়ে, যে পুরুষের মত গুরুত্ব পেতে ইচ্ছুক। পুরুষশাসিত সমাজে এরকম দু'চারটে নমুনা মাঝে-মধ্যে দেখেছে রানা। পার্সোনাল সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতে করতে এরা নিজের বসের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

'গুড আফটারনুন,' বলল রানা। 'আমি ডক্টর রায়কে খুঁজছি।'

মেয়েটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। 'আপনি এইমাত্র তাকে খুঁজে পেয়েছেন।' হাসিটা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কিছু নয়।

'আ-আপনি!' তোতলাবার পর রানার খেয়াল হলো, এতটা বিস্মিত হওয়া উচিত হয়নি ওর।

'জ্বী, আমি।' ভারী সুন্দর একটা ভঙ্গিতে উপর-নীচে মাথা দোলাল মেয়েটা। 'আপনি মাসুদ রানা।' তারপর বিড়-বিড় করল, 'গিল্টি মিয়া কেমন আছে?'

'বন্ধুরা শুধু রানা বলেই ডাকে।' হঠাৎ রানার সন্দেহ হলো। 'আপনি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন?'

মেয়েটা হাত বাড়াল। 'তাপসী রায়।' হাতটা দৃঢ় আর শুকনো, তবে চাপ যতটুকু না দিলে নয়। এই হ্যান্ডশেকও আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। 'না, কী জিজ্ঞেস

করব।' তারপর আবার তার ঠোঁট নড়ল, 'নতুন কিছু জানবার থাকলে তো জিজ্ঞেস করব। তবে, এখানে কোন সুবিধে হবে না, মিস্টার লেডিকিলার।'

'আপনিও কি ওদের মত অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার ট্রেনিং নিচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ডক্টর তাপসীর বিড়বিড় করার অভ্যাসটা ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।'

তাপসী বন্ধ ঠোঁট জোড়া এমন ভঙ্গিতে একটু ফাঁক করল যেন মুহূর্তের জন্য তীব্র ব্যথা পেয়েছে। 'নাসা থেকে পুরোপুরি ট্রেনিং নেয়া আছে আমার। ওদেরই চাকরি করি, এখানে কনসালট্যান্ট-কাম-অবজারভার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।' রানার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার মেপে নিল। 'আসুন, মিস্টার রানা। আপনাকে চারধারটা ঘুরিয়ে দেখাই। স্পেস শাটল খুঁজতে এসে নিশ্চয়ই আপনি সময় নষ্ট করতে চান না?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মেয়েটার পিছু নিল রানা। দেখা যাচ্ছে লাম্বাডা করপরেশনে ভাল কোন বন্ধু খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। ডক্টর তাপসী রায়ের সঙ্গে ওর পরিচয় পর্বটা মোটেও আশাপ্রদ কিছু হলো না।

ওরা প্রথম যে হ্যাঙ্গারে ঢুকল সেখানে একটা আবাবিল স্পেস শাটল জোড়া লাগানো হচ্ছে। গার্ডদের পাস দেখাল তাপসী, তারপর দুটো সাউন্ডপ্রুফ দরজা পেরিয়ে বিশাল ওঅর্কশপে চলে এল ওরা। চারদিকে অসংখ্য ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে। নানা রকম আলোর বিচ্ছুরণে চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। শাটলটার ফ্রেমওঅর্ক একটা রকেটের মত খাড়া হলো; বিভিন্ন স্তরে ঘিরে থাকা ভারাগুলোয় দাঁড়িয়ে লোকজন ওটার উপর কাজ করছে–যেন একটা মৌচাকের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মৌমাছি।

'এখানকার প্রতিটি মানুষ কোন না কোন বিষয়ে স্পেশালিস্ট টেকনিশিয়ান,' ব্যাখ্যা করল তাপসী, সমস্ত শব্দ জটকে ছাপিয়ে উঠল তার মিষ্টি সুরেলা নারীকণ্ঠ। 'মিস্টার লাম্বাডা অনেক বেশি বেতন দিয়ে এখানে ধরে রেখেছেন, তা না হলে ওঁরা সবাই নাসায় শিক্ষকতা করতেন।'

'এখানে দেখছি কারুরই দম ফেলবার ফুরসত নেই,' বলল রানা। 'ওঁরা কি সব সময় এরকম ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করেন?'

'মিস্টার লাম্বাডা নির্দিষ্ট একটা তারিখে কাজটা শেষ করতে বলে দিয়েছেন। আগামী মাসের শেষ দিকে আউটার স্পেসে একটা টেস্ট চালাবেন তিনি।'

মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল রানা, কী দেখছে উপলব্ধি করতে পেরে শঙ্কা আর শ্রদ্ধা মেশানো একটা অনুভূতি জাগল ওর মনে। এই নভোযান সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পর পৃথিবীকে ঘিরে অসংখ্যবার চক্কর দেবে, তারপর আবার প্রয়োজনে ওটাকে ঘাঁটিতে নামিয়েও আনা যাবে ঠিক প্রচলিত একটা সাধারণ অ্যারোপ্লেনের মত। কোন প্যারাশুট ব্যবহার করবার দরকার হবে না। কার্তেজ লাম্বাডাকে যতই অপছন্দ হোক, ভদ্রলোকের কর্মকাণ্ড দেখে ওর মনে শ্রদ্ধাবোধও জাগছে বৈকি। তিনি তাঁর বিপুল পুঁজি মানবসভ্যতার বিশেষ একটা উপকারে ব্যয় করছেন, এটাকে খাটো করে দেখবার কোন উপায় নেই–ব্যক্তিগত আচরণ যতই বাজে ও

আপত্তিকর হোক।

কিছু স্টাটিসটিক্স, কিছু টেকনিকাল ধাঁধা রানার মগজে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করল তাপসী, রানা শুধু নিজের আগ্রহ জন্মায় এমন কিছু তথ্য আর বাক্যাংশ মনে রাখবার চেষ্টা করল। যেমন: কার্তেজ লাম্বাডার নিজস্ব স্পেস স্টেশনের নাম 'দ্য নিউ স্টার্টিং পয়েন্ট'; ওটা পৃথিবীর বুক থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে মহাশূন্যে স্থির হয়ে ভাসছে; সব মিলিয়ে একশো আশিজন অ্যাস্ট্রোনটকে স্পেস স্টেশন দ্য নিউ স্টার্টিং পয়েন্টে বিশেষ ট্রেনিঙের জন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি, ওখানে তারা দু'বছর থাকবে।

তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস-পত্রের বেশিরভাগই আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, অল্প কিছু যা বাকি আছে সে-সব তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন; হ্যাঁ, অ্যাস্ট্রোনটদের সঙ্গে মিস্টার লাম্বাডাও দু'বছর থাকবেন ওখানে।

সংলগ্ন কয়েকটা দরজা পার হয়ে আরেকটা প্রকাণ্ড হ্যাঙ্গারে চলে এল ওরা। ক্যাটওয়াকে চড়তে হলো এলিভেটরের সাহায্যে। ক্যাটওয়াক থেকে নীচে তাকিয়ে একদল শিক্ষানবিস অ্যাস্ট্রোনটকে দেখতে পেল রানা, দুনিয়া খ্যাত প্রতিভাবান মনীষীদের সঙ্গে তাদের চেহারার আশ্চর্য মিল। তারা জিনিসটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে একটা বিমানের ককপিট বলে মনে হলো—হাজার রকম তার, কেব্‌ল্‌, পাইপ আর জোড়া লাগানো রডের সমষ্টি ওটাকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে। একজন শিক্ষানবিসকে ককপিটে চড়ে কন্ট্রোলে বসতে দেখল রানা। তাপসী জানাল, এই একই রকম ককপিট আর কন্ট্রোল প্রতিটি আবাবিল স্পেস শাটলে আছে বা থাকবে। তরুণ অ্যাস্ট্রোনট নিজের জায়গায় ঠিকমত বসবার সুযোগও পায়নি, ককপিট একই সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি খেতে আর দুলতে শুরু করল। চোখে উদ্বেগ, তাপসীর দিকে তাকাল রানা।

মেয়েটা শান্ত ভঙ্গিতে চুলের একটা গোছা আঙুল দিয়ে কানের পিছনে সরিয়ে দিল। 'আপনি একটা ফ্লাইট সিমুলেটর দেখছেন,' বলল সে। 'অ্যাকচ্যুয়াল ফ্লাইট কন্ডিশনে সম্ভাব্য যে-সব সমস্যা দেখা দেবে এই ককপিট তার সবগুলোই তৈরি করতে পারে।'

সিমুলেটর হঠাৎ করেই সামনের দিকে ছুটল, তারপর প্রায় খাড়া ভাবে শূন্যে উঠে গেল—মেটাল রডগুলো চোখের পলকে বেঁকে যাচ্ছে। ককপিটের সঙ্গে দিক ও গতি বজায় রেখে ঘুরে যাচ্ছে একটা টিভি ক্যামেরা। ফিউজিলাজ হড়কে পিছিয়ে এল, তারপর লাফ দিল একপাশে—গুলি করবার পরপরই একটা রিভলভারের চেম্বার যেভাবে ঘুরে যায়। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বলে রানা খুশি। উল্টোদিকের ক্যাটওয়াকে চোখ পড়তে জাপানি কোইচিকে দেখতে পেল ও, অকারণ ঘৃণা আর বিদ্বেষ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে দুই হাত আড়াআড়ি ভঙ্গিতে বুকে বাঁধল। আরও কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ ঘুরে পাশের একটা দরজার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

'টেকনিকাল দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ,' বলল তাপসী, সুর শুনে মনে হলো এই

লেকচার আগেও বহুবার দিয়েছে। 'তবে ষোলো আনা ফিজিকাল ফিটনেস না থাকলে কোন সাবজেক্টই চরম উৎকর্ষ দেখাতে পারবে না–সে মেয়েই হোক বা ছেলে।' শেষ কথাটা বলবার সময় রানার দিকে এমন চোখা দৃষ্টিতে তাকাল, রানার সন্দেহ হলো মেয়েটা হয়তো ওর মেডিকেল রিপোর্ট পড়েছে। 'এরপর আমরা দেখতে যাব ফিজিকাল ফিটনেস অর্জন করবার জন্যে কী প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।'

তাপসীর পিছু নিয়ে কাছাকাছি একটা এলিভেটরে চড়ল রানা। ওটা থেকে নামল মাথায় 'জিমনেশিয়াম' লেখা একটা দরজার সামনে। খোলা কবাটের ভিতর জায়গাটা এত বড় যে ফুটবল খেলবার মাঠ বানাবার পরও হাজার দুয়েক দর্শকের জন্য সিট ফেলা যাবে। ভল্টিং হর্স, উডেন বার, রোপস্–সমস্ত উপকরণই দেখা যাচ্ছে। কালো লিটার্ড পরা পরমাসুন্দরী আট-দশটা মেয়ে ড্রাম আকৃতির ধড় বিশিষ্ট ইন্সট্রাকটারের নির্দেশে প্যারালেল বার-এ অনুশীলন করছে।

রানা মুগ্ধ তো বটেই, সেই সঙ্গে একটু খুঁতখুঁতে দৃষ্টিতে মেয়েগুলোকে দেখছে। 'শিক্ষানবিস অ্যাস্ট্রোনট? কিন্তু সবাই এত সুন্দরী হয় কী করে!'

তাপসী ঝট করে ওর দিকে তাকাল। 'মানুষ সুন্দর হলে আপনার আপত্তি আছে?'

'আপত্তির সুর কানে যদি বেজে থাকে, সেটা আপনার শোনার ভুল,' বলল রানা। 'আমার আসলে অবাক লাগছে।'

'কি কারণে অবাক লাগছে?'

'প্রথমত, স্বর্গীয় অপ্সরারা মর্ত্যে কী করছে? দ্বিতীয়ত, ওদেরকে আবার স্বর্গে ফেরত পাঠানোর মানে কী?'

চেহারা একটু গম্ভীর হলো তাপসীর, সেটা অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের সঙ্গে ভালই মানাল। 'যদি কিছু মনে না করেন, এ-ধরনের রসিকতা আমি পছন্দ করি না। তা ছাড়া, ব্যাপারটাকে আপনি যেন ইচ্ছে করেই হালকা করে ফেলছেন।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'তবে ব্যাপারটাকে মোটেও আমি হালকাভাবে নিচ্ছি না। দয়া করে বলবেন কি, এই শিক্ষানবিস ছেলেমেয়েদের কোত্থেকে, কীভাবে এখানে আনা হয়েছে?'

'বিষয়টা বিশদভাবে একমাত্র শুধু মিস্টার লাম্বাডা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। এমনিতে আমাদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠি থেকে একজোড়া করে ছেলেমেয়ে সংগ্রহ করেছেন তিনি। তাঁর ভাষ্য অনুসারে, সব দিক থেকে আদর্শ এরা।'

'তারমানে নব্বুইটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে শিক্ষানবিসরা?'

'হ্যাঁ। এখানে একশো আশিজনকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। তো, জনাব মাসুদ রানা,' হঠাৎ ভাষা এবং প্রসঙ্গ দুটোই বদলে ফেলল তাপসী, 'বিসিআই এজেন্ট এমআরনাইন, লাইসেন্সড টু কিল, এবার আপনার দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা হোক।'

রানা কিছু বলবার আগেই ঘুরে হাঁটতে শুরু করল বঙ্গললনা তাপসী রায়, তারপর লম্বা আর সরু একটা চেম্বারে ঢুকে পড়ল–জায়গাটা শুটিং গ্যালারির মত দেখতে। দূরপ্রান্তে কয়েকটা চার্ট দেখতে পেল রানা, প্রতিটিতে ক্রমশ ছোট হয়ে আসা সারি সারি হরফ ছাপা রয়েছে। তাপসীর গলা থেকে বেরুনো বাংলা ভাষার সুরেলা রেশ কানে নিয়ে গ্যালারির দিকে এগোল ও, ভাবছে, নাসায় কী চাকরি করে মেয়েটা যে ওর সবটুকু পরিচয় জানে?

ওর জন্য অপেক্ষা করছে তাপসী, এই মুহূর্তে অ্যাকাডেমিক গাম্ভীর্যের বদলে কৌতুকপ্রিয় নারীর ব্যগ্র ভাব ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে। পরিচয় হওয়ার পর এই প্রথম একটু আবেগ দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। 'আসুন, মাঝখানের চার্টটা ধরি,' বলল সে। 'আশা করি ওপরের লাইনটা পড়তে আপনার কোন সমস্যা হচ্ছে না?'

মাথাটা একদিকে একটু কাত করল রানা। 'এক্স-এইচ-ওয়াই–'

'ভেরি গুড,' ফিক করে হেসে ফেলল তাপসী। 'ওটা পড়তে না পারলে আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার উপযুক্ত হবেন না। এবার দয়া করে ওই কার্ডের শেষ লাইনটা পড়ে শোনান আমাকে।'

'একেবারে শেষ লাইনটা?' জিজ্ঞেস করল রানা; প্রশ্নের ধরন দেখেই বোঝা গেল, কাজটা যে-কোন মানুষের জন্যই একটা চ্যালেঞ্জ।

'হ্যাঁ, ওটাই।' তাপসীর চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছে–কেমন জব্দ!

গভীর শ্বাস নিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকল রানা, কুঁচকে সরু ফাটল করে ফেলল চোখ দুটো। দীর্ঘক্ষণ কোন টুঁ-শব্দ নেই।

'কাজটা সহজ নয়, তাই না?' তাপসীর কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ।

রানার চোখ আরও খানিক সরু হলো, গলা লম্বা হতে চাইছে কচ্ছপের মত। 'পি-আর-আই–' শুরু করল ও।

'না, হয়নি! না, হয়নি!' তাপসীর গলায় প্রায় বিজয়িনীর উল্লাস। 'আপনি আন্দাজে ধরে নিচ্ছেন, দাদা।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘন ঘন চার্টের দিকে তাকাল সে, তারপর একটা প্যাডে হরফগুলো দ্রুত লিখতে শুরু করল। 'এবার দেখা যাক কে ক'টা হরফ ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছি।' ত্রস্ত পায়ে চার্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একমুহূর্ত পর কাঁধের উপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'দুঃখিত। শেষ লাইনের হরফগুলো হলো, O-C–B-H-A-X।'

'আপনি আমাকে অবাক করলেন,' বলল রানা, ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। সরু আল ধরে এগোল ও, হোল্ডার থেকে টান দিয়ে খুলে নিল কার্ডটা। 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ভুল আপনার হয়েছে, তাপসী। এই চার্টের শেষ লাইনটা হলো–প্রিন্টেড ইন লাস ভেগাস।' চার্টের নীচে, ডান কোণে আঙুল তাক করল ও। 'অর্থাৎ প্রথম তিনটে অক্ষর আমি যা বলেছি তাই দেখতে পাচ্ছেন আপনি, P-R-I।' তাপসীর চোখে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল, চেহারায় জিদ; তারপর হঠাৎ হাসল। 'লজ্জা পেলে আপনাকে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর লাগে, ডক্টর রায়,' বলল ও। 'এরপর কী যেন দেখাবেন আমাকে?'

পরবর্তী চেম্বারে যাওয়ার সময় চুপ করে থাকল তাপসী। এই নীরবতা রানা উপভোগ করছে। এটা তো স্পষ্টই যে খেলাটায় আপাতত একটু এগিয়ে আছে ও, তবে তাপসী রায়ও সহজে হার মানবার পাত্রী বলে মনে হয় না। শান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সে, ইঙ্গিতে সামনের স্ট্রাকচারটা দেখাল। 'এটা হলো সেন্ট্রিফিউজ ট্রেনার। মহাশূন্যে রওনা হওয়ার সময় গতির চাপ বা অ্যাকসেলারেশন সামলাতে হবে আপনাকে, এই যন্ত্রটা সেই গতির চাপ তৈরি করতে পারে।' দীর্ঘ ধাতব বাহুর শেষ মাথায় অদ্ভুতদর্শন একটা ফিউজিলাজ দেখতে পাচ্ছে রানা। 'এটার কাজ অবিশ্বাস্য গতিতে চরকির মত ঘোরা, শিক্ষানবিসদের শরীরকে দলিতমথিত করা,' ভয় দেখাবার সুর তাপসীর কণ্ঠে।

মুখ তুলে চওড়া একটা কাঁচ দেখতে পেল রানা, বোঝাই যায় যে কন্ট্রোলরুমের সামনের অংশ। তির্যক একজোড়া ফাটল দেখতে পেয়ে সামান্য চমকে উঠল ও, দেখেই বুঝতে পারল কোইচির চোখ ওগুলো, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

'আপনার বোধহয় একটু যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে করছে?' তাপসীর চোখে-মুখে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ।

'এরকম শখ মেটাবার সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে!' বলল রানা, মেয়েটার কাছে হার মানতে রাজি নয়।

একজন টেকনিশিয়ান এগিয়ে এল। ফিউজিলাজের সামনেটা ড্রাগনের প্রকাণ্ড মুখের মত হাঁ হয়ে গেল। ভিতরে ঢুকবার পর নিজের চারপাশে জায়গা এত কম দেখতে পাচ্ছে রানা, দম বন্ধ হয়ে এল ওর। হাঁটু ভাঁজ হয়ে বুকে এসে ঠেকেছে। সামনের দিকে ঝুঁকল তাপসী, রানার কাঁধের উপর সেফটি স্ট্র্যাপ আটকাবার সময় তার চোখে-মুখে আশ্চর্য একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল, যেন বদলা নেওয়ার সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি। শ্বাস টেনে তার সেন্টের ঘ্রাণ নিল রানা, মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে বুঝিয়ে দিল, গন্ধটা ভাল লেগেছে। জিজ্ঞেস করল, 'সৌরভ?'

প্রিন্স অভ ক্যালকাটার নামে প্যারিসের একটা কোম্পানির তৈরি এই সেন্টটাই এখন সবচেয়ে বেশি চলছে বাজারে।

তাপসী উত্তর না দিয়ে বলল, 'হাত দুটো সিট রেস্টে রাখুন।'

এরপর ও-দু'টোও স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। হাত ব্যবহার করবার সুযোগ হারালে সব মানুষই অসহায় বোধ করে, রানাও ব্যতিক্রম নয়। 'এটা কেন?'

মিষ্টি করে হাসল তাপসী। রানার মনে হলো, মেয়েটা শুধু পুরুষদের চারদিকে গিঁট মেরে আনন্দ পায় না, তাদেরকে গিঁট বানিয়েও সমান আনন্দ পায়। 'এটার কাজ আপনাকে ছিটকে পড়া থেকে বিরত রাখা।'

রানার আশঙ্কা কমছে না। 'জিনিসটা কত জোরে ঘুরবে?'

পিছিয়ে গেল তাপসী, হাত দুটো ঘষে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়ল। 'থ্রী-জি হলো টেক-অফ অ্যাকসেলারেশনের সমান।' ঠোঁটে দুষ্ট হাসির আভাস। 'এটার গতি

তোলা যায় টোয়েনটি জি পর্যন্ত, তবে সেটার ফলাফল হবে ভয়াবহ রকম মারাত্মক। সেভেন জি-তেই বেশিরভাগ মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।'

স্ট্র্যাপগুলো পরীক্ষা করল রানা, যেগুলো ওকে বেঁধে রেখেছে। 'ভাল সেলসগার্লও হতে পারতেন।'

এই প্রথম নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হেসে উঠল তাপসী। 'আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। একটা বোতাম আছে, আমরা নাম দিয়েছি চিকেন সুইচ।' ইঙ্গিতে একটা কলাম দেখাল, মেঝে থেকে উঠে এসে রানার ডান হাতের নাগালের মধ্যে পৌঁছে থেমেছে। সেটার শেষ প্রান্তে একটা বোতাম। 'খেলা শুরু হবে কলাম ধরা আপনার হাতের একটা আঙুল বোতামটায় চাপ দিলেই। যখনই দেখবেন আপনার জন্যে প্রেশার খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, বোতাম থেকে আঙুল তুলে নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে।'

তাপসীর দীঘল কালো চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল রানা। 'সঙ্গে সঙ্গে?'

তাপসীর চোয়াল তিরস্কার বর্ষণের ভঙ্গিতে একটু কাত হলো। 'না, এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না। মাসুদ রানা ভয় পেয়েছে! আরে, দাদা, থ্রী-জি তো সত্তর বছরের একজন বুড়োও সহ্য করতে পারে।'

ঘাড়টা মুচড়ে উপরদিকে তাকাতে চেষ্টা করল রানা, কন্ট্রোল রুমটা দেখতে চাইছে। 'মুশকিল হলো, প্রয়োজনের সময় ওই বয়সের কোন বুড়োকে কখনোই খুঁজে পাওয়া যায় না।'

রানাকে উপরদিকে তাকাবার চেষ্টা করতে দেখে আশ্বস্ত করল তাপসী। 'চিন্তা করবেন না, দাদা। যোগ্য লোকের হাতেই পড়েছেন আপনি।'

টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলল একজন টেকনিশিয়ান, তারপর তাপসীকে ডাকল। ফোনে কথা বলে রানার কাছে ফিরে এল তাপসী। 'মিস্টার লাম্বাডা একটা বিষয়ে আলাপ করবার জন্যে ডাকছেন। এখনি ফিরে আসব আমি।' ক্ষণস্থায়ী, বিদ্রূপাত্মক খানিকটা হাসি দেখা গেল ঠোঁটের কোণে। 'সময়টা উপভোগ করুন।'

তাপসীর দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল টেকনিশিয়ান লোকটা; মনের সন্দেহ গভীরতর হয়ে অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলছে। কার্তেজ লাম্বাডার নিঃসঙ্গ মরু এস্টেটে ওর আগমনটাকে প্রথম থেকেই সুনজরে দেখা হচ্ছে না। ওকে যদি কোন অ্যাক্সিডেন্ট 'করতে' হয়, এরচেয়ে আদর্শ সুযোগ আর কী পাওয়া যাবে? হাত বেঁধে রাখা স্ট্র্যাপগুলোর নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল ও। কিন্তু আঙুলগুলো শুধু চিকেন সুইচ পর্যন্ত পৌঁছাল। চাপ দিল রানা বোতামটায়।

চাপা যান্ত্রিক গুঞ্জন ফিউজিলাজটাকে একটু কাঁপিয়ে দিল। প্রথমে ধীর ভঙ্গিতে, ধাতব বাহু বা রোটর আর্ম সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস-এ ভর করে ঘুরতে শুরু করল। নিজেকে শক্ত করল রানা, দেখল কামরার দেয়ালগুলো অদৃশ্য হয়ে অবিচ্ছিন্ন একটা ঝাপসা ঝলকে পরিণতি হয়েছে। জি ফোর্স ওকে পুটিন-এর মত সিটের উপর চেপটে ধরেছে। দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে শক্ত ভাবে সেঁটে

গেল। শুধু কানের পর্দা নয়, যান্ত্রিক এমন একটা তীক্ষ্ণ ককানি শুরু হলো, একই সঙ্গে ফিউজিলাজের লাটিম সদৃশ ঘূর্ণন বেড়ে যাওয়ায়, ওর গোটা অস্তিত্ব বিস্ফোরিত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল। নিজেকে নীচের দিকে তাকাতে বাধ্য করল রানা, দেখল এরইমধ্যে জি ফোর পার হয়ে এসেছে। ঘূর্ণন আর গতির এই হার অবাক করল ওকে। চিড়ে-চ্যাপ্টা করবার বেগ প্রতি সেকেন্ডে বাড়ছে।

কানের ভিতর সহ্যের অতীত কর্কশ একটা শোঁ-শোঁ আওয়াজ পাগল করে তুলছে ওকে, বাইরে থেকে কানের ভিতর ঢুকছে সেন্ট্রিফিউজ-এর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ–যেন মগজে একটা পেরেক গাঁথা চলছে। ইতোমধ্যে জি ফাইভ পেরিয়ে গেছে। এবার বলা যায় যে সম্মানটা রক্ষা পেয়েছে। খানিক চেষ্টা করে বোতামটা থেকে আঙুল তুলে নিল রানা।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা, দেখল ছেড়ে দেওয়ার পর বোতামটা আসলেও উঁচু হয়েছে। চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল না। সেন্ট্রিফিউগ্‌ল ফোর্স সাঁড়াশির মত চেপে ধরে রেখেছে ওকে। ব্যথাই শুধু অবাধে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। নির্যাতিত, ব্যথাতুর চোখ-জোড়া নীচের দিকে তাকাল। জি সিক্স!

এতক্ষণে বুঝতে পারছে আসলে কী ঘটছে। এটা ওকে মেরে ফেলবার আয়োজন। ঠিক সময়মত তাপসী রায়কে ডেকে নেওয়া হয়েছে। বিদঘুটে আকৃতি নিয়ে ভীতিকর একটা অস্তিত্ব, যার নাম কোইচি, বাকিটুকু সে-ই সারছে। সন্দেহ নেই পরস্পরকে অভিযুক্ত করবে ওরা, তবে তদন্তে জানা যাবে ব্যাপারটা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, কাতর ভঙ্গিতে দুঃখ প্রকাশ করা হবে।

আতঙ্ক, ক্রোধ আর হতাশা দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ল রানার শরীরে। স্ট্র্যাপ-এর বাঁধন ঢিলে করবার জন্য হাত মোচড়াতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু সেন্ট্রিফিউগ্‌ল ফোর্স-এর কারণে একটা ভুরু উঁচু করতেও প্রয়োজন হচ্ছে আসুরিক শক্তি। জি সেভেন। 'সেভেন জি-তেই বেশিরভাগ মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।' তাপসীর কথাটা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল তার চোখের বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি। ওর অবস্থাও কি বেশিরভাগ লোকের মত হবে? নাহ্, অসম্ভব!

সেন্ট্রিফিউজের আওয়াজ এখন এমন তীক্ষ্ণ কর্কশ আর্তনাদ, ধারাল ছুরির মত মনটাকে যেন ফালাফালা করে ফেলবে। রানার চোখের সামনে ঝাপসা ঝলকটা লালচে খয়েরি। মনে হলো শরীরের সমস্ত রক্ত মুখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে যাচ্ছে। অক্ষিগোলক দুটো যেন ঠেলে মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিৎকার করবার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু অসাড় চোয়ালের সঙ্গে ঠোঁটজোড়া আটকে রেখেছে অদৃশ্য একটা হাত। কোন শব্দ বেরুবার উপায় নেই। জি এইট। মাথাটা বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। বমির ভাব শক ওয়েভের মত পেটে গড়াগড়ি খাচ্ছে। রানা বুঝতে পারল, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই জ্ঞান হারাবে, সেই সঙ্গে প্রাণটাও। কিছু একটা করতে হবে ওকে! বিপদের সময় তো হাল ছাড়তে নেই!

চোখ দুটো আঠার মত সেঁটে আছে কাউন্টারে, হঠাৎ কব্জিতে জড়ানো স্ট্র্যাপটা দেখতে পেল। এই স্ট্র্যাপ কর্নেল সিদ্দিক ওকে দিয়েছিলেন বিসিআই হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রুমে। ওর জ্যাকেটের আস্তিন কব্জি থেকে চার ইঞ্চি উপরে উঠে গেছে, এই মুহূর্তে সেঁটে আছে দ্বিতীয় ত্বকের মত। ক্ষীণ একটু আশা জাগল বুকে। কোনভাবে যদি কব্জিটা একবার ঝাঁকাতে পারে···

মুঠো ভাঙার জন্য আঙুলগুলো একটা একটা করে খাড়া করল রানা, হাতটা বাড়াবার চেষ্টা করল সিটের বাহু বরাবর। প্রতিটি ক্ষীণ নড়াচড়ার জন্য বাঁচার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার কাছ থেকে শক্তি ধার করতে হচ্ছে। সেন্ট্রিফিউজ-এর মৃত্যু-আলিঙ্গন ভুলেও এতটুকু ঢিল দিচ্ছে না। এখন যদি আর্মার ভেদ করতে সক্ষম এমন একটা বর্শা রোটর আর্মে লাগানো যায়, অক্টোপাসের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার মত ফলাফল পাওয়া যাবে।

দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে এত জোরে ঘষা খাচ্ছে, মনে হলো এনামেলের ছিলকার স্পর্শ পাবে মুখের ভিতর। ব্যথা, অদৃশ্য শক্তি আর কর্কশ ককানির সঙ্গে লড়ছে রানা, সেই সঙ্গে প্রাণপণে চেষ্টা করছে সিট আর্ম থেকে আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নিতে। যেন অ্যাডেসিভ টেপ দিয়ে আটকানো, কাঁপছে ওগুলো। তারপর ছাড়া পেয়ে আধ ইঞ্চির মত শূন্যে উঠল। বুড়ো আঙুলটা পিছিয়ে থাকল। শরীরের সবটুকু বল আর ইচ্ছেশক্তি ব্যবহার করছে রানা। চোখের পাতা নিচু করল। কব্জি বাঁকা হচ্ছে। আঙুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল।

টং!

চোখ বন্ধ, তারপরও বন্ধ পাতায় টর্চের আলোর মত আঘাত করল ফ্ল্যাশটা। বিকট শব্দে কী যেন একটা বিস্ফোরিত হলো। কর্কশ ঘর্ষণের শব্দকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে অ্যাসফল্টে ইস্পাতের নাল টেনে নিয়ে যাওয়ার অনুরণন। যেরকম দ্রুত আটকে ফেলেছিল, ঢিলটাও প্রায় হঠাৎই অনুভব করল রানা। সিট থেকে মুক্ত করতে চাইছে শরীরটাকে–মোড়ক থেকে যেন চটচটে লজেন্স বের করবার চেষ্টা। পেটের সব কিছু উগরে দেওয়ার ঝোঁকটা কীভাবে দমিয়ে রেখেছে নিজেও বলতে পারবে না।

ঝট করে খুলে গেল হ্যাচটা, কয়েক জোড়া হাত টান দিয়ে খুলে ফেলল স্ট্র্যাপগুলো–মুখ থুবড়ে সামনে পড়তে বাধা দিচ্ছিল ওগুলো। অন্যান্য কণ্ঠস্বরের ভিতর তাপসীরটাই শুধু চিনতে পারল রানা। ওর মুখটা সে-ই দু'হাতে ধরে আছে; নিজের শরীর সামনে ঠেলে দিয়েছে, ও যাতে হেলান দিতে পারে।

চোখ খুলল রানা।

তাপসী ওকে দেখছে, চোখে-মুখে হতচকিত ভাব। 'কী হয়েছিল?' কণ্ঠস্বর শুনেও বোঝা যাচ্ছে না উদ্বেগটা অকৃত্রিম কি না।

কথা বলবার আগে শুকনো মুখটা ভেজাবার অপেক্ষায় থাকতে হলো রানাকে।

'কন্ট্রোলে নিশ্চয়ই কোনও ত্রুটি দেখা দেয়,' বলল তাপসী, গলার আওয়াজে

অবিশ্বাস। রানাকে সিট থেকে নেমে আসতে সাহায্য করছে সে। 'ধরুন আমাকে, আমি আপনাকে দেখছি...'

ঠেলে তার হাত সরিয়ে দিল রানা। 'না, ধন্যবাদ, ডক্টর। যথেষ্ট চিকিৎসা পেয়েছি আমি, প্রথমদিন এর বেশি আমার সইবে না।'

পাঁচ

উপন্যাসটা রোমান্টিক, কিন্তু জমল না; লেখক তার চরিত্রগুলোর আচরণে বাস্তবের ছোঁয়া একটু বেশি দিতে গিয়ে ফিলিপা রোঁনার মত পাঠিকাকে হতাশ করলেন। বইটা রেখে দিয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুলো রোঁনা। দেয়ালঘড়িতে রাত এগারোটা। এই রকম রাতেই ফ্যান্টাসির জগতে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ। তবে তাতেও আবার বাস্তবের একটু ছোঁয়া থাকতে হয়, তা না হলে একেবারেই জমে না। আর রোঁনা যেটাকে বাস্তবের ছোঁয়া ভাবছে, এত রাতে সে কি আজ আসবে?

মনে হয় না। তবে আরেকটু রাত জেগে অপেক্ষা করা যেতে পারে। এত যখন ভাল লেগেছে, সেটার টান একটু হলেও কি লোকটা অনুভব করবে না? আচ্ছা, ধ্যানে বসে ডাকলে কী হয়? চলে আসতেও তো পারে!

বিছানার উপর সুখাসনে বসল রোঁনা, চোখ বুজল, আর ঠিক তখনই নরম টোকা পড়ল দরজায়।

চোখ দুটো ধীরে ধীরে মেলল রোঁনা; দেখল দরজা খুলে ভিতরে ঢুকছে রানা। কবাট বন্ধ করল, বন্ধ কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে তার চোখ-মুখে কিছু খুঁজছে। নেভী ব্লু পোলো-নেক পুলওভার পরেছে ও, পশমী সুতোয় তৈরি একই রঙের ট্রাউজার। ফ্যান্টাসি বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে দেখে নিজেকে খানিকটা নেশাগ্রস্ত লাগলেও, রানাকে দেখামাত্র স্বাভাবিক দুটো প্রশ্ন জেগেছে তার মনে। কোথায় ছিল ও? যাচ্ছেই বা কোথায়? শুধু ব্রেসিয়ার রয়েছে বুকে, মনে পড়তে খপ করে চাদর খামচে ধরে গলার কাছে তুলল। 'ফার্স্ট ডেটে কী কী করতে নেই, মায়ের কাছ থেকে তার একটা তালিকা পেয়েছি আমি,' বলল সে, হাসিটা লুকিয়ে রাখতে পারছে।

এগিয়ে আসবার সময় রানার ঠোঁটে সরু, কঠিন হাসি। 'ওই তালিকার কথা তুমি বোধহয় ভুলে গেলেও পারো। আমি অন্য কাজে এসেছি।'

কষ্ট হলেও চেহারা থেকে হতাশার ছাপ লুকিয়ে রাখতে পারল রোঁনা। 'কি কাজে?'

বিছানার কিনারায় বসল রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই মুহূর্তে ওর হাসিতে আন্তরিকতা বা উষ্ণতা, কিছুই নেই। 'যদি বলি তথ্য চাই, তারপরও কি আমার প্রতি টানটা তোমার থাকবে?'

প্রায় চমকে উঠল রোঁনা। এই লোক জানল কীভাবে! হাত থেকে খসে পড়ল চাদর। 'কীসের টান?'

'অস্বীকার করলে এখনি চলে যাব।'

রানার একটা হাত ধরল রোঁনা। 'না, যেয়ো না। কিন্তু টান যদি একটু থাকেই, সেজন্যে তোমাকে কিছু বলতে হবে কেন আমার?'

সামনে ঝুঁকে রোঁনাকে একটা চুমো খেলো রানা। 'কারণ আমি সম্ভবত একটা অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়ছি।'

নিজেকে দ্রুত ছাড়িয়ে নিল রোঁনা। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। 'কে তুমি?' কিন্তু জবাব পাওয়ার আগেই নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাল। মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আবার!' এবারের চুমোটা দীর্ঘ আর গভীর। উষ্ণ আঙুলের ছোঁয়ায় মাতাল হয়ে উঠছে নরম শরীরটা। 'কি জানতে চাও তুমি? আজ বিকেলের ওই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু?'

সেন্ট্রিফিউজ ট্রেনার অ্যাক্সিডেন্ট করবার খবর খুব দ্রুতই গোটা ইনস্টলেশনে ছড়িয়ে পড়েছে। তাৎক্ষণিক তদন্তে জানা গেছে, সাধারণ একটা ইলেকট্রিকাল ত্রুটি মেরামত করবার সময় দুটো সার্কিট ব্রেক-অফ পরস্পরের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করায় ঘটনাটা ঘটেছে। এ-ধরনের দুর্ঘটনা খুবই বিরল—ঘটবার সম্ভাবনা থাকে দশ লাখে একবার।

রানার বাঁকা ঠোঁটে তিরস্কার। 'না। মিস্টার লাম্বাডা কেন কী ঘটেছে সবই ব্যাখ্যা করেছেন, ক্ষমাও চেয়েছেন। আমি জানতে চাই যে-কথাটা তিনি আমাকে বলেননি।'

রোঁনা হতভম্ব। 'মানে? কোন্ কথাটা?'

'আবাবিল স্পেস শাটল তৈরি আর অ্যাস্ট্রোনট ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছাড়া আর কী ঘটে এখানে?'

'আমি এখনও জানি না তুমি কে।'

বড় করে শ্বাস নিল রানা, গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে হলে দু'এক মুহূর্ত সময় তো লাগবেই। 'আমি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সঙ্গে আছি। এয়ার ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেট করা আমার কাজ। এই কেসটার কয়েকটা দিক নিয়ে ভয়ানক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছি। পরিস্থিতি এমন সব ইঙ্গিত দিচ্ছে যে স্যাবোটাজের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছি না। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা স্রেফ আন্দাজ মাত্র, তাই মিস্টার লাম্বাডাকে এখনি কিছু জানাতে চাইছি না।'

রানার কাঁধে হাত রাখল রোঁনা। 'তুমি বলতে চাইছ আজ বিকেলে তোমাকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না?'

পারলে চেহারটা রানা কালো মেঘ বানিয়ে ফেলে। 'সেটাও একটা সম্ভাবনা বৈকি। এখানে ঠিক কী ডেভলপ্ করা হচ্ছে তা জানা থাকলে আমার বুঝতে সুবিধে হোত কেন কেউ লাম্বাডা করপরেশনে আঘাত হানতে চাইবে। মুশকিল হলো, মিস্টার লাম্বাডা আমার আগ্রহের ভুল অর্থ করতে পারেন, কারণ এখনও

তো পরিষ্কার কোন প্রমাণ তাঁকে আমি দেখাতে পারছি না। সুন্দরবন থেকে প্লেনের ভাঙা অংশগুলো সংগ্রহ করে আমাদের ল্যাবে আনা হয়েছে, রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষায় আছি।'

রোঁনাকে সহানুভূতিসূচক মাথা ঝাঁকাতে দেখে খুশি হলো রানা। ব্যাপারটা পরিষ্কার, ওকে সাহায্য করতে রাজি মেয়েটা। 'প্রশ্ন হলো, তোমার কাজে লাগবে এমন কোনও তথ্য আদৌ আমি জানি কি না,' বলল সে। 'তোমাকে আগেই বলেছি, আমি স্রেফ মিস্টার লাম্বাডার পারসোনাল পাইলট। তবে জানতাম বটে যে ল্যাবরেটরিতে "টপ সিক্রেট" একটা প্রজেক্টের কাজ চলছে, কিন্তু তারপর তো সবই সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

রানার পালস দ্রুত হলো। 'কোথায়?'

মাথা নাড়ল রোঁনা। 'কোথায় তা তো জানি না। এক সকালে দেখলাম ওটা নেই। এ প্রসঙ্গে কেউ আমাকে কিছু না বলায় অবাক হয়েছিলাম। সাধারণত এখানকার সমস্ত ফ্লাইটের সঙ্গে জড়িত থাকি আমি। ওরা সম্ভবত রেল ধরে চলে গেছে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কোথায় ছিল ল্যাবটা?'

'যদি ভেবে থাকো দেখতে যাবে, ভুলে যাও,' বলল রোঁনা। 'ওরা চলে যাওয়ার পরপরই আগুন লেগে পুড়ে গেছে ল্যাবটা।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রায়ই এখানে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে।'

স্তনের নীচে হাত দুটো বেঁধে বালিশে হেলান দিল রোঁনা। 'খুবই অস্বাভাবিক একটা ঘটনা। এমনিতে এখানে প্রায় কিছুই ঘটে না।'

রানার একটা ভুরু একটু উঁচু হলো। 'তাই?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই আমার কামরায় তোমার আসাটা ওই রকম অস্বাভাবিক একটা ঘটনা।'

মেয়েটার সুন্দর অবয়ব আর দেহসৌষ্ঠব যে-কোন পুরুষকে উত্তেজিত করে তুলবে। তার চোখের ভাষায় চাহিদাও রয়েছে।

'তোমার মায়ের দেয়া কী যেন একটা তালিকার কথা বলছিলে?'

বুক থেকে হাত খুলে রানার ঘাড়টা পেঁচিয়ে ধরল রোঁনা। ওর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে গেল। 'সব ভুলে গেছি!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল সে।

এক ঘণ্টা পর। কার্তেজ লাম্বাডার বাটলার যে পথ ধরে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, এই মুহূর্তে নিঃশব্দ পায়ে সেই পথটা ধরে এগোচ্ছে রানা। রোঁনাকে দেখে এসেছে ঠোঁটের কোণে তৃপ্ত হাসির রেখা নিয়ে ঘুমাচ্ছে, শরীরটা সাদা সিল্ক রোব-এ ঢাকা।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কান পাতল রানা। আশপাশে কোথাও টিক-টিক-টিক-টিক করছে একটা দেয়ালঘড়ি, গোটা দালানের ভিতর অন্য কোন আওয়াজ নেই। হল-এ চাঁদের আলো ঢুকছে, সারি সারি তাকে বসানো মূর্তিগুলো যেন

গুপ্তচর, উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে। কার্তেজ লাম্বাডার স্টাডির সামনে চলে এল রানা। চৌকাঠের নীচে থেকে কোন আলো বেরুচ্ছে না। কবাটে কান ঠেকিয়ে কোন আওয়াজও পেল না। হাতল ধরে সাবধানে মোচড়াল রানা।

ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে খুলে গেল কবাট। একমুহূর্ত থেমে আবার কান পাতল। কোন কারণে ডোবারম্যান পিনশার দুটো এখনও যদি দালানের ভিতরে কোথাও থেকে থাকে, রানা ওগুলোকে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করবার সময় দিতে চায়। যখন বুঝল যে কুকুরগুলো ভিতরে নেই, স্টাডিতে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে লাগিয়ে দিল। ওর কোন ধারণা নেই ঠিক কীসের খোঁজে এখানে এসেছে। শুধু জানে ক্লু দরকার। গোপন জিনিস-পত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কোন অ্যালার্ম অন করে দেবে কি না সে ভয় তো আছেই, নাইটভিশন লেন্সসহ লুকানো টিভি ক্যামেরা ওর প্রতিটি নড়াচড়া রেকর্ড করে রাখলেও মারাত্মক বিপদে পড়তে হবে।

জানালার বাইরে থেকে প্রচুর জোছনা ঢুকছে ভিতরে। স্টাডিতে এত বেশি ফার্নিচার, কোনও অকশনরুমের স্টককেও যেন ছাড়িয়ে যাবে। বড়সড় লেখার টেবিলটাই কাছে টানল ওকে। কিন্তু দেখা গেল দেরাজে তালা দেওয়া রয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। রানা এমনকী টেবিলটার পিছনে একজোড়া তার দেখেও বিস্মিত হলো না। ওগুলো স্কার্টিং বোর্ড-এর মাথা হয়ে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে। ফাঁদ? হতে পারে। কিংবা হয়তো অ্যালার্ম।

কী করবে চিন্তা করছে রানা, এই সময় একেবারে হঠাৎ ওর পিছনে খুলে গেল দরজাটা। ঝপ করে মেঝেতে মাত্র বসেছে রানা, সাদা সিল্ক রোবটা গায়ে ভাল করে জড়াতে জড়াতে ভিতরে ঢুকল রোঁনা, চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া। 'রানা?'

সিধে হচ্ছে রানা, কুঁকড়ে পিছু হটল রোঁনা। দ্রুত তার ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল ও। 'তুমি আমার খিদে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছ।' রোঁনাকে হতভম্ব দেখাল। 'আমার আরও তথ্য দরকার। এখানে কোন সেফ আছে?'

রোঁনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'তুমি নির্ঘাত একটা পাগল!'

'হয়তো।' কামরার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা। সোনা আর রুপোয় গিল্টি করা বড়সড় দেয়ালঘড়িটার দু'পাশে দুটো আলো দেখা যাচ্ছে। কামরাটা যেভাবে সাজানো হয়েছে, তার সঙ্গে ওই তিনটে জিনিস কেন যেন মানায়নি–বিশেষ করে দেয়ালঘড়িটা। কারণটাও পরিষ্কার, কাছাকাছি সোফা সেট আর আরাম-কেদারাগুলোর পিছন দিকে ওটা। তা ছাড়া, গিল্টি করা হলেও, এমন কোন শিল্পকর্ম বলে মনে হচ্ছে না যে দু'দিক থেকে আলো ফেলে ওটাকে উদ্ভাসিত করে তুলতে হবে। ওটার নীচে চলে এসে কান পাতল রানা। কোন শব্দ হচ্ছে না।

রোঁনাকে এখনও হতভম্ব দেখাচ্ছে। 'রানা–'

'শ্-শ্-শ্-শ্!'

'রানা!' ফিসফিসে হলেও, রোঁনার গলায় প্রচুর তাগাদা। 'এখান থেকে

বেরোও তুমি।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সেটার উপর দাঁড়াল রানা। ঘড়িটার কাঁচের আবরণ আর ডায়াল খুলে ভিতরে তাকাল। কীসের কলকব্জা, ছোট একটা সেফ-এর খুদে দরজা দেখা যাচ্ছে, দরজার মাঝখানে কম্বিনেশন ডায়াল। 'দেখলে? কী রকম সম্ভাবনা জাগাচ্ছে?' কাঁচ আর ডায়াল রোঁনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাসছে রানা। 'আমি ধরে নিচ্ছি কম্বিনেশন কোড তোমার জানা নেই।'

মাথা নাড়ল রোঁনা; ভয়ে প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। 'জানলেও তোমাকে বলতাম না।'

পিছনের মেঝেতে চাঁদের আলো থাকায় চাদরের ভিতর থেকে রোঁনার দেহসৌষ্ঠব পরিষ্কার ফুটে উঠেছে; সেদিকে চোখ পড়তে তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করল রানা। ভীত-সন্ত্রস্ত একটা মেয়েকে কী কারণে এত পেতে ইচ্ছে করে? সাইকোলজিস্টরা হয়তো কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ট্রাউজারের পকেটে একটা হাত গলাল রানা। 'ঠিক আছে। তোমাকে আমি চাপ দেব না।' পকেট থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট চারকোনা একটা আকৃতি, সেটার একটা দিক কম্বিনেশন লক-ডায়ালের পাশে ঠেকাল।

মেঝেতে দাঁড়িয়ে রোঁনা দেখল, কিছু থেকে একটা আভা ছড়াচ্ছে–যেন একটার উপর আরেকটা চাপানো ফ্লুরেস্যান্ট রেখা। তার মনে হলো সে একটা খুদে এক্স-রে প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে। আঙুলের ডগা দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে শুরু করল রানা, আলোর প্যাটার্নটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে রোঁনা নিশ্চিত হতে চাইছে কার্তেজ লাম্বাডার স্টাডিতে রয়েছে সে, অদ্ভুত কোন স্বপ্নের ভিতর নয়। ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে প্রায় লাফ দিয়ে খুলে গেল সেফের দরজা। রোঁনা ঘুমালে না জাগবে! এখনও কার্তেজ লাম্বাডার স্টাডিতে রয়েছে সে, রানার হাতে ধরা জিনিসটা দেখছে। 'বড় অদ্ভুত তো।'

আকৃতিটা রোঁনার বাম স্তনের উপর চেপে ধরল রানা, চৌকো আভা ফুটে উঠছে দেখে চোখ সরু করল। 'তোমার হৃদ্‌পিণ্ড খাঁটি সোনা।'

রোঁনার ঠোঁটে কাঁপা-কাঁপা নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল। 'মিস্টার লাম্বাডা এখানে আমাদেরকে দেখলে...'

সেফের ভিতর উঁকি দিয়ে প্রথমবার কিছুই দেখতে পেল না রানা। বুকের ভিতরটা পানিতে ভরে ওঠবার মত একটা অনুভূতি হলো। তারপর ওর অনুসন্ধানী আঙুলের ডগা সেফের পিছনের দেয়ালে ঠেকল। একপাশে চাপ দিল ও। দেয়ালটা সরে যাওয়ায় পিছনে আরেকটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো। সেফের ভিতর এটা একটা গোপন কমপার্টমেন্ট। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কী পাওয়া যায় দেখল রানা। বের করে আনল চার ভাঁজ করা একটা ডিজাইন পেপার।

রোঁনা ইতোমধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে। 'ফর গড'স সেক, রানা!'

'কথা কম!' ঠাণ্ডা আর কঠিন সুরে বলল রানা, চেয়ার থেকে নেমে কাঁধের ধাক্কায় একপাশে সরিয়ে দিল রোঁনাকে। ওর এই মুখের ভাব আগেও একবার

দেখেছে মেয়েটা–ওদের শারীরিক মিলনের চরম আনন্দঘন মুহূর্তটিতে। আরও একবার কথাটা ভাবল সে: ওর এই হঠাৎ বদলে যাওয়া মেজাজের মধ্যে ভীতিকর কী যেন একটা আছে। এই লোকের সঙ্গে লাগতে যাওয়াটা শুধু বোকামি নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনক।

একটা টেবিলের সমতল সারফেসে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং-এর ভাঁজ খুলল রানা। পেন্সিল টর্চের আলোয় দেখা গেল, কয়েক সেকশনে ভাগ করা একটা ভূ-গোলকের নকশা; বিষুব বা নিরক্ষবৃত্তের অংশটা অত্যন্ত জটিল। ভূ-গোলকের পাশে আরও একটা নকশা দেখা যাচ্ছে। ছোট একটা ফাইল, যে-ধরনের ফাইলে তরল মেডিসিন রাখা হয়। ফাইলটা কীভাবে খুলতে হবে, কত টেমপারেচারে রাখতে হবে ইত্যাদি তথ্য লেখা রয়েছে ইংরেজিতে। 'এগুলো কী, তোমার কোন ধারণা আছে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল রোঁনা। 'না।'

বিশ্বাস করল রানা। ঝট করে কী যেন একটা চোখে তুলল ও, ক্লিক করে মৃদু শব্দের সঙ্গে আলোর ছোট্ট ঝলকানি দেখা গেল। রোঁনার চোখ-মিটমিট মাত্র বন্ধ হয়েছে, নকশাটা সেফে রেখে ঘড়ির ডায়াল ও কাঁচের আবরণ জায়গামত বসিয়ে দিল রানা। মিনিয়েচার ক্যামেরাটা আগেই পকেট চালান হয়ে গেছে। 'হ্যাঁ। চলো এবার।'

'তুমি আগে বেরোও,' বলল রোঁনা।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে মেয়েটাকে হালকা একটা চুমো খেলো রানা। 'ঠিক আছে। নিজের দিকে খেয়াল রেখো।'

'তুমিও।'

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে দরজাটা ইঞ্চি দুয়েক খুলল রানা। থামল, কান পাতল, তারপর ছায়ামূর্তি হয়ে বেরিয়ে এল। রোঁনা ওর পায়ের শব্দ পাওয়ার অপেক্ষায় থেকে হতাশ হলো। তার পিছনে একটা ঘড়ি ঢং করে বেজে উঠতে বুকের ভিতর তড়পে উঠল হৃৎপিণ্ড। কামরাটার চারদিকে চোখ বুলাল সে, তারপর চাঁদের আলোয় পা ফেলে দরজার দিকে এগোল। ওটা সামান্য একটু খুলে রেখে গেছে রানা। বড় করে শ্বাস টানল রোঁনা, পালস-এর শব্দ শুনতে পাচ্ছে; চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, পিছনে হাত নিয়ে গেল কবাট বন্ধ করবার জন্য। জীবনে বোধহয় এত ভয় কখনও পায়নি সে।

ক্লিক করে বন্ধ হলো কবাট, বিশাল নিস্তব্ধ হলে পিস্তল থেকে গুলি ছোটার মত বাজল সেটা কানে। এর জবাবে কোথাও থেকে কেউ একটা আওয়াজ করবে, কিংবা আলো জ্বালবে–অপেক্ষা করছে রোঁনা। কিন্তু কিছুই হলো না। প্রতিবাদপ্রবণ দরজার কাছ থেকে সরে এল সে, প্রায় দৌড়ে পৌঁছাল সিঁড়ির গোড়ায়। যেন একটা বাচ্চা মেয়ে খেলছে, নিজেকে রোঁনা এই বলে অভয় দিল যে কারও চোখে ধরা না পড়ে ল্যান্ডিঙে পৌঁছাতে পারলে তার বিপদ কেটে যাবে।

প্রতিবার দুটো করে ধাপ টপকাচ্ছে, প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে হালকা হচ্ছে

বুকের বোঝা। তার সামনে, ফিনিশিং লাইনে একজন টাইমকীপার-এর মত, খাড়া হয়ে আছে একটা আর্মার সুট, বর্ম ঢাকা মুঠোয় ধরা ভারী একটা লোহার গদা বা মুগুর। ওটাকে স্যাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে এল রোঁনা, তারপর করিডর ধরে ছুটল।

ছায়া থেকে সিঁড়ির গোড়ায় বেরিয়ে এল কুকিমোরা কোইচি। মুখ তুলে সিঁড়ির মাথার দিকে একবার তাকাল সে, তারপর ঘুরে এগোল স্টাডির দরজা লক্ষ্য করে।

ছয়

ভেনিস।

ডি সান মার্কো খাল ধরে তরতরিয়ে ছুটছে গনডোলা। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী গ্রিক দেবি প্যাল্যাস অ্যাথিনি স্মরণে তৈরি করা সাদা চার্চটার সারি সারি স্তম্ভগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। ভেনিসের যেদিকেই তাকানো যায়, প্রাচীন নির্মাণ-শৈলী সমৃদ্ধ স্থাপত্যরীতির পাশেই দেখতে পাওয়া যাবে অত্যাধুনিক অট্টালিকা, তোরণ, স্ট্যাচু, টাওয়ার আর অসংখ্য সেতু। গোটা শহরে অগুনতি চওড়া খাল, উপরে খোলা আকাশ থাকায় আলো-বাতাসের কোন অভাব নেই। একটা ওয়াটার বাস পাশ কাটাল, ঢেউগুলো লম্বা একটা ভবনের ভাঙাচোরা প্রতিবিম্বের ভিতর দিয়ে ওদের গনডোলাকে ঘন ঘন ধাক্কা মেরে কিছু দূর তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সৌন্দর্য থেকে কর্তব্যে ফিরে এল রানার চিন্তা-ভাবনা।

কার্তেজ লাম্বাডার সেফ থেকে পাওয়া ডিজাইন পেপারের ফটো আকারে বড় করাবার পর এক কোণে ছাপার হরফে দুটো শব্দ আবিষ্কৃত হয়েছে–'লিলিথ গ্লাস'। একটু খোঁজ-খবর নিতেই জানা গেল, এই নামে যে কোম্পানিটা ব্যবসা করছে তাদের একটা দোকান আছে ভেনিসের সেন্ট মার্ক স্কয়ারে। তবে বহু চেষ্টা করেও নকশাগুলোর নির্ভুল বা গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। বিসিআই-এর টেকনিকাল এক্সপার্টরা স্ফিয়ার বা গোলকটাকে একটা স্যাটেলাইট বলে সন্দেহ করছেন।

পিঅ্যাৎসাটা-র জেটিগুলো ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল। রানার গনডালিয়ার জলজ আগাছায় মোড়া পাইলিং-এর ভিতর দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে তার জলযানকে চালিয়ে নিয়ে এল। সিধে হলো রানা, গনডোলা থেকে নেমে এল কাঠের তৈরি জেটিতে। 'এখানে অপেক্ষা করো, উলফি।'

রিবন জড়ানো স্ট্র হ্যাট দু'আঙুলে ধরে চোখের দিকে নামাল উলফি। 'ইয়েস, সিনর।' লম্বা, শক্ত-সমর্থ তরুণ; মাথাভর্তি কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল, লম্বাটে দুই চোখে মায়া, তবে তার নিরীহভাবটুকু স্রেফ উপরের খোলস মাত্র। পাষাণের মতই দয়ামায়াহীন সে, প্রয়োজনে হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। উলফি রানা

এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিতে কাজ করে। তাকে উত্তর ইটালির সবটুকু কাভার করতে হয়।

দিনটা আজ বেশ ঠাণ্ডা, রাস্তা-ঘাটে ট্যুরিস্টের অভাব তাই বেশ চোখে পড়ছে। আকাশ ছোঁয়া ইঁটের পাঁজার মত ক্যাম্পানিলি, অর্থাৎ বেল টাওয়ার-এর দিকে হাঁটছে রানা। প্রাচীন সারি সারি স্তম্ভগুলোর আড়াল থেকে রোমান ইতিহাস যেন ফিসফিস করে উঠছে। বাতাস এখানে হাহাকার করে কাঁদে। ব্যাজিলিকা-র সামনে একবার থামল রানা, খেয়াল করল, প্রাচীন প্রশাসনিক ভবনের ধনুকাকৃতির খিলানগুলো মোজাইক করা। এবার ক্লক টাওয়ারের দিকে এগোল।

ঘণ্টা পড়তে শুরু করেছে: ছাদের কিনারা থেকে ব্রোঞ্জের দুটো মূর্তি তাদের হাতুড়ি তুলে আঘাত করছে প্রকাণ্ড বেল-এ। চমকে উঠে ঝাঁক ঝাঁক পায়রা আকাশে উড়ল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার শান-বাঁধানো চত্বরে নেমে এল খাবারের খোঁজে। মাথা একদিকে কাত করে, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে রানাকে দেখল ওগুলো; তবে একটু পরই বুঝতে পারল এ-লোক কবুতরকে খেতে দেয় না। ডানা ভাঁজ করে, খাদ্যকণার সন্ধানে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, হুড়মুড় করে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল ওকে।

ক্লক টাওয়ারের কাছাকাছি দোকানগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। মারসেরিয়া নামে বিখ্যাত খিলানটার কাছাকাছি যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। একটা শামিয়ানার ঝুলন্ত অংশে লেখা রয়েছে 'লিলিথ গ্লাস'। কারও মর্জি মাফিক এক কোণে লাম্বাডা করপোরেশনের ট্রেড মার্ক সেলাই করে দেওয়া হয়েছে–একটা বলয়, তার ভিতর নীহারিকা। চারদিকে আরও একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। প্রায় নিশ্চিতই, কেউ ওর পিছু নেয়নি। শামিয়ানার নীচে ঢুকে সাজানো দোকানে চলে এল ও। ছোট বড় অসংখ্য শেলফে বহুরঙা গ্লাস, জগ, বাটি, গামলা, প্লেট, ফুলদানী আর লোভনীয় সব শো পীস দেখা যাচ্ছে–সবই কাঁচের তৈরি।

সুন্দর, কোমল চেহারা মেয়েটার, চট্ করে এগিয়ে এল। 'আপনি শুধু বলুন কীসে আপনার আগ্রহ, সিনর।'

সংস্কৃতির কী পার্থক্য, ভাবল রানা, ঢাকার একটা দোকানে দাঁড়িয়ে কোন মেয়ে এ-কথা বললে অন্যরকম অর্থ করা হত। তারপর নিজের আচরণেই মনে মনে চমকে উঠল–একটা শো পীস, সাজানো বিছানার দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'একটু সুযোগ দিন, চারদিক ভাল করে দেখে নিই আগে।'

হাসল মেয়েটা, উদার ভঙ্গিতে হাতটা লম্বা করল। 'প্লিজ, যেখানে খুশি যেতে পারেন আপনি। ইচ্ছে হলে আমাদের ওঅর্কশপ থেকেও ঘুরে আসতে পারেন।' দোকানের পিছন দিকটা দেখিয়ে দ্রুত চলে গেল আরেক খদ্দেরকে পাকড়াও করবার জন্য।

প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় রানা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল কাঁচের তৈরি আধুনিক জিনিস ওর তেমন একটা পছন্দ নয়, বরং অ্যান্টিকগুলোই বেশি ভাল লাগছে।

কয়েকটা শোকেসে এমন কিছু অ্যান্টিক পীস রাখা হয়েছে, একনজরেই মহামূল্যবান বলে চেনা যায়। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে ওঅর্কশপের দরজায় এসে দাঁড়াল ও।

সামনে আলো খুব কম, চোখের দৃষ্টি মুহূর্তেই কেড়ে নিল গনগনে অগ্নিকুণ্ড অর্থাৎ ফার্নেস আর কাঁচ শ্রমিকদের রড বা পাইপের শেষপ্রান্তে ঝুলে থাকা জ্বলজ্বলে গোলাগুলো। কাছাকাছি দু'জন লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা, পরনে শুধু হাফপ্যান্ট, সারা শরীর ঘামে চকচক করছে; বহু হাতলবিশিষ্ট চওড়া আর জটিল আকৃতির একটা ভাস তৈরি করছে তারা, হাতের সাঁড়াশি তরল কাঁচের মোচড় খাওয়া ঝুরিগুলোকে এমনভাবে সামলাচ্ছে, ওগুলো যেন সেমাই। লোকগুলোর কাজ দেখবার জন্য ট্যুরিস্টদের ছোট্ট একটা ভিড় জমেছে, তাদের একজন ঘন ঘন ক্যামেরার শাটার টেনে ছবি তুলতে ব্যস্ত।

ট্যুরিস্টদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য এগোল রানা, কিন্তু ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল সবার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এক লোক। ওঅর্কশপের একপ্রান্তে একা কাজ করছে লোকটা। প্রথমদর্শনে মনে হলো সে একটা গ্লাস ফায়াল ফোলাচ্ছে। কৌতূহল নিয়ে দেখতে গিয়ে রানা লোকটার দক্ষতায় মুগ্ধ না হয়ে পারল না। রডের ডগায় এক ফোঁটা তরল কাঁচ নিয়ে গাল ফোলাতে শুরু করল, যতক্ষণ না একজোড়া টেনিস বলের মত দেখতে হয়। ফোঁটাটা কাঁপল, তারপর হঠাৎ বেলুনের মত বিস্তৃত হলো। সুকৌশলে একটা মোচড় আর টোকা, ব্যস–জ্বলজ্বলে গ্লাস সিলিন্ডার একই আকৃতির আরও নয়টার সঙ্গে স্থান পেল একটা ট্রেতে। ওগুলোর দিকে তাকাতেই কল্পনার চোখে ডিজাইন পেপারটা দেখতে পেল রানা। হুবহু একই রকম দেখতে, ফোলা ঘাড়সহ চার ইঞ্চি লম্বা গ্লাস ফায়াল আঁকা ছিল কাগজটায়। কোনও সন্দেহ নেই, ঠিক এই রকমই দেখেছে নকশাটায়।

চার ইঞ্চি লম্বা ফায়ালগুলো তৈরি করে ট্রেতে রাখা হচ্ছে। দেখতে দেখতে একটা ট্রের সবগুলো খোপ ভরে গেল। কারিগর নিজের রড নামিয়ে রাখল, এগিয়ে এসে ট্রে-টা তুলে দিল খোলা সার্ভিস লিফটের শেলফে। তারপর একটা বোতামে চাপ দিল সে। ফোলা ঘাড় নিয়ে ফায়ালগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। রানা ঘুরতে যাবে, হঠাৎ দেখল ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে একটু হাসল রানা, তারপর ঘুরে একটা দরজার দিকে এগোল, কবাটে লেখা রয়েছে–'মিউজিয়াম অভ অ্যান্টিক গ্লাসওয়্যার'।

পিছনদিকে একবারও না তাকিয়ে ইঁট-পাথরে তৈরি একটা করিডরে বেরিয়ে এল, সেটা পেরিয়ে ঢুকল আরেক শোরুমে। এখানে মূল দোকানের জেল্লা-জলুস নেই, বেশিরভাগ জিনিসই গ্লাস কেসের ভিতর সাজানো। সাদামাঠা কাশ্মীরী সোয়েটার পরা এক তরুণী ট্যুরিস্টদের দলটাকে এটা-সেটা দেখাচ্ছে: '...এই গামলা টোপাজ লিলিথ-এর একটা অসাধারণ কাজ–হ্যাঁ, টোপাজ লিলিথই এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। চোদ্দোশো একান্ন সালে পাদুয়ায় জন্মগ্রহণ

করেন তিনি, ভেনিসে আসেন আঠারো বছর বয়েসে। পাঁচ বছর পর মুরানো দ্বীপে ছোট্ট একটা ওঅর্কশপ খোলেন...'

টোপাজ লিলিথ-এর কথা ভুলে গেল রানা, কারণ দেখতে পেল ট্যুরিস্টের দল আরেকটা শোকেসের দিকে এগোবার সময় ওটার পিছন থেকে নিজেকে আলাদা করে নিচ্ছে ডক্টর তাপসী রায়। বব-কাট চুলে কোন ক্লিপ বা ফিতে নেই, রাশি রাশি কালো রেশমের মত স্তূপ হয়ে আছে ওর দুই কাঁধে। পরনে নেভী ব্লু ট্রাউজার; লাল আর নীল ডোরাকাটা জ্যাকেটটা উরু পর্যন্ত লম্বা। ভিড়টাকে দূরে সরে যেতে দিয়ে কয়েকটা শোকেসকে পাশ কাটাল সে, তারপর কামরার একপ্রান্তের একটা দরজার দিকে এগোল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে যাবে, ঝট্ করে একটা পিলারের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল রানা।

একটু পর উঁকি দিল ও, দেখল দরজা খুলে ভিতরে কী যেন দেখছে তাপসী। পনেরো-বিশ সেকেন্ড দেখবার পর মাথাটা টেনে নিল সে, দরজার কবাট বন্ধ করে দিল আবার। ধীর পায়ে ট্যুরিস্টদের ভিড়ে এসে মিশল। ওদেরকে তখন জানানো হচ্ছে একটা সেইলিং বোটের অলঙ্কৃত মডেল বাজারে ছাড়া হলে দাম উঠবে এক মিলিয়ন ডলারের কম নয়। শ্রদ্ধা মেশানো বিস্ময়সূচক 'ওহ্' বলতে বলতে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্যুরিস্টরা।

দ্রুত এগিয়ে এসে রানাও দরজাটা খুলল, দেখতে চায় তাপসী কী দেখল। ছোট্ট একটা উঠান, একপ্রস্থ সিঁড়ির ধাপ অত্যন্ত ভারী একটা কাঠের দরজা পর্যন্ত উঠে গেছে। উঠানের আরেক দিকে লোহার একটা ভারী গেট, সেটার বাইরে সবুজ শ্যাওলা ধরা পাঁচিল, পাঁচিলের নীচে মরচে-রঙা পানি দেখা যাচ্ছে। কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে দরজা বন্ধ করল রানা, ট্যুরিস্টদের পিছু নেওয়ার জন্য হন-হন করে এগোল।

তাপসী সেন্ট মার্ক'স স্কয়্যার ধরে হাঁটছে, পিছন থেকে তার পাশে চলে এল রানা। 'কী কাণ্ড! ডক্টর তাপসী রায় না?'

তাপসীর ঠোঁটের কোণ সামান্য একটু বাঁকা হলো। 'এখানে আপনার উপস্থিতি স্রেফ কাকতালীয় একটা ব্যাপার বলে ধরে নিচ্ছি, মিস্টার রানা। আমি চাই না কেউ আমার ওপর নজর রাখুক।'

'সেটা আসলে কেউ আমরা চাই না,' সায় দেওয়ার সুরে বলল রানা। 'সেরকম কিছু ঘটছে দেখলে আমার মাথা স্যাবোটাজ করা সেন্ট্রিফিউজ-এর মত হয়ে যায়।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে দাদা সম্ভবত সন্দেহ নামে একটা বাতিকে ভুগছেন।'

'কাকতালীয় ঘটনা সেটাকে আরও উসকে দিচ্ছে,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'জানতে পারি, আপনি ভেনিসে কি করছেন?'

ফটো তুলবার পাঁয়তারা কষছে, হাত নেড়ে এমন একজন ফটোগ্রাফারকে বিদায় করে দিল তাপসী। 'ইউরোপিয়ান স্পেস কমিশন একটা সেমিনারের আয়োজন করেছে, আমি সেখানে একটা বক্তৃতা দেব।'

প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'জটিল বিষয়। সুন্দরী নারী আপনার প্রথম পরিচয় নয়, এটা আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।'

থেমে রানার মুখোমুখি দাঁড়াল তাপসী। 'দেখুন, আমার অনুগ্রহ পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে ভুলে যান। আমার মাথায় আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে।'

রানার হাবভাব গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ওই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো নিয়েই তো আলাপ করতে চাইছি আমি। আজ সন্ধ্যায় একসঙ্গে ডিনার খেলে কেমন হয়?'

মাথা নাড়ল তাপসী। 'আজ সন্ধ্যায় আমার বক্তৃতা।'

'বক্তৃতার পর কফি না খাওয়ার কী কারণ দেখাবেন?'

সরু করে একটু হাসল তাপসী। 'এখনই হয়তো দেখাতে পারব না–তবে কিছু একটা নিশ্চয়ই মাথায় আসবে, নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

তাপসী হাঁটা ধরল, কিন্তু ঝট করে আবার তার পাশে চলে এল রানা। 'অন্তত আপনার হোটেল পর্যন্ত একসঙ্গে হাঁটতে তো পারি? তাজ মহলে উঠেছেন, সম্ভবত?'

তাপসীর চোখ জোড়া সরু হয়ে গেল। 'আপনি আমার ওপর সত্যি সত্যি নজর রাখছেন!'

'না, আপনি আসলে যেদিকে হাঁটছেন সেদিকে ফাইভ স্টার হোটেল ওই একটাই। কৃষ্ণভক্তদের আশ্রমটা উল্টোদিকে।'

হাসি চাপতে বেশ কষ্ট করতে হলো তাপসীকে। ডিউকল্ প্যালেস পাশ কাটাল ওরা। 'আমি জানতে পারি, আপনি এখানে কী করছেন? সাতশো সাতচল্লিশ তো যতদূর জানি বাংলাদেশের জঙ্গলে পড়েছে।'

'আমি জানতে চাই পক্ষিরাজ কোথায় গেছে,' বলল রানা। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় এমন কাউকে পেলাম না যে বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি।'

'আপনি হয়তো ভুল দরজায় নক করেছেন।'

তাপসীর কথায় সমালোচনার সুর রানাকে ধাঁধায় ফেলে দিল। কার্তেজ লাম্বাডা ও তাপসী ছাড়া আর শুধু রোঁনার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে বিশদ আলাপ করেছে ও। 'ফিলিপা রোঁনা কেমন আছে?' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল। 'বলছিল চাকরিটা তার একঘেয়ে লাগে।'

'আর লাগবে না,' বলল তাপসী। 'সে মারা গেছে।'

'মারা গেছে?' বিষম এক ধাক্কা খেলো রানা। 'কিভাবে?'

'ভয়ানক একটা দুর্ঘটনাই বলতে হবে। মিস্টার লাম্বাডা শিকারে বেরিয়েছিলেন–তাঁর ডোবারম্যানরা রোঁনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

'ওগুলোকে সামলাবার কেউ ছিল না?'

'সে নাকি কাউকে কিছু না বলে একা জঙ্গলে ঢুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কুকুরগুলো নিশ্চয়ই তার গন্ধ পেয়েছিল। ওগুলোর পিছু নিয়ে কোইচিও পৌঁছায়, কিন্তু দেরি করে ফেলে সে।' তাপসীর শিউরে ওঠাটা নির্ভেজাল বলেই মনে হলো

রানার। 'কী ভয়ানক, তাই না?'

রানার বমি পাচ্ছে। মাত্র কদিন আগে রোঁনার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিছু সময় কাটিয়েছে ও। এখন শুনতে হচ্ছে সে বেঁচে নেই। সেজন্য হয়তো ও-ই দায়ী। তিক্ত অনুভূতির সঙ্গে অপরাধবোধ যোগ হওয়ায় রানার বুকে প্রতিশোধের একটা আগুন জ্বলে উঠল। 'দুর্ঘটনার এই হার স্বাভাবিক নয়,' গম্ভীর সুরে বলল ও। 'আপনারও বোধহয় মাঝে-মধ্যে মৃত্যু ভয় জাগে?'

রানার চোখে অপলক দৃষ্টিতে তাকাল তাপসী। 'ভয় আমাদের দু'জনেরই আছে, মিস্টার রানা। একটা হাত তুলে বিদায় জানাল সে। 'আপনার তদন্তের সাফল্য কামনা করি।'

হাতটা ধরে একটু ঝাঁকাল রানা। 'আপনার বক্তৃতাও যেন ভাল হয়। পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

চোখে সন্দেহ থাকলেও মুখ ফুটে সেটা প্রকাশ করল না তাপসী। হাইহিলের উপর ভর দিয়ে ঘুরল সে, শান বাঁধানো খালের কিনারা ধরে নিজের পথে চলে যাচ্ছে।

গনডোলার কাছে পৌঁছানোর জন্য ফিরতি পথ ধরল রানা, চোখ-মুখ থমথমে হয়ে আছে। রোঁনা ওর সঙ্গে স্টাডিতে ছিল, এটা কেউ জেনে ফেলায় তাকে খুন করা হয়েছে—এ না হয়েই যায় না। ওর প্রাণটাও কেড়ে না নেওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দু-দু'টো 'অ্যাক্সিডেন্ট' এমনকী কার্তেজ লাম্বাডার আস্তানাতেও সন্দেহজনক বলে মনে হবে। তবে এখানে, ভেনিসে, আবার ওর প্রাণের উপর আঘাত আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেও চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে রানা। জেটিতে পৌঁছে দেখল নিঃসঙ্গ এক মার্কিন মহিলা, চেহারা আর আচরণে স্পষ্ট খাই খাই ভাব নিয়ে ওর গনডোলাটা ভাড়া নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে—যদিও গনডোলার চেয়ে উলফির ব্যায়ামপুষ্ট শরীরটার দিকেই বেশি নজর তার।

বিনয়ের অবতার সেজে রানাকে বলতে হলো, 'ভীষণ দুঃখিত, এই ছোকরাকে আমি সারাদিনের জন্যে ভাড়া করেছি।'

চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল মহিলা। চোখে-মুখে চরম হতাশা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

গনডোলায় উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, 'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল, উলফি?'

'ক্যাম্পানিলির মাথা থেকে বিনকিউলার ঘুরিয়ে পিঅ্যাৎসাটা-র ওপর চোখ বুলাচ্ছিল এক লোক। কীভাবে বুঝলাম?' হাতের তালু দুলিয়ে একটা ভঙ্গি করল উলফি। 'রোদ লাগায় ঝিলিক দিল কাঁচটা।' গনডোলা ছেড়ে দিল সে।

উলফির দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্যাম্পানিলির মাথাটা একবার দেখে নিল রানা। সাধারণ একজন ট্যুরিস্ট হতে পারে। কিংবা কেউ হয়তো ওর গতিবিধি রিপোর্ট করছে। সাবধানে থাকতে হবে ওকে, তবে ভয়কে বেশি পাত্তা দেওয়াও ঠিক হবে

না। 'বিয়ালটোয় পৌঁছে দাও আমাকে,' নির্দেশ দিল ও।

'ইয়েস, সেনর।' জেটির মুখে জড়ো হওয়া জলযানের ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এসে স্যান্টা মারিয়া ডেলা স্যালুট চার্চ আর গ্র্যান্ড ক্যান্যাল-এর দিকে গনডোলা ছাড়ল উলফি। সিটে হেলান দিয়ে বসে প্রাচীন আর আধুনিক বিশাল সব ভবনগুলোর ফেসাড বা মুখশ্রী দেখে সময় কাটাচ্ছে রানা। প্রাচীন দালানগুলোর পাথর কালের আঁচড় লেগে কালো হয়ে গেছে, চওড়া খালের পানি সারা গায়ে সশব্দে চাপড় দিচ্ছে। পরিবেশটায় বিষণ্ন একটা ভাব।

আবার রোঁনার কথা ভাবল রানা। মনটা নতুন করে তিক্ততা আর দুঃখে ছেয়ে গেল। এমন একটা পেশার সঙ্গে জড়িত ও, সাধারণ যে-সব মানুষ ওর সংস্পর্শে আসে তাদেরকে না জেনে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয়। ওর জীবনের এটা একটা অভিশপ্ত দিক। দিনে দিনে ব্যাপারটা ওকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলছে। নিজ আয়ুর অনিশ্চয়তা সম্পর্কে সচেতনতা যত বেশি বাড়ছে, অপরের জীবন ওর কাছ থেকে তত বেশি সহানুভূতি দাবি করছে। বিষণ্ন মনে রানা ভাবল, এই ব্যাপারটা এক সময় হয়তো ওকে দেশ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বোঝা করে তুলবে।

হোটেল ইউরোপাকে পাশ কাটিয়ে সরু একটা ওয়াটার-ওয়েতে ঢুকল উলফি। গ্র্যান্ড ক্যান্যালের হৈ-চৈ আর ব্যস্ততা নেই এখানে, শুধু লালচে ঘোলা পানি শ্যাওলা মোড়া পাথরে লেগে ছলাত-ছলাত শব্দ করছে। দু'দিকেই গিরিখাদের পাঁচিলের মত খাড়া হয়ে রয়েছে দালানগুলো। রানা ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল পুরানো পাইপের মুখে বসে মোটাসোটা একটা ইঁদুর তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অনেকটা উপর থেকে ভেসে এল ডিম-দেয়া মুরগীর কক্‌কক্ করবার মত শব্দ, সম্ভবত কর্কশ কোন নারীকণ্ঠ থেকে হাসি বেরুচ্ছে। তারপরই গায়ের জোরে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ।

সামনে ঝুলতে দেখা গেল নিচু একটা ব্রিজ। ওটার ভিতর দিয়ে এগোবার সময় উলফিকে প্রায় বসে পড়তে হলো। চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে আছে ওরা, পরিবেশটা শ্বাসরুদ্ধকর। হাতটা হড়কে কোমরে নামাল রানা প্রিয় সঙ্গিনী ওয়ালথার পিপিকে-র আকৃতি অনুভব করবার জন্য, চোখ দুটোকে সতর্কতার সঙ্গে ব্যস্ত রেখেছে চারদিকে। মাথা থেকে অনেক উপরে অসংখ্য ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ফুলগাছের টব একটু যেন দুলে উঠল। চমকে উঠল রানা, তারপরই দেখল রেইলিঙের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় টবটাকে ধাক্কা দিয়েছে নাদুসনুদুস একটা বিড়াল।

পেশীতে তখনও ভালমত ঢিল পড়েনি, কফিন নিয়ে একটা ফিউনারেল্ লঞ্চ হাজির হলো। বিষণ্ন ও অলস ভঙ্গিতে বাঁক ঘুরে ওদের সামনের খালে বেরুচ্ছে কালো রঙ করা লঞ্চটা, নিচু কেবিনের মাথায় রাখা দামী কাঠ দিয়ে তৈরি কফিনটা চকচক করছে। ওটার চারপাশে ফুলের স্তবক সাজানো। কফিনের দিকে পিঠ দিয়ে বসে রয়েছে হেলম্‌স্‌ম্যান, পরনে কালো কাপড়চোপড়, চোখে গাঢ় রঙের সানগ্লাস।

এমনিতেই এটা শোকাবহ একটা দৃশ্য, সেটাকে আরও বিষণ্ন করে তুলল সরু জলপথ আর ঘোলাটে পানি সহ এই পরিবেশ। রানা অনুভব করল, হুইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা হেলম্‌স্‌ম্যান ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। গাঢ় রঙের সানগ্লাস লোকটার চেহারায় অশুভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। মাথার হ্যাটটাও মানায়নি। একটা ফিউনারেল্‌ লঞ্চের হেলম্‌স্‌ম্যান মাথায় কখনও ফ্ল্যাট ব্ল্যাক ক্যাপ পরবে না। উলফির দিকে তাকাল রানা, সে তার স্ট্র হ্যাট নামিয়ে শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিতে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। লঞ্চটা এখন বারো কি তেরো গজ দূরে। হেলমস্‌ম্যান হুইলের উপর ঝুঁকে পড়ল। কেবিনের ভিতর ছায়া-ছায়া মূর্তি লক্ষ করল রানা।

ঠকাস!

বিকট শব্দে খুলে গেল কফিনের ঢাকনি, ওর ভিতর বাগিয়ে ধরা সাব-মেশিনগান নিয়ে উঠে বসল এক লোক। বুলেটের প্রথম ঝাঁকটা উলফির বুক ঝাঁঝরা করে ফেলল, তারপর বল্লমের ডগা দিয়ে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে গনডোলা থেকে ফেলে দিল পানিতে। ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল রানা, স্যাঁৎ করে সামনে বাড়াল ডান হাতটা। একটা বোতামের গায়ে বাড়ি খেলো আঙুলগুলো। বোতামটায় চাপ দিচ্ছে, বুলেটের দ্বিতীয় ঝাঁকটা ওর পিছনের কাঠে চিরুনি চালাল। ঘর্ষণজনিত একটা কর্কশ আওয়াজ অটোমেটিকের আর্তনাদকে ছাপিয়ে উঠল, সেই সঙ্গে হড়কে পিছিয়ে গেল গনডোলিয়রের প্লাটফর্ম–ওখানে একটা ইনবোর্ড মোটর আর টিলার দেখা যাচ্ছে। টিলারটা খপ করে ধরে ফেলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে সগর্জনে জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন, গনডোলার সামনের দিক শূন্যে লাফ দিয়ে ছুটল।

বোট ছুটছে, আরও এক ঝাঁক তপ্ত সীসা রানার মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল। হিংস্র কণ্ঠের হুংকার শোনা গেল, ইউ টার্ন নিয়ে গনডোলাকে ধাওয়া শুরু করল লঞ্চ। সামনে মূর্তিমান আতংক নিয়ে হাজির হলো আরেকটা গনডোলা। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য টিলার ঘুরিয়ে বাঁক নিতে বাধ্য হলো রানা। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল সরু একটা জলপথে আটকা পড়ে গেছে ও, শেষ মাথায় উঁচু পাঁচিল।

এখনও লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে, এক হাতে প্রয়োজন মত ঘোরাচ্ছে টিলারটা। সরু একটা ব্রিজকে পিছনে ফেলে এল। সেদিক থেকে লঞ্চ ইঞ্জিনের কর্কশ গর্জন ভেসে আসছে। ধাওয়াটা এখন শেষ পর্যায়ে। রানাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া এখন স্রেফ কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। পিছনে নতুন একটা শব্দ হলো, কেউ যেন দেশলাইয়ের বাক্স মাড়িয়ে ফেলেছে। ঘাড় ফেরাল রানা, দেখল লঞ্চটা নিচু ব্রিজের তলা দিয়ে ছুটে আসবার সময় কেবিন স্ট্রাকচারটা ভেঙে রয়ে গেল ওখানেই। তাই বলে হেলমস্‌ম্যান হাল ছাড়তে রাজি নয়। সে দেখতে পাচ্ছে রানার পালাবার কোন উপায় নেই, তার হাতেই ওর মৃত্যু হবে।

ইঁটের তৈরি উঁচু পাঁচিল এবার কাছে চলে এল। ইঞ্জিন বন্ধ করে ফিরতি পথের দিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। গনডোলার সামনের দিক বাড়ি খেলো পাঁচিলে।

ঝাঁকি খেলো ঠিকই, তবে পিস্তলটা পকেট থেকে আগেই বের করে ফেলেছে রানা, এই মুহূর্তে নিজের সামনে ধরে রেখেছে দু'হাতে। একজোড়া গাঢ় কাঁচের মাঝখানে সামান্য একটু কাঁপছে মাজল, নীচেই বিজয়ের উল্লাসে ফাটল ধরছে ঠোঁটে। রানা জানে কখন ট্রিগার টানতে হবে–এখনই! তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ, সেই সঙ্গে হেলমস্‌ম্যানের মাথা ঝাঁকি খেয়ে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

নিজের পিঠ চাপড়াবার জন্য এক মুহূর্ত থামল না রানা, ফুটপাথকে আলাদা করে রাখা রেইলিং ধরবার জন্য ডান পাশে লাফ দিল। এক হাত দিয়ে রেইলিংটা ধরে ফেলল, পা দুটো পাঁচিলে বাধিয়েছে। শরীরটা ঝাঁকিয়ে রেইলিঙের উপরে তুলল একটা পা, এই সময় তীরবেগে ছুটে এসে গনডোলা আর পাঁচিলে আঘাত করল লঞ্চটা। এক মুহূর্ত পরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ ঢুকল কানে, উত্তাপের একটা ঢেউ রানার মাথার পিছনের কয়েক গাছি চুল পুড়িয়ে দিল।

পাঁচিল ঘেঁষে কয়েকবার হোঁচট খেল ও, তারপর উবু হয়ে বসে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে হাত রাখল মুখে। ওর পিছনে ক্ষুধার্ত চট্‌চট্‌ শব্দের সঙ্গে পুড়ছে লঞ্চ। আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল আগুন আর আবর্জনার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা আর্ত একটা চিৎকারে। জানালাগুলো খুলে যাচ্ছে, লোকজন চিৎকার করছে, দু'একটা মেয়ে কেঁদে ফেলল। সিধে হলো রানা, দেখল সামনে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে সেই মার্কিন মহিলাও রয়েছে। 'দেখলেন, কী ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গেলাম!'

উলফির কথা ভাবল রানা। ওর এজেন্সি একজন সম্ভাবনাময় শিক্ষানবিসকে হারাল। ব্যক্তিগতভাবে এখন ওর কিছু করবার নেই, এজেন্সির ভেনিস শাখায় ফোন করে কী ঘটেছে জানালে সব ব্যবস্থা ওরাই করবে।

সাত

রাতটা আজ খুব কালো। গনডোলা বা ওকে দেখা যাবে শুধু যদি এই শাখা খালে কোন মোটর বোটের আলো ঠিকরে পড়ে। নিঃশব্দে ভেসে এসে ভারী লোহার গেটটার সামনে থামল ওটা। আর ঠিক তখনই ভেনিসের ঘণ্টাঘরে দশটা বাজবার ঘণ্টা পড়তে শুরু করল। চারপাশে উঁচু-উঁচু ভবনের মাঝখানে সরু এক ফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। মরচে ধরা লোহার গেটে সামান্য একটু আলো পড়ল। তারপরই ধাতব একটা শব্দ হলো। কয়েক সেকেন্ড পর ক্লিক করে খুলে গেল তালাটা। ঘরঘরে আওয়াজ তুলে ফাঁক হচ্ছে গেট।

কান পেতে অপেক্ষা করল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই। গেটের ভিতর ঢুকে নিঃশব্দে পায়ে উঠানটা পেরুল। আজ সকালে দেখে গেছে, কাজেই সিঁড়িটা কোনদিকে জানে। পায়ে রাবার সোল লাগানো জুতো, ধাপ বেয়ে উঠবার সময়

কোন শব্দ হচ্ছে না। খানিকটা দূরে কোথাও একজোড়া বিড়াল রাগ কি অনুরাগের বশবর্তী হয়ে গর্‌গর্‌ করছে। সিঁড়ির মাথায় ভারী দরজা, কড়ায় মস্ত তালা ঝুলছে। ইস্পাতের একটা সরু কাঠি বেরিয়ে এল হাতে, চোখা প্রান্তটা ঢুকে পড়ল তালার ফুটোয়। মিনিট দুয়েক চেষ্টার পর খোলা গেল ওটা। কবাটের সামনে অন্ধকার। হাতের স্পর্শে মনে হলো একটা করিডর। অন্ধের মত এগোচ্ছে রানা, পেন্সিল টর্চ জ্বালাবার ঝুঁকি নিচ্ছে না। যেন এক যুগ পর সামনে ক্ষীণ আলোর আভা দেখতে পেল।

একটা বাঁক। বাঁক ঘুরবার পর নিশ্চিত হওয়া গেল, হ্যাঁ, এটা একটা করিডরই। একটাই কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে। প্রায় চল্লিশ ফুট অন্ধকার পাড়ি দিয়ে বাঁক নিয়েছে ও। এটাও প্রায় একই রকম লম্বা, নাক বরাবর শেষ মাথায় একটা ভারী লোহার দরজা। দরজার পাশে একটা পকেট কমপিউটরের শুধু সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। আধো অন্ধকারে সংখ্যাগুলো লালচে আভা ছড়াচ্ছে। করিডরের ইঁটগুলো পুরানো, তবে দরজা সবগুলোই নতুন। শুধু ভারী লোহার দরজার কবাটে কোন হাতল বা তালা নেই। দরজা খোলার জাদুকর অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এখন উপায়?

ঠিক এই সময় পিছন থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। ওর পিছনের একটা দরজা মনে হলো আশ্রয় দিতে পারবে ওকে। পিছিয়ে এসে ল্যাচ তুলে চাপ দিল, ভারী ওক বিনা প্রতিবাদে সরে গেল। অন্ধকারে পা ফেলল রানা। নাকে যে তীব্র দুর্গন্ধ বাড়ি মারল, সেটার জন্য শুধু গুমোট পরিবেশ দায়ী হতে পারে না। দুর্গন্ধের সঙ্গে ওর চারদিকে খসখসে একটা আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। পেন্সিল টর্চটা একবার জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলল রানা। এক পলকেই যা দেখবার দেখে নিয়েছে। ঘরটার ভিতর অনেকগুলো শেলফ। প্রতিটি শেলফে কয়েকটা করে খাঁচা। প্রতিটি খাঁচায় ছুটোছুটি করছে অসংখ্য মূষিক ও মূষিকা। তীক্ষ্ণ, লাল চোখে রানাকে দেখছে ওগুলো।

এত ইঁদুর দিয়ে কী হবে?

তবে প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই, প্রায় বন্ধ দরজার ফাটলে চোখ রাখল রানা। সাদা কোট পরা এক লোক, সম্ভবত ডাক্তার হবেন, হাতে কাগজের স্তূপ নিয়ে দৃষ্টিপথে চলে এলেন। ধাতব দরজার সামনে থামতে হলো তাঁকে। চেহারায় বিরক্তির ভাব নিয়ে আলোকিত কমপিউটর প্যানেলের সংখ্যাগুলোয় চাপ দিলেন তিনি। বাছাই করা সংখ্যাগুলোর রঙ লাল থেকে হলুদ হয়ে গেল। এবার দরজার গায়ে চাপ দিতে খুলে গেল সেটা। চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন ডাক্তার ভদ্রলোক, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সংখ্যাগুলো আবার লাল হয়ে গেল। ভিতরে কী আছে ভাল করে দেখবার সুযোগ পায়নি রানা, তবে স্টোররুম বলে মনে হয়েছে। ভদ্রলোক আবার বেরিয়ে আসবেন, এই আশায় অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠল রানা। এতরাতে ওখানে তাঁর কী কাজ থাকতে পারে? আরও তিন মিনিট অপেক্ষা করল ও। নাহ্‌,

ভদ্রলোক ফিরছেন না। ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ঘটছে। আর কী ঘটছে জানার একটাই তো উপায়।

ইঁদুরের আস্তানা থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। ভুল কম্বিনেশনে চাপ দিলে আবার না অ্যালার্ম বেজে ওঠে। তবে ভুল হবে কেন, লোকটা কোন্ কোন্ সংখ্যায় চাপ দিয়েছে পরিষ্কার দেখেছে ও। এক এক করে সেগুলোয় আঙুল ছোঁয়াল। ফাইভ-ফাইভ ওয়ান-থ্রী-ওয়ান। প্রথমে কিছুই ঘটল না, তারপর সংখ্যাগুলো হলুদ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দরজা ঠেলে খুলল রানা, স্যাঁৎ করে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এটা প্রায় অন্ধকার একটা আউটডোর অফিস। দু'পাশে ফাইলিং কেবিনেট আর বিভিন্ন আকৃতির বাক্স দেখা যাচ্ছে। কাঁচের জানালা দিয়ে দ্বিতীয় কামরার ভিতরটা দেখা যায়। জানালাটা ভিউইং চেম্বারের মত, সাধারণত ম্যাটারনিটি হসপিটালে যেমন থাকে। আলোর বন্যায় ডোবা একটা ল্যাবরেটরি বলে মনে হলো। অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে রানা, মাথায় প্রশ্ন—কী ঘটছে এখানে? মূষিক রহস্যের সমাধান অন্তত পাওয়া গেছে। ওগুলোকে এক্সপেরিমেন্টের কাজে ব্যবহার করা হবে। দূরের দেয়ালে চোখ পড়তে ওগুলোর একজোড়া দেখতে পেল—খাঁচার সিকে ভর দিয়ে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে যেন রানার মতই কৌতূহলী ভঙ্গিতে গন্ধ শুঁকছে।

ভেনিসের একটা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে ল্যাবরেটরি থাকবে কেন? কার্তেজ লাম্বাডা নতুন ধরনের কাঁচ বা প্লাস্টিক তৈরির চেষ্টা করছেন? কিন্তু সেরকম কোন তথ্য কেউ দেয়নি রানাকে। তা ছাড়া, ল্যাবে যে-সব ইকুইপমেন্ট দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে কাঁচের বা প্লাস্টিকের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। টেস্ট টিউব, বীকার, ব্যালান্স আর মাইক্রোস্কোপ বাদ দিলে ল্যাবে লম্বা আর জটিল একটা ডিস্টিলেশন সিস্টেমই বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে, এটা যেন একটা অয়েল রিফাইনারি। গাদা গাদা কাঁচের পাইপ আর রঙিন টিউব সারি সারি বোতল আর বকযন্ত্রে এসে ঢুকেছে। প্রক্রিয়াটার শেষাংশ দেখতে পাওয়া গেল একটা সীল করা গ্লাস কেস-এর ভিতর। রানা দেখল ডিস্টিলেট বা পাতন করা তরল পদার্থ এক সারি যান্ত্রিক বাহুর সাহায্যে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে, কেসটার পাশে উবু হয়ে বসে ওগুলোকে অপারেট করছেন দু'জন বিজ্ঞানী। দু'জনের মধ্যে একজনকে আগেই দেখেছে রানা, করিডর হয়ে খানিক আগে ভিতরে ঢুকেছেন।

পাতন করা পদার্থ ফোঁটায় ফোঁটায় কাঁচের একটা ফায়াল-এ পড়ছে। ফায়াল ভরে উঠবার পর একজোড়া যান্ত্রিক বাহু সীল করছে ওটার মুখ, তারপর পৌঁছে দিচ্ছে একটা কনভেয়র বেল্টে। ছ'টা ফায়াল-এর একটা কনভয়কে অল্প ঢালু বেল্ট নীচে নামিয়ে নিয়ে গেল। উপর থেকে ওগুলোর পিছনে নেমে এল কাঁচের তৈরি গিলোটিনের মত একটা শীল্ড, মেইন ডিস্টিলেশন প্রসেস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলাটাই উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানীদের একজন এবার আরেকটা গ্লাস স্ক্রীন অপারেট করলেন, ফলে জায়গা বদলে দৈত্যাকার একটা রিফ্রিজারেটরে আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ ঘটল

ফায়ালগুলোর। গোটা অপারেশনে যে সূক্ষ্মতা লক্ষ করা গেল, ডিস্টিলেট তরল পদার্থ সীল করবার সময় যে সতর্কতা গ্রহণ করা হলো, তারপর আর কাউকে বলে দিতে হয় না যে জিনিসটা মারাত্মক কোন বিষ।

রানা অনুভব করল ওর পালস ছুটছে। অবশেষে নিরেট কিছু একটা দেখতে পেয়েছে ও। ডিস্টিলেট-এর একটা নমুনা যে করে হোক পেতেই হবে ওকে। গলা লম্বা করে সামনে এগোতে যাবে, বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। বিজ্ঞানীদের একজন রিফাইনারি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এখন ফিরে আসছেন। ভদ্রলোক একজোড়া স্ফিয়ার বা গোলক ঠেলে আনছেন। হুবহু ঠিক এই জিনিস দেখেছে রানা কার্তেজ লাম্বাডার সেফে পাওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং-এ। প্রতিটি স্ফিয়ার বা গোলক বাচ্চাদের হাই-চেয়ারের মত একটা কাঠামোয় রেখে ঠেলে আনা হচ্ছে। গোলকের মাঝখানে অদ্ভুত ষড়ভুজাকার অংশটা বিশেষভাবে লক্ষ করল রানা।

দ্বিতীয় বিজ্ঞানী কনিং টাওয়ারের ঢাকনি সরালেন, তারপর অত্যন্ত সাবধানে সদ্য ডিস্টিলেট ভরা একটা ফায়াল ভিতরে ঢোকালেন। ঢাকনিটা পিছলে জায়গামত ফিরে এল; একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেল দ্বিতীয় স্ফিয়ার বা গোলকের বেলায়ও। অপারেশন শেষ, বিজ্ঞানী দু'জন একটা গোলককে ঠেলে নিয়ে গেলেন ল্যাবরেটরির শেষপ্রান্তে, সেখান থেকে অত্যন্ত সাবধানে দরজার বাইরে–ট্রলি কাছাকাছি চলে আসতে নিজে থেকেই খুলে গেল ওটা।

দরজাটা বন্ধ হয়েছে কি হয়নি, ল্যাবরেটরিতে ঢুকে ডিস্টিলেশন সিস্টেমের দিকে এগোল রানা। রিফ্রিজারেটরের দরজা খুলে ফায়ালগুলোর উপর চোখ বুলাল, তারপর সদ্য তোলা ফায়ালগুলো থেকে বের করে নিল একটা। বাকিগুলোর গায়ে পাতলা বরফ জমেছে। কান পেতে আছে, বিজ্ঞানীদের ফিরে আসার শব্দ যাতে সময় থাকতে শুনতে পায়। অবশিষ্ট স্ফিয়ার-এর দিকে এগোল ও। ওটার ফায়াল আর ওর হাতের ফায়ালের তরল পদার্থ একই জিনিস কি না চেক করে দেখতে হবে ওকে। কনিং টাওয়ারের ঢাকনি একগাদা স্প্রিঙের সমষ্টি, খুলতে হলে দু'হাত দরকার। ফায়ালটা নাগালের মধ্যে রেখে ঢাকনিটা এক-দেড় ইঞ্চি খুলেছে মাত্র, এই সময় বিজ্ঞানীদের ফিরে আসার শব্দ শোনা গেল।

নিজেকে শান্ত থাকতে বলে ফাঁকটার ভিতর তর্জনী আর বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে একটা ফায়ালের ঠোঁট ধরল রানা। ওটা বের করে আনছে, অনুভব করল ঢাকনিতে বাধা পাওয়ায় ওর আঙুল থেকে ছুটে যাওয়ার উপক্রম করছে ফায়ালটা, থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। কড়ে আঙুল বাঁকা করে ঢাকনিটাকে ঠেক দিয়ে রাখল রানা, হাতটা মুক্ত করে খসে পড়ার ঠিক আগে মুঠোয় পুরল ফায়ালটা। অটোমেটিক দরজা হড়কে খুলে গেল। মাথা নামিয়ে নিয়ে ফায়ালটা পুলওভারের ব্রেস্ট পকেটে রেখে দিয়েছে। কয়েকটা ওঅর্কবেঞ্চ আর ইন্সট্রুমেন্ট-এর র‍্যাককে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে আউটার অফিসে ফিরে এল, সিধে হওয়ার আগে নিজের পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

অভিজ্ঞতাই বলে দিল এখনই কেটে পড়া দরকার, ভাগ্যকে এরচেয়ে বেশি পরীক্ষায় ফেলা উচিত হবে না। তা সত্ত্বেও জানালা দিয়ে ল্যাবরেটরির ভিতর একবার না তাকিয়ে পারল না রানা। বিজ্ঞানী দু'জন দ্বিতীয় স্ফিয়ারের কাছে ফিরে এসেছেন। ওটাকে অটোমেটিক ডোর-এর দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। সর্বনাশ! একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নেওয়ায় চিৎকারটা রানার গলা দিয়ে বেরুতে পারল না। চোখে দেখার পর উপলব্ধি করছে ও–রিফ্রিজারেটর থেকে বের করা ফায়ালটা স্ফিয়ার-এর সেন্টার সেকশনে রেখে এসেছে। এখনি জিনিসটা বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ে যাবে।

ট্রলি এগোতে শুরু করতে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রানা, এই সময় হাহাকার ধ্বনির মত তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার অবজারভেশন প্যানেলের মোটা কাঁচ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এল। একজন বিজ্ঞানী মরিয়া হয়ে সামনের দিকে ঝাঁপ দিলেন, তাঁর ধাক্কা খেয়ে ট্রলিটা ঝাঁকি খেলো। রানা বুঝতে পারল ঠিক কী ঘটেছে। ট্রলি প্রথমবার নড়ে উঠতেই ফায়ালটা স্ফিয়ার থেকে গড়িয়ে নীচে পড়তে শুরু করে। দেখে মনে হলো সবুজ ধোঁয়ার ছোট একটা মেঘ বাতাসে ভেসে আছে। ল্যাব সিলিঙে অস্থিরভাবে জ্বলছে-নিভছে উজ্জ্বল লাল একটা আলো, একই সঙ্গে বেজে উঠল কানের পর্দা ফাটানো অ্যালার্ম। হিস্‌হিস্ শব্দ করে দরজা ফ্রেমের চারদিকে বেরিয়ে এল সবুজ এয়ারটাইট সীল; এই দরজা দিয়েই ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছিল রানা।

ভয়ে ধক-ধক করছে বুকের ভিতরটা, দেখল বিজ্ঞানীরা হোঁচট খেতে খেতে অটোমেটিক ডোর-এর দিকে এগোবার চেষ্টা করছেন। একজন ইন্সট্রুমেন্ট ভরা একটা র‍্যাকের গায়ে বাড়ি খেলেন, ওগুলোকে সঙ্গে নিয়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে। দ্বিতীয় বিজ্ঞানী দরজার কাছে পৌঁছাতে পারলেও দেখলেন সেটা খোলা যাচ্ছে না। প্রথমে ঘুসি মারলেন দরজায়, তারপর আঙুলের ডগা দিয়ে করুণ ও নিষ্ফল চেষ্টা করলেন খুলবার। কয়েক সেকেন্ড পরই নিজের গলা খামচে ধরলেন, দরজার গায়ে ঘষা খেয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছেন। তাঁকে আর রানা দেখতে পেল না। ল্যাবরেটরির বাতাস এখন সবুজাভ, ভিউইং প্যানেলের ইনার সারফেসে সবুজ পাতলা কাদার মত প্রলেপ জমেছে, অ্যাকুয়ারিয়ামের গায়ে যেমন দেখা যায়। শুধু ইঁদুরগুলোকে সতেজ ও স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, এখনও খাঁচার সিকের ফাঁকে নাক বের করে দিয়ে কৌতূহলী ভঙ্গিতে কী যেন শুঁকছে।

ভয়ে ভয়ে, সাবধানে শ্বাস নিচ্ছে রানা। প্রতিবার ফায়ালটার অস্তিত্ব অনুভব করছে বুকে। ভিতরে নাইট্রো-গ্লিসারিন থাকলেও এটাকে অনেক কম বিপজ্জনক বলা যেত। সামনের নারকীয় দৃশ্যটার কাছ থেকে পালাবার জন্য অস্থির হয়ে বোতামে চাপ দিয়ে করিডরের দরজা খুলল রানা। পায়ে ঝড় তুলে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। উঠানে এখন চাঁদের আলো আছে, তবে সেই আলোয় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এখানে অ্যালার্মের আওয়াজ অস্পষ্ট শোনাচ্ছে। লোহার গেটটা পেরুতে পারলেই নিরাপদ ও। উঠান ধরে এগিয়ে এসে গেটটা খুলল রানা।

গনডোলাটা নেই। সরু খাল ধরে সামনে ছুটল দৃষ্টি। শাখা খাল যেখানে মূল খালের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, বিশ গজ দূরে অলসভঙ্গিতে ভাসতে দেখা গেল খালি গনডোলাকে। ঘুরল রানা, দেখল সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোইচি।

ওর হাত পিস্তলের দিকে ছুটল, কিন্তু সেটাকে ফায়ারিং পজিশনে তুলতে পারার আগেই কোইচির হাতের কিনারা কোদালের কোপের মত বাড়ি মারল গলার পাশে। খোয়ার উপর ছিটকে পড়ে খটাখট আওয়াজ করল ওয়ালথার, সেটার পিছু নিয়ে আছাড় খাচ্ছে রানাও, মনে হলো শরীরের সবগুলো নার্ভ অবশ হয়ে গেছে। উড়ন্ত একটা পা পিস্তলটাকে দূরে সরিয়ে দিল। কোইচির দ্বিতীয় লাথি রানার পাঁজরে লেগে হড়কে গেল। ওটা সরাসরি লাগলে হাড়গুলো পাটখড়ির মত মট-মট করে ভেঙে যেত।

এই মুহূর্তে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি সাহায্য করছে ওকে। গড়িয়ে একপাশে সরল, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে সিধে হলো। এগিয়ে এসে আবার পা তুলল কোইচি, তবে সেটার নীচ দিয়ে বেরিয়ে এসে একটা দরজার দিকে ছুটল রানা—জানে এই দরজা দিয়ে শোরুমে যাওয়া যায়। বুকের কাছে ভেজা ভেজা কী যেন অনুভব করল ও, এক পলকের প্রার্থনায় ঈশ্বরকে বলল জিনিসটা যেন শুধু পানি হয়। ফায়াল যদি ভাঙে রে···

ঘাড় এমন দব্‌দব্‌ করছে, ভিতর দিয়ে যেন ইলেকট্রিক কারেন্ট বয়ে গেছে। দরজার গায়ে কাঁধ দিয়ে পড়ল রানা, সেই সঙ্গে হাতলটা ধরে মোচড়াল। পিছন থেকে কোইচির ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রকাণ্ড একটা কাছিমের মত এগোচ্ছে লোকটা। দরজা খুলে গেল, অন্ধকার শেলফগুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটল রানা। জানালার টেনে দেওয়া পর্দার ফাঁক দিয়ে চাঁদের অল্প আলো ঢুকছে ভিতরে। এই জানালাগুলো সেন্ট মার্ক'স স্কয়ারের দিকে খোলা। কাছেপিঠে কোথাও একটা অর্কেস্ট্রা বাজছে। ওঅর্কশপের কটু গন্ধ ঢুকছে কামরার ভিতর। অন্ধকারে অপেক্ষা করছে রানা। কান দুটো সজাগ। লোকটার হাঁপানোর আওয়াজ পেল। আওয়াজটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

রানা বুঝল, ভয়ঙ্কর একটা লুকাচুরি খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। জানালাগুলোর কারনিসে বা সামনে এত সব তৈরি মাল সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে শার্শি লক্ষ্য করে ডাইভ দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, ফায়ালটার কথা ভুললে চলবে না। প্রবেশপথটা পালাবার একটা পয়েন্ট বটে, কিন্তু কোইচি সম্ভবত ওই পথটাই আগলে রেখেছে।

দু'সারি র‍্যাকের মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল রানা। এত বেশি অ্যান্টিক গ্লাস চাপানো হয়েছে, প্রতিটি র‍্যাকের অবস্থা পড়ো পড়ো। কোন রকমে শুধু যদি একবার—ধপাস্! কাপড়ের ভারী গাঁটের মত রানার উপর এসে পড়ল কোইচি। একটা র‍্যাক কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে, চারদিকে বিস্ফোরিত হতে শুরু করল কাঁচের জিনিসপত্র। রানা অনুভব করল দ্বিতীয় র‍্যাকে পিঠ দিয়ে পড়েছে ও। ফুসফুসের সমস্ত বাতাস যেন টেনে বের করে নেওয়া হয়েছে। সরাসরি ওর মুখে পড়

কোইচির নিঃশ্বাসে তীব্র একটা গন্ধ চিনতে পারল–লোকটা খুনের নেশায় মাতাল হয়ে আছে।

যে-কোন একটা অস্ত্র পাওয়ার মরিয়া চেষ্টায় মেঝে হাতড়াচ্ছে ও। ভাঙা কাঁচের একটা ফালি ঠেকল আঙুলে। সেটা ধরে গাঁথার ভঙ্গিতে উপর দিকে তুলল। বাঘের হুংকার দিয়ে শুরু করলেও, আওয়াজটা ব্যথায় কাতর কুকুরের কুঁইকুঁই-এ পরিণত হলো, সেই সঙ্গে রানার গলা পেঁচিয়ে ধরা আঙুলে ঢিল দিতেও বাধ্য হলো কোইচি। থেমে নেই তার প্রতিপক্ষ, কাঁচের ফায়ালটা আরও দু'বার গেঁথে দিয়েছে শরীরের পাশে। রানা অনুভব করল ওর ডান হাত পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে গরম রক্তে।

ছেড়ে দিয়েছিল, এখন আবার নতুন করে রানার গলাটা ধরতে চাইছে কোইচি। কাঁচের ফালিটা ভেঙে ছোট হয়ে যাওয়ায় সেটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা অস্ত্র খুঁজে নিল রানা। ভারী গ্লাস ভাস, মুখ খোলা মাছের মত আকৃতি। কোইচি বিপদ টের পেয়ে মাথা তুলে বসতে যাবে, দু'হাতে ধরা ভাসটা সবেগে জাপানি শত্রুর চাঁদিতে নামিয়ে আনল।

বুক আর পেট থেকে ঢলে পড়ে যাচ্ছে কোইচি, গড়িয়ে দূরে সরে আসছে রানা, অনুভব করল কাঁধের ঘষায় ভাঙা কাঁচ আরও ভাঙছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো ও, অবাক হয়ে দেখল একই সঙ্গে কোইচিও দাঁড়িয়েছে। লোকটার মাথার রক্ত কাঁধ হয়ে নীচে গড়াচ্ছে। কাঁচের ভাঙা ফালিটা এখনও গাঁথা রয়েছে পাঁজরের ফাঁকে। ব্যথায় গোঙাচ্ছে সে, হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন, আবার প্রচণ্ড রাগে দাঁতে দাঁতও পিষছে, গোঁয়ারের মত ধরতে আসছে রানাকে।

বার কয়েক হোঁচট খেয়ে পিছু হটল রানা, দেখল দোকানের সামনে যাওয়ার পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কোইচি দাঁড়িয়ে আছে পিছনে আলো নিয়ে, তার বিরাট হাত দুটো শরীর থেকে দূরে সরানো। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তার কাছিমসদৃশ মাথা যেন কাঁধের ভিতর আরও বেশি সেঁধিয়ে গেছে, ফলে হামটি-ডামটি বা কুমড়োপটাসের মত লাগছে তাকে। সামনে এগোল সে, কনুইয়ের ধাক্কা খাচ্ছে শেলফগুলো; রানা কুঁকড়ে পিছু হটে ওঅর্কশপের উত্তাপে ঢুকছে। কোইচির চোখ গান টারিটের সরু ফাটলের মত চকচক করছে। পিছনটা হাতড়ে প্যাসেজের মুখ পেল রানা, তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল সেটার ভিতর।

কোইচির প্রথম মার এখনও অনেকটা অবশ করে রেখেছে ওকে, তবে প্রতিটি নড়াচড়া ওর রিফ্লেক্সকে বেঁধে রাখা শিকল ঢিল করে দিচ্ছে। ঘুরে সামনে পা ফেলল, চলে এল অন্ধকার ওঅর্কশপে। এই অন্ধকারে জ্বলছে শুধু ক্রুসিবল বা মুচি, যা কখনও নেভে না। ওঅর্কশপের দূরপ্রান্তে একপ্রস্থ কাঠের সিঁড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেদিকে ছুটল রানা। তারপরই ধাক্কাটা খেলো–কিসের সঙ্গে বলতে পারবে না, তবে শব্দ শুনে মনে হলো একটা ঘণ্টায় বাড়ি মারা হয়েছে। টলতে টলতে পিছু হটতে হলো, ব্যথায় গোঙাচ্ছে। জিনিসটাকে পাশ কাটাল ও, এবার সাবধানে এগোচ্ছে। ক্লিক! পিছনে সুইচ অন করবার শব্দ। ঘুরে দাঁড়াতেই

দেখল বিজয়ীর হাসি হাসছে কোইচি। মস্ত একটা হাত সামনে লম্বা হলো, সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। কোইচি হাত বাড়িয়েছে গ্লাসব্লোয়ার-এর রডের দিকে। কারিগররা মুচি বা ক্রুসিবলের মুখে ফেলে রেখে গেছে ওটাকে। আগুনের তলা থেকে ওটার ডগা উত্তাপে সাদা অবস্থায় বেরিয়ে এল। রডটাকে নিজের সামনে তরোয়ালের মত ঘোরাল কোইচি। এক পা সামনে বাড়ল সে, তারপর হঠাৎ হাতটা ওর দিকে সোজা করল। ট্রেসার বুলেটের মত রানার মাথা লক্ষ্য করে ছুটে এল রড।

এমন অপ্রত্যাশিত গতি, মাথা নিচু করবার সময়টুকুও পাওয়া গেল না। বরফে চিড় ধরার মত আওয়াজ হলো, সামনের দৃশ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। ওর চোখের পাতা থেকে খই ভাজার মত চিড়চিড় শব্দ হচ্ছে, সামনে রডের উত্তপ্ত সাদা ডগাটাকে লাল হয়ে যেতে দেখল, তারপর প্রচণ্ড বেগুনি। রানা দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে প্লেট গ্লাসের একটা শিট নিয়ে, রডের আঘাত পুরোপুরি ওটাই হজম করেছে। রডের ডগা ওর মুখ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকতে থেমে যায়। মাকড়সার জাল হয়ে যাওয়া গ্লাসটাকে পাশ কাটিয়ে আবার সিঁড়ির দিকে ছুটল ও।

আবার বাঘের মত গর্জে উঠল কোইচি, আওয়াজটা রানার গায়ের পশম দাঁড় করিয়ে দিল। প্রথম ল্যান্ডিঙে পৌঁছেছে ও, সিঁড়ির তলায় দেখা গেল কোইচিকে। তারপর ধাপ বেয়ে যেন একটা হাতি উঠে আসতে শুরু করল—কাঁপছে না, রীতিমত দোল খাচ্ছে কাঠের সিঁড়িটা।

দ্বিতীয় ল্যান্ডিঙে প্রচুর প্যাকিং কেস দেখল রানা। কিছু খোলা, ভিতরে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হয় এমন সব সরঞ্জাম। এক কোণে একটা পুলি সিস্টেম রয়েছে, বোঝা গেল চিলেকোঠাটা স্টোররুম হিসেবে কাজে লাগছে। মাথা নিচু করে অপেক্ষা করছে রানা, ধড়াস্ ধড়াস্ করছে বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড। হঠাৎ খেয়াল করল, সামনে পড়ে থাকা একটা প্যাকিং কেসে স্টেনসিল করা কয়েকটা শব্দের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও: P&M. Rio de Janeiro। ইন্টারেস্টিং তো! তবে সূত্রটা পেতে বোধহয় অনেক দেরি হয়ে গেল। হুড়মুড় করে চিলেকোঠায় ঢুকছে কোইচি, রিস্ট গানটা ব্যবহার করল রানা। ঝাঁকি দিয়ে কব্জি পিছিয়ে আনল—তীক্ষ্ণ একটা শব্দের সঙ্গে দূরপ্রান্তের দেয়ালে বিস্ফোরিত হলো ইঁটের গুঁড়ো। অস্ত্রটা ভয়ঙ্কর হলেও অব্যর্থ বলা যাবে না। ছুটে সামনে এগোতে যাবে কোইচি, এক পাশে লাফিয়ে রানাকে একটা প্যাকিং কেসের পিছনে চলে যেতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

এক কোণার ছোট একটা দরজা পেরিয়ে আরও এক প্রস্থ সিঁড়ি ভাঙল রানা। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে উঠতে হলো ওকে। ফ্লোর লেভেলের উপরে উঠল মাথা, চারদিকে অ্যান্টিক মেশিনারির ভিড় দেখতে পাচ্ছে। আলো বলতে সেমি-ট্র্যান্সপ্যারেন্ট একটা আলোকিত বৃত্ত রোমান কিছু সংখ্যাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। এক পলকের মধ্যে রানা উপলব্ধি করল, সিঁড়ি বেয়ে ক্লক

টওয়ারের ওঅর্ক চেম্বারে বেরিয়ে এসেছে ও, দাঁড়িয়ে আছে ক্লক ফেস-এর পিছনে। ওকে ঘিরে থাকা অসংখ্য পুলি, কগ-হুইল, চেইন ইত্যাদি সবই একটা প্রকাণ্ড ঘড়ির যন্ত্রাংশ। যে-পথ দিয়ে ঢুকেছে সেটা ছাড়া বেরিয়ে যাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। ওকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়তে হবে। এক গাদা চেইন দু'হাতে জড়িয়ে টেনে নিয়ে এল রানা, ফ্লোর লেভেলের উপর জাপানি প্রতিপক্ষের মুখ জেগে উঠতেই ছেড়ে দিল সব।

কোইচি গ্রাহ্যই করল না, হাত বাড়িয়ে অনায়াসে ঠেকিয়ে দিল। পরমুহূর্তে চেইনের পর্দা ভেঙে সগর্জনে ছুটে এল সে। বাধা হঠিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল, রানার মনে হলো কাঁধ দুটো থেকে মাথাটা ইঞ্চি দুয়েক উঁচু হয়ে গেছে। শরীরের ডান পাশটা আবার অবশ হয়ে এল। কাঁধটা ঝুলিয়ে দিয়ে একটা লেফট্ হুক ঝাড়ল রানা, গর্তে ঢোকা কোইচির চোয়াল টকটকে লাল হয়ে উঠল। নিঃশব্দে হাসল কোইচি। নিজের অজান্তে বক্সারের হাসি নয়, যে হাসি প্রমাণ করে যে সে আহত হয়েছে। কোইচির এই হাসি বলতে চাইছে: 'তোমার সবচেয়ে কড়া মারটা খেয়ে মনে হলো কেউ আমার গালে হাত বুলিয়ে দিল।' পিছু হটে মেশিনারির ভিড়ে ঢুকে পড়ল রানা।

কোইচি এগিয়ে এল, মুখে এখনও গম্ভীর হাসি লেগে রয়েছে। হঠাৎ ওদের চারপাশ থেকে ধাতব গুঞ্জন আর ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল। দূরে কোথাও একটা গির্জায় ঘণ্টা পড়তে শুরু করল। রানা বুঝতে পারল কীসের শব্দ হচ্ছে। ঘণ্টায় বাড়ি মারার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সমস্ত মেশিনারি একযোগে। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে ওদের মাথার উপর দুই ব্রোঞ্জ মূর্তি বেল-এ হাতুড়ির বাড়ি মারতে শুরু করবে, প্রায় পাঁচশো বছর ধরে যেমন মেরে আসছে।

আধো অন্ধকারে সরু ফাঁকের ভিতর কোইচির চোখ দুটো চকচক করছে। মেশিনারি প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখে সে-ও কনুই দুটো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আঘাত করবার জন্য তৈরি হলো। তার পিছনে আর দু'পাশে কী আছে দেখতে পেয়ে হামলাটা প্রথমে রানাই করল। কিছু না, তেড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি করা, ব্যস। হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছাল কোইচি। রানার উদ্দেশ্য শুধু ভয় দেখানো বুঝতে পেরে আবার আক্রমণের প্রস্তুতি নিল সে। রানা ইতিমধ্যে একটু এগিয়েছে। এক হাত পিছাল কোইচি। আঘাত আসবে, রানা শিউরে ওঠার ভান করল। পরমুহূর্তে কোইচির গলা চিরে একটা বিস্ময়সূচক চিৎকার বেরিয়ে এল। তার পরনের রোব-এর ঢোলা আস্তিন খাঁজ কাটা ঘুরন্ত একটা চাকায় আটকে গেছে।

শরীর মুচড়ে মুক্ত হাতটা দিয়ে কাপড়টা ছাড়াতে যাবে, আরেকটা খাঁজ কাটা ঘুরন্ত চাকা প্রথমটার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য এগিয়ে এল। দুই চাকার মাঝখানে তার মুক্ত হাত আটকে গেছে। চাকাগুলোর দাঁত থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য লড়ছে কোইচি, একটা চেইনের মাথায় ঝুলন্ত ভার বা বোঝা দেখতে পেয়ে খপ করে সেটা ধরল রানা, পেণ্ডুলামের মত দোলাচ্ছে। প্রথম আঘাতটা কোইচির

মাথার একটা পাশ থেঁতলে দিল। তাক করে আরেকবার অস্ত্রটা ছুঁড়ে দিল রানা, সেইসঙ্গে ব্রোঞ্জ মূর্তি দুটো ঘণ্টায় বাড়ি মারতে শুরু করল।

ব্যথায় অন্ধ হয়ে মেশিনারির সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল কোইচি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে নিজের হাত মুক্ত করল সে, পরমুহূর্তে ধাতব ভার সবেগে আঘাত করল তার চোয়ালে। ক্ষত-বিক্ষত হাতটা রানার মুখের সামনে বাতাস খামচাচ্ছে, কানের নীচে আর নাকের পাশে রক্তের গরম ছিটা অনুভব করল রানা। থমকে থমকে সামনে এগোল কোইচি, মরিয়া হয়ে রানার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

আছাড় খেয়ে পিছন দিকে, প্রায় ঘড়ির মুখে পড়ে গেল রানা। এই সময় লাফ দিল কোইচি। এক পাশে সরে এসে আবার ভারটা ছুঁড়ল রানা, লাগল কোইচির মাথার পিছনে। সামনে ছোটার গতি বেড়ে গেল তার, পতন ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ভৌতিক আলোময় বৃত্তের বিপরীতে হাত দুটো মেলে দিল। ভাঙচুরের শব্দ ভেসে এল, সেই সঙ্গে অকস্মাৎ রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল কামরার ভিতর। কোইচি অদৃশ্য হয়ে গেছে, ক্লক ফেস-এ রেখে গেছে এবড়োখেবড়ো কিনারাসহ একটা গর্ত।

চৌরাস্তায় অর্কেস্ট্রা বাজছিল, হঠাৎ রেকর্ড থেকে পিন তুলে নেওয়ার মত বাজনাটা থেমে গেল। তার বদলে সম্মিলিত কণ্ঠে একটা আতঙ্কিত কোরাস শোনা যাচ্ছে। প্রায় অবশ আঙুল থেকে চেইন সহ ভারটা খসে পড়তে দিল রানা। টলতে টলতে সামনে এগিয়ে গর্তের ভিতর দিয়ে নীচে তাকাল।

একটা টেবিলের উপর পড়েছে কোইচি। এই মুহূর্তে সেই টেবিলের উপরই মুখ থুবড়ে রয়েছে সে। সাদা ধবধবে টেবিল-ক্লথে গাঢ় একটা দাগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। লোকজন মুখ তুলে তাকাতে যাচ্ছে, ঝট করে ফাঁকটা থেকে সরে এল রানা। সিঁড়ির দিকে হাঁটছে ও। ফেরার সময় হয়েছে।

আট

ব্যালকনির কিনারায় সরে এসে হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিল তাপসী। ল্যাম্পের আলোয় উদ্ভাসিত জেটির সামনে ফেরি বোট আর ছোট স্টীমারের ভিড় লেগে আছে। কয়েকজন নাবিক আর ট্যুরিস্ট ঘুমাবার জন্য যে-যার আস্তানায় ফিরছে। ব্যালকনির নীচে, সরাসরি সামনে, কফি টেবিলের মাথায় একটা রয়্যাল ব্লু সান আমব্রেলা ভাঁজ করছে একজন ওয়েটার। দূরে ক্যানাল ডি সান মার্কো আলোর খুদে বিন্দুর সমষ্টি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্যুইটে ফিরবার জন্য ঘুরল তাপসী। ওর বক্তৃতা খুব ভাল হয়েছে, তবে উত্তেজনার অবসান নিস্তেজ করে তুলেছে তাকে—এখন দরকার ঘুম। টেবিলের আলো নেভানোর জন্য হাত বাড়িয়েছে, দ্বিতীয় একটা হাত পড়ল সেটার উপর। বোতামে চাপ দিল তাপসী, দেখা গেল

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা। কঠিন চোখ ওর, অবয়বে নির্দয় একটা ফাঁক। সব চুল এলোমেলো হয়ে আছে, মুখে কাটাকুটির দাগ। ভাব দেখে মনে হলো, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটাকে আরও ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইছে তাপসী।

'আপনি আমার স্যুইটে কী করছেন?'

রানার প্রায় হিংস্র ভাব অটুট থাকল। 'শুশ্রূষা নিচ্ছি। আপনার বন্ধু কোইচি খানিক আগে আমাকে খুন করতে চাইছিল।'

তাপসীর নাকের ফুটো ফুলে উঠল। হার্টবিট স্বাভাবিক হওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছে সে। 'আপনার ধারণা ব্যাপারটার সঙ্গে আমি কোন ভাবে জড়িত?'

প্রায় ঝটকা দিয়ে তাপসীর হাতটা ছেড়ে দিল রানা, স্যুইটে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এক এক করে আরও আলো জ্বালছে। 'হ্যাঁ, সে-রকম একটা সন্দেহ মাথায় জেগেছে বৈকি।' ছোট একটা টেবিলের সামনে থামল, সরু চারকোনা একটা বল-পয়েন্ট কলম নিল হাতে। 'ল্যাবরেটরিটায় কী করছেন কার্তেজ লাম্বাডা?'

'আপনি নিজে কেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন না?'

'ইচ্ছে আছে।' কলম দিয়ে কাগজে আঁক কাটছে রানা।

একটা হাত গুরুনিতম্বে, অপর হাত মাথার চুলে চালাল তাপসী। 'আপনি কি টেলিফোন নম্বর রেখে যাবেন?'

রানার মুখে গম্ভীর হাসি। 'কোন প্রয়োজন দেখি না।' কলমটা চোখের সামনে খাড়া করে ধরে তলার দিকটায় চাপ দিল। সাপের জিভের মত বেরিয়ে পড়ল একটা হাইপডারমিক সুই। রানা চোখ-মুখ কোঁচকাল। 'ওহ্, এখন দেখছি প্রয়োজন আছে!' আবার চাপ দিতে রঙবিহীন তরল পদার্থ ফিনকি দিয়ে সিলিং ছুঁতে চাইল। 'আজ রাতে এসবের সংস্পর্শে আসতে চাই না।' তৃতীয়বার চাপ দিতে সুইটা ভিতরে ঢুকে গেল। কলমটা পকেটে রেখে আবার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রানা।

চেহারায় অস্বস্তি, তাপসীর সতর্ক চোখ জোড়া অনুসরণ করছে ওকে। 'খানিকটা শ্যাম্পেন ঢেলে খেতে পারো তুমি,' হঠাৎ বাংলায় বলল সে। 'শরীরে ব্যথা থাকলে আরাম পাবে।'

রানার হাসিটা নির্দয় আর ঠাণ্ডা। 'দেখা যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করছি আমরা।' দেয়ালের ভিতর বসানো ড্রেসিং টেবিলে সাজিয়ে রাখা কসমেটিক্স হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিল ও। ছোট একটা সেন্ট অ্যাটোমাইজার তুলে ঘ্রাণ নিল।

'ভাল্লাগল?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল তাপসী।

আয়নার দিকে তাক করে অ্যাটোমাইজারের মাথায় চাপ দিল রানা। আগুনের একটা শিখা বেরিয়ে এল, ঝাপসা হয়ে গেল ওর প্রতিবিম্ব। কালো হয়ে ওঠা আয়নার কাঁধে ফাটল ধরল, টুকরোগুলো বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার মত খসে পড়ল ড্রেসিং টেবিলে। নাক কোঁচকাল রানা, দু'আঙুলে ধরা অ্যাটোমাইজারটা জায়গামত রেখে দিল। 'একটু বেশি কড়া, তাই না?'

প্রায় কোন বিরতি না নিয়ে তাপসীর হ্যান্ডব্যাগের কাছে চলে এল রানা, সেটা উপুড় করে ভিতরের সমস্ত জিনিস বিছানার উপর খসে পড়তে দিল। সেগুলো থেকে হাতে নিল চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা পকেট ডায়েরী, শিরদাঁড়ায় গোঁজা একটা সরু পেন্সিল। একটা আর্মচেয়ারের দিকে তাক করে চাপ দিল। বর্শার মত সবেগে ছুটে গিয়ে চেয়ারের গদিতে গেঁথে গেল পেন্সিলটা। 'সন্দেহ নেই ডগায় সায়ানাইড মেশানো আছে,' বিড়বিড় করল রানা। এরপর ওর হাতে চলে এল মোটা ফ্রেমের একজোড়া চশমা, জোড়গুলো পরীক্ষা করছে। খুদে একটা টিউব দেখা যাচ্ছে, যে পরবে সে যেদিকে তাকাবে সেদিকে তাক করা। চশমাটা পরল রানা।

মাথা নাড়ল তাপসী। 'ওটা তোমার কোন কাজের জিনিস নয়।'

মুখের সামনে একটা ব্লটার ধরল রানা, তারপর চশমার উপরের অংশে এমন ভঙ্গিতে টোকা দিল যেন কিছু স্মরণ করতে চাইছে। হিস্‌হিস্‌ আওয়াজটা কোন রকমে শোনা গেল। গোলাপ কাঁটার চেয়ে একটু বোধহয় বড়, একটা বর্শা ব্লটারে গেঁথে গেছে। 'হ্যাঁ, আমার আরও কম কাজে লাগবে, তুমি যদি পরে থাকো,' বলল রানা। একটা পাউডার কমপ্যাক্ট-এর তলায় চাপ দিতে বেরিয়ে এল লম্বাটে ব্লেড। 'সঙ্গে এত কিছু রাখো তুমি!'

'কখন কোনটা কাজে লাগে বলা যায় না,' বলল তাপসী। 'নিজেকে রক্ষা করতে হবে তো।'

হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে পাশের একটা বকলসে চাপ দিল রানা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা টেলিস্কোপিক এরিয়াল। দ্বিতীয় বকলসটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, রেডিও ব্যান্ডের সংখ্যা সহ। হাতব্যাগটা আবার বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলল রানা। 'এসব ইকুইপমেন্ট আমার দেখা আছে। অতীতে সিআইএ ব্যবহার করত। আজকাল কারা করে আমার জানা নেই। যদি বলি ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস বা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, তা হলে খাপ খায় না। তুমি বোধহয় নাসারই...'

'হ্যাঁ,' বলে ইঙ্গিতে ছোট্ট বার-এর দিকে রানাকে ডাকল তাপসী। 'ঠিক ধরেছ। আমি নাসার একজন মহাশূন্য বিজ্ঞানী, অ্যাস্ট্রোনট হিসেবে বারকয়েক মহাশূন্য থেকে ঘুরে এসেছি। নাসার বাইরেও অনেক জায়গায় দায়িত্ব পালন করতে যেতে হয় আমাকে, তাই নিজেকে রক্ষা করার একটা ট্রেনিং কোর্স কমপ্লিট করতে হয়েছে। খুদে অস্ত্রগুলো তখনই দেয়া হয়েছে।'

'আমি অবিশ্বাস করছি না।'

'আমরা বোধহয় তথ্য আর সহযোগিতা বিনিময় করতে পারি, কি বলো?' দুটো সরু গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল তাপসী।

গ্লাসটা নিয়ে মুখের সামনে তুলেও রানা চুমুক দিল না, কিনারার উপর দিয়ে তাপসীকে দেখছে। মেয়েটার চেহারায় ও কি আন্তরিকতার অভাব দেখতে পাচ্ছে? 'সেটা নির্ভর করবে তোমার মিশনটা কী জানার পর।'

'কেন, তোমাকে তো আগেই বলেছি। মিস্টার কার্তেজ লাম্বাডার স্পেস

শাটল ফ্যাক্টরিতে কনসালটেন্ট-কাম-অবজারভার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি আমি।' এক পা এগিয়ে এল তাপসী, এখন ইচ্ছে করলে ছুঁতে পারবে রানাকে।

তার লম্বা সিল্ক নাইটড্রেস, লো কাট, ভয়ানক লোভী করে তুলছে রানার চোখ দুটোকে। গ্লাস রেখে দিয়ে দু'হাতে তাপসীর মাথাটা ধরে চুমো খেতে গিয়েও খেল না ও। চোখে এখনও সন্দেহ আর সংশয়।

'তোমার ধারণা আমি কিছু গোপন করে যাচ্ছি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল তাপসী।

কপালে ভুরু তুলে একটা হাসি চাপল রানা। 'জানি না,' শুকনো গলায় বলল ও।

রানার চোখ দুটোকে কামরার চারদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখছে তাপসী। 'তোমাদের কী অফিস আওয়ার বলে কিছু নেই? আজ রাতের মত গোয়েন্দাগিরিটা বাদ দাও না।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, হ্যান্ডব্যাগে জিনিসগুলো এক এক করে ভরছে।

আয়নায় তাকিয়ে ভাঙাচোরা চেহারাটা একবার দেখে নিল রানা। 'বেশ,' বলল ও। 'দিলাম বাদ।'

হঠাৎ করে তাপসী যেন একটা মোহিনী রূপ ধারণ করল। হ্যান্ডব্যাগটা বেডসাইড টেবিলে রেখে দু'হাত মাথায় তুলল সে, বুক চিতিয়ে চুল ঠিকঠাক করছে, তারপর রানার চোখে চোখ রেখে যেন লোভ দেখাবার উদ্দেশ্যে শুজনি অর্থাৎ বিছানার সচিত্র চাদরটা টেনেটুনে নিভাঁজ করল। রানার দিকে হেঁটে আসবার সময় আহত হাতটা দেখে শিউরে উঠল সে। 'দেখতে দাও আমাকে।' এক এক করে আঙুলগুলোর ভাঁজ খুলে তালুর গভীর ক্ষতটা ভাল করে পরীক্ষা করল। 'দেখি বাথরুমে অ্যান্টিসেপটিক কী আছে।'

'রক্ষে যে হাতব্যাগটা দেখতে চাওনি।' হাসল রানা। তাপসীর চুলে নাক ডোবাল। 'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ, তাপসী। আমাদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত।'

মাথা পিছনদিকে হেলিয়ে রানার দিকে তাকাল তাপসী। 'সন্ধি?'

রানা মাথা ঝাঁকাল। 'রাজি। সমঝোতা হবে তো?'

তাপসীর হাসিতে লঘু পরিহাস। 'হওয়া তো উচিত।'

'সহযোগিতা?'

'মাঝে-মধ্যে।'

'বিশ্বাস?'

ঝট করে রানার মুখে মুখ ঠেকাল তাপসী। 'তুমি এত কথা বলো কেন?'

চারঘণ্টা পর। চাদরের তলায় শুয়ে আছে নগ্ন রানা। ওর কাঁধে নাক গুঁজে দিয়ে ঘুমাচ্ছে তাপসী। পরিতৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে রানার বুকে হাত তুলে দিল সে। কব্জির রোলেক্স চোখের সামনে আনল রানা, বোতাম টিপে আলোকিত

ডায়ালে সময় দেখে সিদ্ধান্ত নিল এবার যাওয়ার সময় হয়েছে। তাপসীর হাত আলতো করে উষ্ণ চাদরে নামিয়ে রেখে হড়কে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। তাপসী আরেকটা তৃপ্তিসূচক আওয়াজ করে বালিশে মুখ গুঁজে দিল। হঠাৎ রানা ভাবল কেমন অসহায় দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। চাদরটা টেনে তার কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিল ও। কাপড়চোপড় পরছে, ভাবল–একমাত্র ক্লু যেটা পাওয়া গেছে সেটা ওকে ব্রাজিলে যেতে বলছে। সকাল হতে এখনও পাঁচ ঘণ্টা বাকি। চার্টার করা প্লেনটা ঢাকা থেকে রওনা হয়েছে…তা-ও তো ঘণ্টা চারেক আগে। আশা করা যায় বিকেল চারটের দিকে পৌঁছাবে ওটা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটা কাজ সেরে রাখতে হবে ওকে।

রানার ছেড়ে যাওয়া গরম জায়গাটায় সরে এল তাপসী, দেহ-মনে আনন্দময় অনুভূতি নিয়ে রানার কাপড় পরবার আওয়াজ শুনছে। জুতো জোড়া মশমশ করে উঠল। ক্লিক করে শব্দ করে খুলে গেল দরজা। তারপর আবার বন্ধ হলো। নিঃসাড় আরও কয়েক সেকেন্ড শুয়ে থাকল তাপসী। 'রানা?' কণ্ঠস্বর খসখসে। এক কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলল সে। রানাকে কোথাও ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে মুখ থেকে চুল সরাল, তারপর হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলল। অপেক্ষার সময় নাকে আঙুল ঘষে অস্বস্তি দূর করবার চেষ্টা করছে। তার এই মুহূর্তের শান্ত অথচ দৃঢ় চেহারা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে এক ঘণ্টা আগে এই মেয়েটিই তার জীবনের সবচেয়ে উন্মত্ত, উদ্দাম আর আনন্দঘন শারীরিক মিলনে অংশগ্রহণ করেছে। টেলিফোনের অপরপ্রান্তে ইটালিয়ান নাইট পোর্টার হাজির হলো। 'ইয়েস, সেনিঅরা?'

ঠাণ্ডা আর শুকনো কণ্ঠে কথাটা বলল তাপসী, যেন একজন হেডমিসট্রেস। 'আমার ব্যাগ নেয়ার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দাও–এখনি, প্লিজ।'

সেন্ট মার্ক'স স্কয়্যারে ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। রেনকোটের কলার উপরে তুলে দিয়ে সশ্রদ্ধভঙ্গিতে হাঁটার গতি কমিয়ে আনল রানা, ওর বস্ রাহাত খান আর বসের প্রিয় শিষ্য প্রতিমন্ত্রী কর্নেল ইমরুল কায়েস যাতে একটু সামনে এগিয়ে থাকতে পারেন। ভেনিস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ঠিক চারটের সময় ল্যান্ড করেছে ওঁদের চার্টার করা প্লেন। সরাসরি একটা ফাইভ স্টার হোটেলে উঠেছেন দু'জন। রানা ওঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে গভীর রাতে। মাঝখানের সময়টা নানা রকম প্রস্তুতি নিতে পার হয়ে গেছে।

'মিস্টার রানা, কথাটা আমি আবার আপনাকে বলছি,' ভারী গলায় বললেন প্রতিমন্ত্রী কর্নেল কায়েস। 'আপনাকে কিন্তু নিখুঁত নিরেট প্রমাণ দেখাতে হবে।'

রাহাত খান অনুভব করলেন, প্রিয় এজেন্টের পক্ষ নিয়ে তাঁর কিছু বলা উচিত। 'বৈশাখ', এটা কর্নেল কায়েসের ডাকনাম, 'রানা কখনও অকারণে অ্যালার্ম বাজায় না।'

প্রতিমন্ত্রী এমন একটা শব্দ করলেন, হ্যাঁ কী না বোঝা গেল না। চৌরাস্তার

চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন তিনি। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে সশস্ত্র ক্যারাবিনিয়ার-রা খিলান বা সানশেড লাগানো দরজার নীচে যতটুকু পারা যায় গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে। 'আমি ধরে নিচ্ছি ইটালিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অপারেশনের সমস্ত দিক নিয়ে আলাপ করেছেন আপনি?'

'জ্বী,' বলল রানা, বিরক্ত বোধ করলেও সেটা প্রকাশ করছে না। 'সবগুলো দিকই কাভার করা হয়েছে।'

লিলিথ গ্লাস শপ-এর সামনেটা দৃষ্টিপথে চলে এল। অনেক রাত হয়েছে, আশপাশের সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ, তারপরও ফুটপাত ধরে প্রচুর লোকজন যাওয়া-আসা করছে। কৌতূহলে কেউ কেউ থমকেও দাঁড়াচ্ছে। সশস্ত্র ক্যারাবিনিয়ারি অর্থাৎ পুলিশ কনুই দিয়ে ঠেলে পিছু হটতে বাধ্য করছে তাদের। একজন ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে স্যালুট করল, তারপর রাহাত খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ইটালিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ ফেলিনি মোরাভিয়া-র সঙ্গে। কুশল বিনিময়ের পর রাহাত খান ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রতিমন্ত্রী কর্নেল কায়েসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রানাকে অনেক আগে থেকেই চেনেন মোরাভিয়া, নিঃশব্দে হ্যান্ডশেক করল দু'জন। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলল রানা, তারপর সবাইকে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল দোকানটার ভিতর। গেটে পাহারায় থাকল সাদা পোশাক পরা দু'জন বিসিআই এজেন্ট, বিসিআই চিফ আর প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকা থেকে এসেছে ওরা।

দোকানের সে-ই সুন্দরী সেলসগার্ল মেয়েটি, প্রথমবারে রানাকে যে স্বাগত জানিয়েছিল, হঠাৎ খেপে উঠে সামনের দিকে ছুটে আসবার চেষ্টা করল, মুখ থেকে ইটালিয়ান তুবড়ি ছুটছে। রানার ইঙ্গিত পেয়ে একজন পুলিশ টেনে একপাশে সরিয়ে নিল তাকে, তারপরও সে চুপ করছে না।

কর্নেল কায়েসকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছে। 'আশা করি সত্যি আপনি জানেন কী ঘটতে চলেছে, মিস্টার রানা। অনেক দিন পরপর দেখা হয় বটে, কিন্তু কার্তেজ লাম্বাডাকে বহু বছর ধরে চিনি আমি। বয়েসের পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের ভাল বন্ধু আমরা। এক সঙ্গে ব্রিজ খেলি, আবার ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক সম্পর্কও আছে। তারচেয়েও বড় কথা, আমার জানামতে উনি বাংলাদেশের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী...'

'কীরকম?' জানতে চাইল রানা।

'কার্তেজ লাম্বাডা প্রায়ই আমাকে বলেন, তাঁর পুঁজির বড় একটা অংশ তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চান।'

রানা কিছু বলছে না। সবাইকে নিয়ে উঠানে বেরুচ্ছে ও।

'পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি তিনি,' বলে যাচ্ছেন প্রতিমন্ত্রী কর্নেল কায়েস। 'হোয়াইট হাউসও তাঁকে সমীহ করে চলে...'

ভারী লোহার গেটের বাইরে একটা পুলিশ লঞ্চের বো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি মাথায় দু'জন ক্যারাবিনিয়ারি দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে বাগিয়ে ধরা কারবাইন। রানা সাহায্য চাওয়ার পর এমন দ্রুত গতি আর দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

নিয়েছে ইটালিয়ান পুলিশ, কোন অভিযোগ করবার অবকাশ রাখেনি। সেই ভোর থেকে, রাহাত খান আর প্রতিমন্ত্রী কর্নেল কায়েস তখনও ইটালিতে এসে পৌঁছাননি, লিলিথ গ্লাস শপ আর কারখানা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে তারা। একটা ঢোক গিলল রানা। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আর মাত্র কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে ব্যাখ্যা করবার অযোগ্য অশুভ কিছুর অবশেষ। ল্যাবরেটরির ভিতরটা আরেকবার না দেখতে হলেই খুশি হত ও।

সিঁড়ির মাথায় দু'জন ক্যারাবিনিয়ারির সঙ্গে সিভিল ড্রেস পরা একজন লোক রয়েছে, হাতে ক্যানভাসের একটা ব্যাগ। একা শুধু রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে, তারপর করিডর বরাবর পথ দেখাল ওদেরকে। ইস্পাতের দরজার সামনে থামল সে।

'এখানে?' জানতে চাইলেন প্রতিমন্ত্রী।

'জ্বী,' বলল রানা। ক্যানভাস ব্যাগটা নিয়ে ভিতর থেকে চারটে গ্যাস মাস্ক বের করল। ওর আঙুল থেকে অক্টোপাসের মত ঝুলছে ওগুলো।

কর্নেল কায়েসকে হতভম্ব দেখাল। 'গ্যাস মাস্ক?' কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস। 'মিস্টার রানা, আপনার কি...'

'আমি মনে করি কোন রকম ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।' রানার কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ দৃঢ়। রাহাত খান কিছু বললেন না, তবে হাত বাড়িয়ে একটা মাস্ক নিলেন। অসহায় একটা ভঙ্গি করে গুরুকে অনুকরণ করলেন প্রতিমন্ত্রীও। আইআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ মোরাভিয়া আগেই একটা মাস্ক নিয়ে পরে ফেলেছেন। করিডর ধরে সিঁড়ির মাথায় ফিরে গেল দু'জন ক্যারাবিনিয়ারি সিভিল ড্রেসের পিছু নিয়ে।

সবার শেষে মাস্ক পরল রানা। দরজার কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে এগোল ও। হাত তুলবার সময় বুকে কীসের একটা ঢেউ অনুভব করল। বোতামগুলোয় চাপ দিল। ফাইভ-ফাইভ-ওয়ান-থ্রী-ওয়ান। কিছুই ঘটল না। প্রতিটি বোতামে সংখ্যা লেখা রয়েছে, সাবধানে দেখে নিয়ে চাপ দিল আবার। কিন্তু ফলাফল সেই একই, দরজা খুলছে না। রানা খেয়াল করল ওর পাশে দাঁড়ানো প্রতিমন্ত্রী কর্নেল কায়েস মাস্কের ভিতর থেকে রাহাত খানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। দরজার দিকে ফিরল রানা, সঙ্গে সঙ্গে বিষম এক ধাক্কা। কবাট বলতে ছিল দাগবিহীন মসৃণ মেটাল, তাতে কোন হাতল ছিল না। এখন রয়েছে। ধাক্কাটা সামলে নিলেও, অস্বস্তি দূর হচ্ছে না। ধৈর্য হারাচ্ছেন বোঝাবার জন্য খুক-খুক করে বারকয়েক কাশলেন কর্নেল। হাতলটা ধরে ধীরে ধীরে মোচড়াল রানা, অনুভব করল দরজা খুলে যাচ্ছে। কবাট ঠেলে কামরার ভিতর পা রাখল, সেই সঙ্গে খেতে হলো বিস্ময়ের আরেকটা ধাক্কা। এটা চরম।

আউটার অফিস গায়েব হয়ে গেছে। ল্যাবরেটরি? কীসের ল্যাবরেটরি, কোথায়! ওগুলোর বদলে লম্বা আকৃতির একটা ভল্টেড চেম্বার দেখা যাচ্ছে, দেয়ালে দেয়ালে রেনেসাঁ যুগের পেইন্টিং আর ফ্রান্স থেকে আমদানি করা ট্যাপিস্ট্রি ঝুলছে। খানিক পর পর একটা করে মেহগনি কাঠের বুককেস। হীরক আকৃতির

জানালাগুলো সিলিঙের কাছাকাছি, প্রতিটি শার্শি রঙিন। প্রকাণ্ড আকারের দুটো ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি ঝুলছে সিলিং থেকে। ওগুলোর উজ্জ্বল আলোয় বিশাল চেম্বারের অ্যান্টিক ফার্নিচারগুলো উদ্ভাসিত হয়ে আছে। এরকম একটা ফার্নিচার থেকেই পরিচিত মূর্তিটা সিধে হলো।

প্রথমে তাঁকে বিশ্বকবি বলে মনে হলো, তারপর ভুলটা ভাঙতে চেনা গেল কার্তেজ লাম্বাডাকে। আজ দ্বিতীয়বার দেখে কবি গুরুর সঙ্গে মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশি নজরে পড়ল রানার। এই লোকের মাথায় চুল অনেক বেশি। এর নাক অত খাড়া নয়। বয়সের তুলনায় এর রিফ্লেক্স আর শক্তি অবিশ্বাস্য। তবে কি এটা তার ছদ্মবেশ? আচ্ছা, লোকটা কবীর চৌধুরী নয় তো? কবীর চৌধুরী···নাহ্, অসম্ভব! সে ছদ্মবেশের রাজা বটে, কিন্তু ছদ্মবেশের আড়ালে এত প্রাণশক্তি পাবে কোথায়? সঠিক বয়েস জানা নেই, তবে কবীর চৌধুরী অনেক আগেই ষাট পেরিয়েছে। তা ছাড়া, এই লোককে হাঁটতে দেখেছে রানা, কবীর চৌধুরীর মত খোঁড়ায় না। তার তো মাথার খুলি আর ঘাড়ে ইস্পাতের পাতও লাগানো আছে, ফলে নড়াচড়ার সময় আড়ষ্ট দেখায়–এর মধ্যে কোন রকম আড়ষ্টতা নেই।

অ্যান্টিক সোফা ছেড়ে সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে এল কার্তেজ লাম্বাডা, আগন্তুকদের সকৌতুকে দেখছে, হাসিটায় বিদ্রূপের সামান্য মিশেল। 'কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! প্রিয় বন্ধু কর্নেল ইমরুল না? হোয়াট আ সারপ্রাইজ!' কর্নেল কায়েস টান দিয়ে গ্যাস মাস্ক খুলে ফেলছেন, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় ছুটে এল কার্তেজ লাম্বাডা। 'সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্মানীয় মেহমান, তাঁরাও সবাই দেখছি গ্যাস মাস্ক পরে আছেন। কী ব্যাপার বলুন দেখি?' তার হাসি সবাইকে বিব্রত করছে। 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে হাসির কিছু আছে!'

রানা অনুভব করল কথাগুলো ওকে চাবুকের মত আঘাত করছে। ভয়ানক ধূর্ত এক লোকের বিরুদ্ধে লাগতে এসেছে ও। সাবধান, এই লোককে ভুলেও খাটো করে দেখো না।

কর্নেল কায়েস শুধু বিব্রত নন, রাগে লাল হয়ে উঠেছে তাঁর চেহারা। রানার দিক থেকে অগ্নিদৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কার্তেজ লাম্বাডার বাড়িয়ে দেওয়া হাতের ভিতর সেঁধিয়ে গেলেন। দু'জন এখন আলিঙ্গনে আবদ্ধ। 'এভাবে অনুপ্রবেশ করতে হওয়ায় ভীষণ, ভীষণ দুঃখিত। আমি নিশ্চিত, আমাদের কমিউনিকেশন লাইন ঠিক সময়ে ক্রস হয়ে গিয়েছিল।' আর কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে সাহায্যের জন্য রাহাত খানের দিকে তাকালেন কর্নেল।

'সেনর লাম্বাডা,' মোরাভিয়া বললেন, 'ওঁরা বাংলদেশ থেকে একটা ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করার কাজে ভেনিসে এসেছেন। ওঁদের মত আপনিও একজন বিদেশী, তাই আমরা নাক না গলিয়ে চাইছি আপনারা নিজেরা কথা বলে যদি কোন ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার থাকে তো মিটিয়ে নিন, প্লিজ।'

'গুড মর্নিং, মিস্টার লাম্বাডা,' রাহাত খান বললেন, বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি জোরে। 'কথাটা সরাসরিই জিজ্ঞেস

করি। ছিলেন দাঁড়কাক, কোকিল হওয়ার শখ হলো কবে থেকে?' বাংলায় কথা বলছেন তিনি।

'দাঁড়কাক? হোয়াট ডু ইউ মীন, সার?' লাম্বাডাকে একটু নার্ভাস দেখাল।

'বাদ দিন। এখানে আপনার কোন ল্যাবরেটরি নেই?'

'ল্যাবরেটরি?' লাম্বাডার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়। 'না। ওঅর্কশপ আছে, কিন্তু ল্যাবরেটরি বলা যায় এমন কিছু তো নেই। কাঁচের জিনিস তৈরি করার পদ্ধতি কয়েকশো বছর হলো এদিকে বদলায়নি।'

'কোন অ্যাক্সিডেন্টও ঘটেনি?' রানার কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা। 'যে-ধরনের অ্যাক্সিডেন্টে ফিলিপা রোঁনা মারা গেল?'

লাম্বাডার চোখে দুটো লাল বিন্দু ফুটল, সেগুলো আভাও ছড়াল, তবে মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য। 'একটা ইনসিডেন্ট বটে, তবে কোনমতেই অ্যাক্সিডেন্ট নয়। কাল রাতে কেউ একজন সিঁধ কেটে ওঅর্কশপে ঢুকেছিল। আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, কোইচি, সম্ভবত মিউজিয়ামে তাকে চ্যালেঞ্জ করে–চোর যখন, ওখানেই তো যাওয়ার কথা। ঠিক কী ঘটেছে বুঝতে পারছি না, তবে কোইচি খুন হয়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাতে গিয়েও নিজেকে শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন কর্নেল কায়েস। 'কী ভয়ানক! সবার তরফ থেকে শোক আর সহানুভূতি জানাই আপনাকে।'

'ধন্যবাদ,' বলল লাম্বাডা। 'আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা এই ক্রাইমটা ইনভেস্টিগেট করতে আসেননি।'

'সরাসরি নয়,' বললেন রাহাত খান। 'তবে ঘটনাগুলো সম্ভবত একই সুতোয় বাঁধা।'

'সেটা কখনোই অসম্ভব নয়,' বলল লাম্বাডা। রানার দিকে তাকাল সে। দৃষ্টিতে আর যাই থাক, শুভেচ্ছা নেই। 'আশা করি তদন্ত কত দূর এগোল আমাকে জানাবেন।'

'আপনি শান্তিতে থাকুন, আপাতত আমরা বিদায় নিই,' বললেন রাহাত খান। গম্ভীর ভঙ্গিতে লাম্বাডার উদ্দেশে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দরজার দিকে এগোলেন, দু'কদম পিছিয়ে থেকে তাঁকে অনুসরণ করছেন কর্নেল কায়েস।

চৌরাস্তায় পরিস্থিতিটা বদলে গেল। পথিক আর পুলিশদের কাছ থেকে দূরে সরে এসেই বিক্ষোভে প্রায় ফেটে পড়লেন কর্নেল। রানাকে অগ্রাহ্য করে একা শুধু রাহাত খানের উদ্দেশে কথা বলছেন তিনি। 'ওটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অপমান, সার।' আবেগের লাগাম টানতে ব্যর্থ হওয়ায় সারা শরীর কাঁপছে তাঁর। 'মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আপনাকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, এই কেসে বিসিআই-এর শ্রেষ্ঠ এজেন্টকে মাঠে নামান। কিন্তু এ আপনি কাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, সার? এ তো বদ্ধ উন্মাদ! দেখা যাচ্ছে একটা ক্রাইমের তদন্ত করতে এসে নিজেই আরেকটা ক্রাইম করে বসেছে–একজন মানুষকে মেরে ফেলেছে

শুধু তাই নয়, দেশ থেকে ডেকে এনেছে আমরাও যাতে তাকে সহায়তা করার অপরাধে অপরাধী হই। সার, বেয়াদপি মাপ করবেন, এই লোককে এখনি আপনি বরখাস্ত করুন।'

রাহাত খান ফুটপাতের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কর্নেলের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, যেন চেনেন না। 'তুমি এত বোকা, এ আমার জানা ছিল না, বৈশাখ। কী করে বোঝাই যে তুমি স্রেফ প্রলাপ বকছ!'

'আপনি সার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাচ্ছেন,' অভিযোগ করলেন প্রতিমন্ত্রী, আবেগের রশি টেনে অস্ত্র হিসেবে যুক্তি ব্যবহার করতে প্রস্তুত। 'আপনার এজেন্ট যে সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছে, এতে কোন সন্দেহ আছে আপনার?'

'একটা জিনিস তুমি ঠিক ধরেছ,' রাহাত খান বললেন। 'প্রসঙ্গটা সত্যি আমি এড়িয়ে যেতে চাই। একটাই কারণ, এটা তোমার বিষয় নয়, তাই তুমি বুঝবে না। রানা সব গুলিয়ে ফেলেছে, নাকি প্রতিপক্ষ ওকে ঘোল খাইয়েছে, সেটা আমরা পরে দেখব। আর কী যেন বলছিলে তুমি? রানাকে বরখাস্ত করব?'

'জ্বী, সার। এটা আপনার কাছে আমার আবেদন...'

'কিন্তু ওকে বরখাস্ত করলে বিসিআই-এর সব কাজই যে বন্ধ হয়ে যাবে, বৈশাখ।' রাহাত খানকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'কি বললেন...সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে...'

'হ্যাঁ,' প্রতিমন্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন রাহাত খান, চেহারা থমথম করছে। 'সত্যি কথা বলতে কী–যদিও ওর সামনে বলাটা ঠিক হচ্ছে না–ওকে বিদায় করলে ওর সহকর্মীদের একজনকেও আর ধরে রাখা যাবে না। তখন একা আমি আর থেকে কী করব, আমিও চলে যাব একদিকে।'

'এ আপনি কী বলছেন, সার...'

'ঠিকই বলছি। যা বলেছ বলেছ, এবার ওকে একটু সাধাসাধি করে দেখো রাখা যায় কি না। এটা আমরা কখনও ভুলি না, তোমাদেরও ভোলা উচিত নয়–মাসুদ রানা একজনই, বৈশাখ।'

'সেক্ষেত্রে না বলে উপায় কী যে আমি দুঃখিত। মিস্টার রানা, আমি আমার বক্তব্য এখনই প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফুটপাত থেকে চওড়া রাস্তায় নামলেন কর্নেল কায়েস, দ্রুত হেঁটে পায়রার প্রকাণ্ড একটা মেঘ ওড়ালেন।

তাঁর গমনপথের দিকে ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান, তারপর একটু পিছিয়ে রানার পাশে চলে এলেন। পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ভরছেন। 'কি ঘটছে বলো তো, রানা? ওরা কি তোমার খাবারে ড্রাগ মেশাচ্ছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, সার। ল্যাবরেটরি সত্যি একটা ছিল ওখানে। আসল কথা হলো, কার্তেজ লাম্বাডা মহা ধুরন্ধর একজন অপারেটর।'

রাহাত খানের চোখে সন্দেহ। 'তা তো তাকে হতেই হবে, তা না হলে মাত্র

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গোটা একটা স্ট্রাকচার কীভাবে সরিয়ে ফেলে। লোকটার চেহারা সন্দেহজনক, রানা। ওটা ওর চেহারা হতে পারে না। ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। কবীর চৌধুরী কি না জানি না, তবে রাজাকারও হতে পারে।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা হাত বের করল রানা। 'এটা কিন্তু সরাতে পারেনি, সার।' কাঁচের ফায়ালটা রাহাত খানের হাতে সাবধানে ধরিয়ে দিল ও। 'এই জিনিসই ডিস্টিলিং করছিল ওরা। আমি আমার এজেন্সির লন্ডন শাখাকে দিয়ে এটা অ্যানালাইজ করাতে চাই। তবে দয়া করে বলে দেবেন যেন চরম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। দু'জন মানুষকে খুন করেছে এটা।'

'এরপর কী, রানা?' ফায়ালটা ভাল করে মুঠোয় ভরলেন রাহাত খান।

'আমি একবার ব্রাজিলে যেতে চাই, সার।'

মাথা ঝাঁকালেন বিসিআই চিফ। 'ও, হ্যাঁ। মনে পড়ছে, এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় রিয়ো ডি জেনেরোর কথা বলছিলে।' হঠাৎ প্রায় কর্কশ হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'ভেরি গুড। তাই যাও। কিন্তু আর কোন ভুল-ভাল নয়, এমআরনাইন।'

'ইয়েস, সার।'

লিলিথ গ্লাস শপের দোতলা থেকে রাহাত খান আর রানাকে চৌরাস্তা পেরুতে দেখল কার্তেজ লাম্বাডা ওরফে কবীর চৌধুরী। হিউম্যান সেল আর মেমব্রেন-এর সাহায্যে ল্যাবে তৈরি তার মুখ বা মুখোশে বিজয়ীর হাসি ফুটল। জানালার সামনে থেকে সরে টেলিফোনের কাছে এসে দাঁড়াল, চেহারায় কর্তৃত্বসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে চাপ দিল তেরোটা বোতামে।

দুনিয়ার প্রথম সারির বিজ্ঞানীরা যখন তর্ক করছেন হিউম্যান ক্লোনিং উচিত কি না, পাগল বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরী তখন নিজের ল্যাবরেটরিতে সাফল্যের সঙ্গে শয়ে শয়ে তৈরি করছে মানবদেহের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ওই একই পদ্ধতিতে মানুষের হুবহু চেহারা বিশিষ্ট মুখোশও তৈরি করেছে সে। ওটা কমপিউটরে অপারেট করা যায়। কমপিউটর নির্দেশ পায় কনট্যাক্ট লেন্সে বসানো সেনসর আর ব্রেনওয়েভ থেকে—বুঝে নেয় কখন কেমন করতে হবে মুখভঙ্গি, কখন হাসতে বা কাঁদতে হবে। তার ঘাড়ের ভাঙা হাড় সরিয়ে নতুন হাড় বসানো হয়েছে। বদলে ফেলা হয়েছে নষ্ট পা-টাও।

অপরপ্রান্তে কেউ রিসিভার তুলল। 'সার, খবর সব ভাল তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব ভাল। চিন্তার আর কোন কারণ নেই। সব আমি সামলে নিয়েছি। ছোট্ট একটা সংকট সহজেই এড়ানো গেছে।' তার কথা বলবার ধরনে হঠাৎ জরুরী ভাব ফুটল। 'তবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: এখন থেকে প্রতিটি চালান ঘুরপথে পাঠাতে হবে। আর শোনো, তোমার ওখানে হয়তো ভিজিটর যাবে। গোলমেলে ভিজিটর। বিবেকের কোন রকম দংশন অনুভব না করে তাদের ব্যবস্থা করবে।' অপরপ্রান্ত সাগ্রহে রাজি হলো। 'আরও একটা ব্যাপার, কোইচির

জায়গায় অন্য লোক দরকার আমার।...কাকে পেয়েছ শুনি?' কিছুক্ষণ শুনল কবীর চৌধুরী, তারপর সন্তুষ্টচিত্তে হাসল। 'বাহ্, চমৎকার! শুনে ভাল লাগছে! ওকে যদি আনতে পারো, তোমাকে অবশ্যই আমি পুরস্কৃত করব।' তার কানে আরও খানিকটা আশ্বাস বর্ষণ করা হলো। 'তাই? পরবর্তী ফ্লাইটে আসছে সে? দারুণ, সত্যি দারুণ!'

অপরপ্রান্ত থেকে থ্যাঙ্ক ইউ শুনে রিসিভার নামিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন সব কাজ গুছিয়ে নিতে পেরেছে সে, এটুকু সারতে অনেকের সারাজীবন লেগে যায়। এখন সে আর তার দুনিয়া। সে এবং তার ভবিষ্যৎ দুনিয়া। তার সেই দুনিয়ায় সবাই রাজা। সবাই মহামানব।

এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ভবনে লাউডস্পীকারের মাধ্যমে পরবর্তী ফ্লাইট ঘোষণা করা হচ্ছে। কাস্টমস্ শেডে সেই আওয়াজটাকে ছাপিয়ে উঠল কর্কশ ইলেকট্রনিক ধ্বনি। চমকে উঠে ছোট্ট একটা লাফ দিল গার্ড। দৈত্যাকার লোকটা ইলেকট্রনিক খিলান প্রায় পুরোপুরি ভরাট করে দাঁড়িয়ে আছে–কাঁধ দুটো দু'পাশের দেয়াল ছুঁইছুঁই করছে, মাথাটা নিচু করা। দ্রুত সার্চ করে এমন কিছু পাওয়া গেল না যে মেটাল ডিটেক্টর রিয়্যাক্ট করবে, অথচ গা রিরি করা ইলেক্ট্রনিক আর্তনাদ থামছে না। আরেকজন সিকিউরিটি গার্ড ছুটে এল। লোকজনও ভিড় করছে। তারপর, এতক্ষণে, লোকটার মুখ পাকা কাঁঠালের মত ভেঙে গেল–অর্থাৎ হাসছে সে, আর হাসির ছলে চোখ ধাঁধানো দ্যুতিসহ নিজের দাঁত দেখাচ্ছে।

দু'সারি চকচকে, এবড়োখেবড়ো ইস্পাতের দাঁত।

অ্যালার্ম আরও জোরে বাজছে এখন। রিয়ো ডি জেনেরোর ফ্লাইট ঘোষণা করা হচ্ছে, কিন্তু কাস্টমস শেডে ওরা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

নয়

বোতামে চাপ দিয়ে রোলসরয়েসের জানালা খুলে বাইরে তাকাল রানা। ওর ডান দিকে কোপাকাবানা সৈকত, ট্যুরিস্টদের জন্য রিয়ো ডি জেনেরো-র সবচেয়ে উত্তেজনাকর স্পট। মানুষের যত রকম গায়ের রঙ হতে পারে, তার সবই এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। মাইলের পর মাইল বালুকাবেলায় সূর্য আর সমুদ্র স্নানের জন্য আসা লোকজন গিজ গিজ করছে, তারই ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ফুটবল আর ভলিবল খেলবার মাঠ, ম্যাসাজ পারলার, বিভিন্ন দেশের নাম নিয়ে ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরাঁ। সারা দুনিয়া থেকে সেরা সুন্দরীরা আসে এখানে; তবে পুরুষদের জন্য সবচেয়ে বড় আকর্ষণ টপলেস ইউরোপিয়ান তরুণীরা। সৈকতের পর হাইওয়ে, হাইওয়ের ওপারে–রানার বাম দিকে–কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন

মানের বহুতল হোটেল আর অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক। এগুলোর পিছনে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে আড়াই হাজার মাইল চওড়া বনভূমিকে।

ভেনিস থেকে প্যারিস হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার এই উপকূলে পৌঁছেছে রানা, ওর বাহন ছিল কনকর্ড, সময় লেগেছে মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। প্যারিসের কুয়াশার ভিতর গাড়ির হেডলাইট নিষ্প্রভ দেখায়, লোকজন হাঁটাচলা করে নিজেদের ফেলা নিঃশ্বাসের তৈরি মেঘের ভিতর। এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ, পরিচ্ছন্ন বাতাসে ফুলের সুবাস মিশে আছে, নির্মল আলোয় আছে স্বচ্ছতা।

যানবাহনের মিছিল চলতে চলতে প্রায়ই দাঁড়িয়ে পড়ছে, তারপর ধীর গতিতে এগোচ্ছে আবার। রোলসরয়েসের সামনে দিয়ে এক কিশোর তার দিকভ্রান্ত ফুটবলের পিছু নিয়ে ছুটে গেল। রাস্তার দু'পাশ দখল করে নিয়েছে হকার আর রেস্তোরাঁ মালিকরা। চারদিক লোকে লোকারণ্য–মানুষ খেতে খেতে হাঁটছে, হাঁটতে হাঁটতে খাচ্ছে। ঘাম আর তাজা কফির গন্ধ ঢুকল রানার নাকে।

আবার সচল হলো ট্র্যাফিক। শত মিশনের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া সতর্কতা ওকে একবার পিছনটা দেখে নেওয়ার তাগাদা দিল। একটা ফেরারি ডিনো যানবাহনের ভিতর দিয়ে এমন জোরে ছুটে আসছে, যেন দুর্ঘটনা ঘটানোই ওটার উদ্দেশ্য। রোড ডিভাইডার-এর উপর চড়াও হতে যাচ্ছিল, যেভাবে কাত হচ্ছে মনে হলো উল্টে যাবে। কিন্তু না, দু'চাকার উপর কাত হয়ে থেকেই আতঙ্কিত কয়েকজন ড্রাইভারকে পাশ কাটাল ফেরারি, সিধে হলো তিনটে গাড়ির পিছনে ফাঁকা জায়গায়। অন্তত বিশ-পঁচিশটা গাড়ির ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রানা। 'ডান দিকে ঘোরো।'

রিয়ারভিউ-মিররে তাকাতে ড্রাইভারের ভুরু উঁচু হতে দেখল রানা। 'ইয়েস, সেনর।'

হর্ন বাজিয়ে, বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে রোলসরয়েসকে যেন সামনের গাড়িগুলোর পিছনে লেলিয়ে দিল ড্রাইভার। প্রকাণ্ড গাড়ি, প্রয়োজনীয় জায়গা করে নিয়ে এগোনো খুব কঠিন। সেই কঠিন কাজ নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে সারছে লোকটা একটা মাত্র অস্ত্র দিয়ে–চড়াও হওয়ার হুমকি। রিয়ার ভিউ-মিররে দৈত্যটাকে দেখা মাত্র ঘাড় বাঁচাবার তাগিদে যে যতটুকু পারল সরে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। আরও অনেক হর্নই বাজছে, তবে ফেরারির হর্নটাই সবচেয়ে কর্কশ, পিছুও ছাড়ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

দেখতে বেশ ভাল মেয়েটা, তবে চোখ-মুখের দৃঢ় ভাব জেদ না আক্রোশ বলা মুশকিল। সামনের দিকে ঝুঁকে, হুইলের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে সে। রানাও ঝুঁকল, ড্রাইভারের কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'মেয়েটাকে খসাও।' নিজেকে শক্ত করবারও সময় পায়নি ও, গাড়ির চাকাগুলো হড়কে একজোড়া অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের মাঝখানে প্রাইভেট ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল, কাত হয়ে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজকে পাশ কাটাচ্ছে। রোলসকে সরাসরি ছুটে আসতে

দেখে একটা ফ্যামিলি সেলুনের ড্রাইভার শেষবারের মত ঈশ্বরকে স্মরণ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে–কিন্তু চোখ খুলে দেখল রোলস কীভাবে যেন বদলে ফেরারি হয়ে গেছে। অকস্মাৎ ব্রেক কষার কর্কশ আওয়াজ হলো। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য সেলুনের ড্রাইভার ডান দিকে বাঁক নিয়ে সরু একটা রাস্তায় ঢুকতে চেষ্টা করল, ফেরারির মেয়েটাও বাঁক নিল বাম দিকে। অর্থাৎ একই স্ট্রীটে ঢুকল গাড়ি দুটো, তবে ভাগ্য ভাল যে একসঙ্গে নয়, সেলুনের পিছু নিয়ে ফেরারি।

রোলসের সামনে একটা চৌরাস্তা পড়ল। ডান দিক থেকে ঢাল বেয়ে একটা ট্রাম নেমে আসছে। ট্রামের পিছনের প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের জায়গা নেই, মৌচাকে ঝুলে থাকা মৌমাছির মত দু'পাশেও প্রচুর লোকজন দেখা যাচ্ছে। পিছনে তাকিয়ে আবার ফেরারিকে দেখতে পেল রানা। ড্রাইভারকে নতুন নির্দেশ দিল ও। রোলস ট্রাম লাইন পার হলো; তারপর ক্রমশ উঁচু রাস্তা ধরে ছুটল, যেদিক থেকে নেমে এসেছে ট্রামটা।

যাত্রী বোঝাই ট্রাম মুহূর্তের জন্য সামনের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ায় হড়কানো চাকা নিয়ে থামতে বাধ্য হলো ফেরারি। তারপর আবার সগর্জনে পিছু নিল রোলসের।

মাঝবয়েসী লোকটা দাড়ি কামায়নি এক হপ্তা। ট্রামের গায়ে সে যেমন ঝুলছে, হাঁটু পর্যন্ত ছেঁড়া তার ট্রাউজারও কোমর থেকে কোন রকমে ঝুলে আছে। ফেরারিটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল সে, তারপর সবিস্ময়ে ভাবল: লাইটওয়েট ট্রপিক্যাল সুট পরা একজন বিদেশী ভদ্রলোক তার পাশে জায়গা পাওয়ার জন্য একটা রোলসরয়েস থেকে লাফ দেবেন কেন? সামাজিকতা রক্ষা করতে ঠোঁটজোড়া সামান্য প্রসারিত করল রানা, তবে মুখ খুলল না।

সতেরোশো আটচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক কোপাকাবানা সমুদ্রসৈকতের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশের ভবনগুলোর চেয়ে একটু বোধহয় বেশি উঁচু। পটে বেড়ে ওঠা দুর্লভ ক্যাকটাসগুলোকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠে এল রানা। নীচের একটা কাউন্টার থেকে পাওয়া প্ল্যাটিনাম কী ঢোকাল ওর নাম লেখা এন্ট্রান্স স্লট-এ। কাঁচের দরজা অনুগত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে খুলে গেল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা হিম হল-এ পা রাখল রানা। চোখ দুটো আধো-অন্ধকার সয়ে নিতে একটু সময় নিচ্ছে, আর এরই মধ্যে সুটে ঢাকা বেশ বড়সড় একটা বপু নিয়ে সামনে হাজির হলো এক লোক।

'মিস্টার রানা? আমরা আপনার আসবার অপেক্ষায় ছিলাম।' তার দৃষ্টি রানাকে ছাড়িয়ে কাঁচের দরজার দিকে ছুটে গেল। 'আপনার লাগেজ?'

'আসছে।' হাসি-হাসি মুখ করল রানা। 'আবহাওয়া এত ভাল লাগল যে ভাবলাম হাঁটি।'

'জ্বী, ভাল করেছেন।' বোঝাই যায় যে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করবার নীতি মেনে চলা হয় এখানে। আমার নাম পাবলো পামকিনো, রিয়ো ইন্টারন্যাশন্যালের তিন নম্বর ম্যানেজার। আপনার যে-কোন চাহিদা পূরণ করবার

সুযোগ পেলে আনন্দ পাব আমরা।'

ধন্যবাদ জবাব হিসেবে খুব ছোট শোনালেও আর কিছু বলল না রানা। পাবলো পামকিনোর পিছু নিয়ে ছোটখাট একটা হলরুম আকৃতির এলিভেটরে চড়ল ও। বন্ধ হওয়ার একটু পরই আবার খুলে গেল দরজা, ফাইভ স্টার রিয়ো ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় ম্যানেজার জানাল, ভবনের টপ ফ্লোর অর্থাৎ একুশতলায় রয়েছে তারা। মেহগনি কাঠের পালিশ করা মেঝে, পথ দেখাচ্ছে লোকটা। সশ্রদ্ধভঙ্গিতে রানার আঙুলের ফাঁকে ধরা চাবিটা বের করে নিল সে।

'প্রতিটি লক রিপ্রোগ্রাম করা হয়েছে, মিসটার রানা, ওগুলো যাতে আপনার ব্যক্তিগত চাবি রিসিভ করতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, দেখল প্ল্যাটিনামের সরু ফালিটা একটা দরজার কী হোলে ঢুকে যাচ্ছে; কবাট দুটো এত বড় যে দু'পাশে দু'ফুট করে ফাঁক রেখে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো ঢোকানো যাবে। চেহারায় ব্যাকুল একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে দরজাটা খুলে একটা হাত যত দূর পারা যায় প্রসারিত করল পামকিনো। পেন্টহাউস স্যুইটটা যেন ঠিক আফ্রিকান উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছে থেমে গেছে।

'দ্য প্রেসিডেন্ট'স স্যুইট!'

চারপাশে চোখ বুলাল রানা। 'আপনাদের প্রেসিডেন্ট বোধহয় অনেক।'

মন্তব্যটা শুনে বোবা হয়ে গেল তৃতীয় ম্যানেজার, ইতস্তত করছে।

চাবিটা চেয়ে নিয়ে হতচকিত ম্যানেজারের কনুই ধরল রানা, দরজার দিকে হাঁটিয়ে আনছে। আমাকে কিছু দেখাবার দরকার নেই। হারিয়ে গেলে একটা ক্যাব ডেকে নেব।' অমায়িক হাসি হেসে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

প্রথমবার দেখে যত বড় বলে মনে হয়েছিল স্যুইটটা আসলে তত বড় নয়, তবে তারপরও লিভিং রুমটা আকারে একটা হোটেল লাউঞ্জের মত। সেভাবে সাজানোও হয়েছে। এদিকে পিলার তো ওদিকে খিলান, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলা হয়েছে নিচু ফার্নিচার। পটের লম্বা চারা ছাদেও যেন রঙিন সাপের মত চরে বেড়াচ্ছে। ছাদে যত না প্লাস্টার তারচেয়ে বেশি কাঁচ। অলস পায়ে টেরেসের দিকে হেঁটে এল রানা। চোখের সামনে আকর্ষণীয় একটা দৃশ্য উন্মোচিত হলো। প্রথমেই চোখে পড়ল ছবির মত পড়ে থাকা গোটা রিয়ো শহর, সুগার লোফ আর ইমপেলামা পাহাড়চূড়ার মাঝখানে বিস্তৃত। তারপর, একেবারে কাছে, অলিম্পিক সাইজ সুইমিং পুল। যেটা সম্ভব নয় অথচ বাস্তব, পানিতে একজন সাঁতার কাটছে।

মেয়েটার রঙ দুধে-আলতা, সাঁতরাচ্ছে অলস ভঙ্গিতে, স্বচ্ছ পানিতে কালো মেঘের মত ভাসছে রাশি রাশি চুল। নগ্ন পিঠ। নিতম্বে হালকা নীল তেকোনা আচ্ছাদন। পানি থেকে সিধে হওয়ার সময় মেয়েটার শোল্ডার ম্যাসলে ঢেউ উঠতে দেখল রানা। তারপর ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। পুলের কিনারায় বসে চুল থেকে পানি ঝরাচ্ছে, নগ্ন বুক সম্পর্কে যেন সচেতন নয়। সময় নিয়ে হাত লম্বা করল সে, একটা বিকিনি টপ পরল, ঠিক পুরুষরা যেভাবে শোল্ডার হোলস্টার পরে।

টপ-এর হুক আটকে সিধে হলো। পুল ঘুরে এগোতে শুরু করেছে রানা। মেয়েটা ওর দিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে—ও যেন একটা ডাকপিয়ন।

'স্যুইটের সঙ্গে তোমাকেও পেলাম বুঝি?'

মুখে বড় একটা তোয়ালে চেপে পানি মোছা শেষ করল মেয়েটা, গাঢ় খয়েরি চোখ তুলে রানাকে দেখল। 'নির্ভর করে স্যুইটটা কে ভাড়া করছে তার ওপর।' হাতের তোয়ালে একটা চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রেখে চওড়া সান আমব্রেলার নীচে চলে এল, দাঁড়াল ড্রিঙ্ক ট্রলির সামনে। বাতাসে ক্যানভাসটা পতপত করছে। 'মার্টিনি, তাই না?'

'ধন্যবাদ।' ড্রিঙ্কটা তৈরি হতে দেখল রানা, চোখের পাতার মত পাতলা করে কাটা লেবুর টুকরোটা হিম গ্লাসের একেবারে নীচে নেমে গেল। 'ভালই গাড়ি চালাও তুমি।'

মেয়েটার মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হাসিতে আলোকিত হয়ে উঠল। 'সাধারণত এত জোরে চালাই না। আমার বুড়ো ইন্সট্রাক্টার দেখলে খেপে যেতেন।' রানার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল। 'ভাল কথা, আমি কনসুয়েলা। বিআই অর্থাৎ ব্রাজিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স। বিসিআই চিফ একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন বিআই চিফকে। সেটা পেয়ে বস্ বললেন, আমরা যেন তোমাকে সাহায্য করি।'

মনে মনে হাসল রানা। কৃতজ্ঞ চিত্তে ভাবল, ফিল্ডে সাধারণত নামতে হয় না বসকে, কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টে নামবার পর রানাকে কে কী বললেন, কোত্থেকে সাহায্য ওকে পাইয়ে দেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ মনে হচ্ছে তাঁকে।

ইঙ্গিতে পেন্টহাউসটা দেখাল ওকে কনসুয়েলা। 'ওখানে তুমি ভাল থাকবে তো? মানে, আরাম পাবে?'

'ভার্টিগো বা অ্যাগরোফোবিয়ায় ভুগি না আমি, কাজেই একুশতলা বা খোলা জায়গা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়।' গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'বাহ্, ভাল মিশিয়েছ।'

'ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা, কনসুয়েলা, তুমি কি জানো এই দুটো আদ্যাক্ষর কী অর্থ বহন করে? পি অ্যান্ড এম?'

একমুহূর্ত চিন্তা করে কনুসুয়েলা মাথা ঝাঁকাল। 'রিয়ো-য় এটা অত্যন্ত পরিচিত। এখানে একটা ফার্ম আছে, পেলে অ্যান্ড ম্যারাদোনা। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যবসাতে খুব বড় একটা নাম। তবে না, বিশ্ববিখ্যাত দুই ফুটবলারের সঙ্গে এই ব্যবসার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তাহলে কীসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে?'

'এই কোম্পানিটা বোধহয় লাম্বাডা করপোরেশনের একটা সিসটার কনসার্ন, যতদূর মনে পড়ছে আমার।'

'ওদের ঠিকানা জানো?'

'ওয়্যারহাউস আর অফিস, দুটোই কারিওকা অ্যাভিনিউয়ে।'

চোখ সরু করল রানা। 'গুড। আজ রাতে চুপিচুপি একবার ঢু মেরে আসব।'

মাথা নাড়ল কনসুয়েলা। 'কাজটা খুব কঠিন হবে।'

রানার চোয়ালে দৃঢ় রেখা ফুটল। 'তারপরও চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাকে।'

চোখ সরিয়ে নিয়ে সান-ট্যান লোশনের একটা অ্যারোসল ক্যান তুলে নিল কনসুয়েলা। 'বেশ। তা হলে আমিও থাকছি তোমার সঙ্গে।' পায়ের ডিমে খানিকটা ক্রীম ঢেলে ম্যাসাজ শুরু করল।

মেয়েটার দিক থেকে চোখ সরাতে নিজের উপর জোর খাটাতে হলো রানাকে। হাতঘড়ি দেখল, এই মাত্র তিনটে বেজেছে। 'আচ্ছা, দেখো তো কনসুয়েলা, এই সমস্যার সমাধান তোমার জানা আছে কি না? সাম্বা নাচছ না, অথচ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় কিল করতে হবে–এই অবস্থায় কী করবে তুমি?'

প্রথমে তির্যক দৃষ্টি হেনে রানাকে ভাল করে দেখল কনসুয়েলা, তারপর হেসে ফেলে বলল, 'এর সমাধান পানির মত সোজা। চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'যাব···কোথায়?'

'চারদেয়ালের ভেতর।' সিধে হয়ে রানার একটা হাত ধরল মায়াবিনী নারী। 'তোমার সমস্যার সমাধান শুধু ওখানেই পাওয়া যাবে–লোকচক্ষুর আড়ালে, নরম বিছানায়।'

কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেল চুলে বিলি কেটে ওকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে কনসুয়েলা।

রাত আটটা বাজতে বাজতে কারিওকা অ্যাভিনিউয়ে জনতার ভিড় আর গর্জন এমন তুঙ্গে পৌঁছাল যে ছোট একটা এয়ারস্ট্রিপকে অনায়াসে ওগুলোর ভিতর লুকিয়ে ফেলা যাবে। চারদিকের আকাশে আতসবাজি পুড়ছে, সরল রাস্তায় লাখো মানুষের ঢল, ড্রাম পিটিয়ে বিরতিহীন চলছে সাম্বা নৃত্য, শহরের সবগুলো অখ্যাত-বিখ্যাত ব্যান্ড যার যার পছন্দের বাজনা বাজাচ্ছে, এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে রাস্তার দু'পাশে নিরেট পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের উল্লাসধ্বনি আর হাততালি। আজ কারনিভাল ডে, সারারাত কেউ বোধহয় রাস্তা ছেড়ে ঘরে ফিরবে না।

রানার প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াল জনস্রোতের সঙ্গে কনসুয়েলার ভেসে যাওয়া ঠেকানো। মেয়েটার সিল্ক ব্লাউজের আস্তিন এত চওড়া যে তার ভিতর রানাকে লুকিয়ে ফেলতে পারবে। তার স্কার্ট শুরু হয়েছে নাভির চার ইঞ্চি নীচে থেকে, শেষ হয়েছে অর্ধেক ঊরু না ঢেকেই। কানে সরু রিঙ পরেছে, ভিতরে বড় একটা মুঠো ঢুকে যাবে, এত ঝুলে আছে যে কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে। প্রচুর চুল তার, একজোড়া বেণী হয়ে পিঠে ঝুলছে, ব্যান্ড হিসেবে সোনার চেইন ব্যবহার করা হয়েছে মাথায়। মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো কনসুয়েলাকে। ফুটপাথে উঠে এসে ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'পাশের রাস্তায় দেখো,

ডানে, পি.অ্যান্ড এম-এর ওয়্যারহাউস।'

লোকারণ্যের মাথার উপর দিয়ে তাকাল রানা, তারপর ম্লান একটু হেসে বলল, 'হুম। প্রতিষ্ঠানটা তো দেখছি বন্ধ।'

কনসুয়েলার চোখে মৃদু তিরস্কার। 'আমার কথা তো শুনলে না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতাম আমরা।'

ভাব দেখে মনে হলো কনসুয়েলার কথা শুনতে পায়নি রানা। আবার সচল মিছিলে সামিল হওয়ার সময় কঠিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখোশ হয়ে উঠল ওর অবয়ব। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওর পিছু নিল মেয়েটা। হঠাৎ করে ওর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার যেমন কোনও বোধগম্য বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই, তেমনি যুক্তি দিয়ে লোকটাকে বুঝতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে সে। কোন পুরুষের কাছে এভাবে কখনও ধরা দেয়নি কনসুয়েলা। তবে এখনও শিরশিরে ভাব নিয়ে শরীরটা সাক্ষ্য দিচ্ছে, এ কোন সাধারণ মানুষ নয়।

মূল মিছিলের বিশ গজ পিছন থেকে রানা ও কনসুয়েলার গতিবিধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুসরণ করা হচ্ছে। উৎসবে আসা আর সবার চেয়ে এই লোকটা কয়েক ফুট বেশি উঁচু। তার মুখোশ যেমন বিদঘুটে, ছদ্মবেশের অন্যান্য উপকরণও বিচিত্র, ফলে অর্ধেকটাকে মনে হচ্ছে দৈত্যাকার রোবট, বাকি অর্ধেক গোপাল ভাঁড়ের ল্যাতিন সংস্করণ। কনসুয়েলাকে নিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকছে রানা, বিদঘুটে মূর্তিটা পিছু নিল ওদের।

গলির ভিতর ঢুকে আকাশ ছোঁয়া ভবনটার দিকে মুখ তুলে তাকাল রানা। পি অ্যান্ড এম ওয়্যারহাউস আধুনিক কোন দালান নয়। বন্ধ জানালায় কালিঝুলি জমেছে। গভীর একটা শ্যাফটের কিনারায় উঁচু রেইলিং। লোহার যে গেটটা হয়ে বেযমেন্টে নামা যাবে তাতে তালা ঝুলতে দেখা গেল। নৃত্যরত দলগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দিল রানা, ইঙ্গিতে কনসুয়েলাকে গেটের সামনে থামতে বলল। 'আমি একটু ঘুরে দেখি,' বলল ও। 'তুমি এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। সাবধান, কারও সঙ্গে নাচবে না।' ঝুঁকে একটা হালকা চুমো খেলো। কনসুয়েলার সুখানুভূতি বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার দশা হলো যখন দেখল যে চুমোর আসল উদ্দেশ্য গেটের ঝুলন্ত তালার উপর হামলাটা আড়াল করা।

'তুমি তো দেখছি লোক তত ভাল নও,' বলল সে। 'প্রথম যাকে পাব তার সঙ্গেই চলে যাব আমি।'

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, খুলে গেল তালাটা। কড়া থেকে সেটা বের করে কনসুয়েলার হাতে ধরিয়ে দিল রানা, সরু এক ফালি মেটাল ভরল নিজের পকেটে। 'আমাদের সাক্ষাতের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এই তালা রাখতে দিলাম তোমাকে। আমি ধাপ বেয়ে নেমে যাওয়ার পর কড়ায় আবার তুমি এটা পরিয়ে দেবে।' ধীরে ধীরে দরজাটা ফাঁক করল রানা, কনসুয়েলা কিছু বলবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভিতরে।

ভিতর থেকে বোল্ট লাগানো থাকায় বেযমেন্টর দরজা সহজে খোলা গেল

না। ছোট একটা গ্লাস কাটার দিয়ে অস্বচ্ছ একজোড়া গ্লাস প্যানেল কাটল রানা, তারপর ভিতরে হাত গলিয়ে বোল্ট খুলতে হলো। গলির আরও সামনে থেকে ভেসে এল পটকা বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দ; সাম্বা নাচ আর মিউজিকের সঙ্গে তাল ও ছন্দ মিলিয়ে দালানটার ভিতও যেন কাঁপছে। হইচই আর উল্লাসধ্বনি কর্ণবিদারক। দরজার ভিতরে কেউ যদি ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, তার নড়াচড়া বা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাবে না ও।

মরচে ধরা শেষ বোল্টটা সরিয়ে হাত বের করে নিল রানা, এরপর পড়ল তালা নিয়ে। কয়েক সেকেন্ড পরই দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিল ধীরে ধীরে। প্রথমে মাত্র কয়েক ইঞ্চি খুলল। তারপর জোরে একটা ধাক্কা মেরে ছুটল রানা। সামনে পড়ল কংক্রিটের একটা পিলার, ওটার পিছনে গুড়ি মেরে বসল ও, চাঁদের আলোয় দরজাটাকে দুলতে দেখছে। আশপাশে কেউ আছে বলে মনে হলো না। হাতে পিস্তল নিয়ে সাবধানে সিধে হলো। সাবধানের মার নেই ভেবে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল, তারপর আঁকাবাঁকা একটা সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল। প্রতিটি ল্যান্ডিঙে একটা করে উঁচু জানালা রয়েছে, সেগুলোর সামনে থেমে রাস্তার মিছিল আর বহুদূর বিস্তৃত আলোকসজ্জা দেখছে।

ওদিকে গলির ভিতর, রেইলিং ঘেঁষে, নিজের জায়গায় অটল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কনসুয়েলা। ইতোমধ্যে কম করেও দশজন পুরুষের নাচের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে সে। তার উল্টোদিকের দেয়ালে একটা ক্লাবের প্রবেশপথ দেখা যাচ্ছে, বাঁধ ভাঙা স্রোতের মত লোকজন ভিতরে ঢুকছে আর বেরিয়ে আসছে। ভূতে পাওয়া মানুষের মত আচরণ করছে সবাই; নাচছে, গাইছে, হাসছে, আদর করছে—সবই যেন একটা ঘোরের মধ্যে। সাম্বা ছন্দের সঙ্গে পা দুটোর তাল মেলানো ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, সামনে এগিয়ে এসে গলাটা লম্বা করে কী ঘটছে দেখবার চেষ্টা করল কনসুয়েলা।

গলির মুখে কিম্ভূত কারনিভাল কস্টিউম পরা দীর্ঘ মূর্তিটা টলমল করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখোশের ভিতর তার চোখ দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যায় গোটা দৃশ্যের উপর তীক্ষ্ণ চোখ বুলাচ্ছে সে। উল্লাসে অধীর এক তরুণ দৈত্যের সামনে এসে প্রেম নিবেদনের ভঙ্গিতে কার্ডবোর্ডের গিটার ঝাঁকিয়ে গান জুড়ে দিল। দৈত্যের হাতের ঝাপটায় খেলনাটা উড়ে গিয়ে বেযমেন্টে পড়ল। প্রতিবাদ করবার ইচ্ছেটা অঙ্কুরেই মরে গেল তরুণের—অতিকায় মূর্তি ভয় দেখিয়ে এক পা সামনে বাড়তে দেখা গেল যে সে কোন রণ-পা বা প্যাড ব্যবহার করছে না, জন্মসূত্রেই সে বিকট ও বিশাল। লোকটা সাত ফুটেরও বেশি লম্বা।

ওয়্যারহাউসের চারতলায় পৌঁছে পেন্সিল টর্চটা পকেটে রেখে দিল রানা। চেম্বারটা যে খালি, এটা দেখবার জন্য অতিরিক্ত কোন আলোর প্রয়োজন নেই। ভাঙা কিছু প্যাকিং কেস পড়ে রয়েছে, আর দেখা যাচ্ছে কিছু মোচড়ানো বাইন্ডিং ওয়্যার। ধুলোয় ফুটে থাকা নানা ধরনের প্যাটার্ন আর পায়ের তাজা ছাপ দেখে বোঝা যায় এখানকার মাল-পত্র সম্প্রতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেই পরিচিত

দৃশ্যই। ওয়্যারহাউস খালি পড়ে আছে।

হতাশ হলেও রানা বিস্মিত নয়। ভেনিসের ওই ঘটনার পর এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে কার্তেজ লাম্বাডা তার পদচিহ্ন ঢেকে ফেলবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ওয়্যারহাউসের মাথায় উঠে এসে স্কাই লাইটের ভিতর দিয়ে তাকাল রানা। আকাশে এতবেশি আতসবাজি জ্বলছে, মনে হলো ঝাঁক ঝাঁক বম্বারকে লক্ষ্য করে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান থেকে হাজার হাজার শেল ছোঁড়া হচ্ছে। স্কাইলাইটের দিকে পিছন ফিরতে যাবে, মেঝেতে কী একটা চকচক করতে দেখল রানা। তুলে নিয়ে ওল্টাল। একটা লেবেল। তাতে নকশা ছাপা রয়েছে: ব্যাকগ্রাউন্ডে নতুন প্রভাত, শিশু সূর্য সোনালি কিরণ বিকিরণ করছে। একেবারে নীচের দিকে রূপালি হরফে লেখা লাম্বাডা এয়ার ফ্রেইট, পাশে লাম্বাডা করপোরেশনের ট্রেড মার্ক—বলয়ের ভিতর নীল জমিন, তাতে নেবুলা বা নীহারিকা আঁকা। লেবেলটা পকেটে ভরে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল রানা।

গলির ভিতর সবাই আকাশে মুখ তুলে ফায়ারওঅর্ক ডিসপ্লে দেখছে। ক্লাব গেটের দিকে পিছন ফিরে কনসুয়েলাও মুখ তুলল। মাত্র একজন লোক ওর দিকে নয়, তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। সেই দৈত্যাকার লোকটা কনসুয়েলাকে লক্ষ করছে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কাঁধের উপর প্রকাণ্ড ভারী মাথাটা মানানসই না বলে উপায় নেই। ঠাণ্ডা শান্ত চোখ দুটোয় পাথুরে কাঠিন্য। প্রকাণ্ড একটা পা সামনে বাড়ল শিকারের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনবার জন্য। জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একটা হাউই-এর অবশেষ এক রাশ আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে বেযমেন্টে এসে পড়ল, ঘুরে সেদিকে তাকাতে গিয়ে কনসুয়েলা দেখল দৈত্যটা তার প্রায় ঘাড়ে চড়তে যাচ্ছে।

প্রকাণ্ড একটা হাত মাথা থেকে তুলে নিল হেডপীসটা; কনসুয়েলা এমন একটা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, দুনিয়ার যে-কোন মুখোশের চেয়ে কুৎসিত সেটা। ভাবলেশহীন একজোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। চওড়া মুখ খুলে গিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখাল কনসুয়েলাকে। দু'সারি এবড়োখেবড়ো স্টেনলেস স্টীলের দাঁত, বাইস বা পাকসাঁড়াশির মত ফাঁক হলো। কনসুয়েলা চিৎকার শুরু করল। কিন্তু চারপাশে হাজার হাজার মানুষ যেখানে গলা ফাটাচ্ছে, ড্রাম বাজাচ্ছে আর গান গাইছে সেখানে তার চিৎকার আলাদাভাবে কে-ই বা শুনতে পাবে। মস্ত একটা লোমশ হাত এগিয়ে এসে কনসুয়েলার ঘাড় ধরল, তারপর ছুঁড়ে দিল ওকে রেইলিঙের উপর। নতুন একগাদা আতসবাজি বিস্ফোরিত হলো, ক্লাবের প্রবেশপথ থেকে স্রোতের মত বেরিয়ে এল মানুষের শরীর, সচল একটা ট্রেনের আকৃতি নিয়ে সাম্বা নাচ নাচছে।

গলির ভিতর এই মুহূর্তে তিল ধারণের জায়গাও বোধ হয় নেই। আর এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটছে। দৈত্যটা রেইলিঙের সঙ্গে চেপে ধরতে কনসুয়েলার মনে হলো দম আটকে মারা যাচ্ছে সে। দৈত্যটা যেন তাকে লোহার গ্রিলের ফাঁকে জোর করে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রকাণ্ড মুখ হাঁ করল সে, মাথা কাত হয়ে গেল একদিকে। নতুন এক আতঙ্কে শিউরে উঠে কনসুয়েলা

বুঝতে পারল লোকটা তাকে ওই কুৎসিত ইস্পাতের দাঁত দিয়ে কামড়াবে। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে ধস্তাধস্তি শুরু করল সে, কিন্তু লোকটার চোখের ঠাণ্ডা ভাব এতটুকু বদলাল না।

হয়তো শুধু রোবটের কস্টিউমই পরেনি, রোবটের মত প্রোগ্রামড্ অবস্থায় পাঠানো হয়েছে–যা করতে এসেছে তা না করে থামবে না। প্রায় বিবস্ত্র তরুণ-তরুণীর হাস্যরত, নৃত্যরত একটা দল ওদের উপর একরকম আছাড় খেয়ে পড়ল। বাঁচাও! বাঁচাও! বলে চিৎকার করে তাদের সাহায্য চাইল কনসুয়েলা। অন্তত তার মন বলছে যে সে চিৎকার করেছে। কিন্তু তার সব চিৎকার মুখ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে। কানে শুধু বাজছে চারদিক থেকে ছুটে আসা বিদ্রূপাত্মক হাসির আওয়াজ। কনসুয়েলার মনে হলো তার মৃত্যু সবাই উপভোগ করতে চাইছে। কারনিভালে এটাও যেন তাদের একটা আনন্দের উৎস। তার মাথা পিছন দিকে ঝুলে পড়ল। মৃত্যুর জন্য তৈরি হলো সে।

বেযমেন্টের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই রানা দেখল কনসুয়েলার ঢোলা আস্তিন রেইলিঙের ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। মুহূর্তের জন্য ভাবল, মেয়েটা সম্ভবত বেঁচে নেই। কিন্তু তারপরই একটা হাত একটু যেন নড়ল বলে মনে হলো। ছেড়ে দেওয়া স্প্রিঙের মত ধাপ বেয়ে উঠে আসছে রানা। এবার দেখতে পেল দৈত্যটাকে। সে তার প্রকাণ্ড মাথা নীচে নামাচ্ছে, যেন গামলায় মুখ দিয়ে পানি খাবে।

পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি মারল রেইলিঙে। ইস্পাত দিয়ে মোড়া জুতোর সামনেটা ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভিতর দু'সারি ভীতিকর দাঁতের সঙ্গে ঘষা খাওয়ায় আগুনের ফুলকি ছুটল, সেই সঙ্গে শোনা গেল বিস্ময়বোধক আর ব্যথায় কাতর গোঙানির শব্দ। দৈত্য সিধে হলো যেন প্রাগৈতিহাসিক কোন জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড় থেকে। রানার দিকে পুরানো ঘৃণা আর আক্রোশ নিয়ে তাকাল সে। এক মুহূর্ত দু'জনের কারও চোখেই পলক পড়ল না। তারপর ভিড়ের মাঝখানে বিস্ফোরিত হলো একটা ক্যাথরিন হুইল–লাটিমের মত ঘুরন্ত এক ধরনের হাউই।

আত্মরক্ষার জন্য পাগল হয়ে ওঠা মানুষ ছিটকে এসে নিরেট পাঁচিলের মত ধাক্কা মারল দৈত্যকে। খড়কুটোর মত ভেসে গেল সে। কড়া থেকে তালাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। গলিতে যে ফাঁকটা তৈরি হয়েছিল, ক্লাবের ভিতর থেকে নতুন একটা স্রোত বেরিয়ে এসে চোখের পলকে ভরাট করে তুলল সেটা। দৈত্যটার বিরুদ্ধে একটা পাঁচিলের মত বাধা হয়ে দাঁড়াল তারা।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে কনসুয়েলাকে বুকে টেনে নিল রানা। তার গলায় লাল দাগ ফুটে রয়েছে, কাঁধের কাছে ব্লাউজটা ছেঁড়া। তবে রক্ত নেই কোথাও। রানা দেখল ধীরে ধীরে চোখ মেলছে কনসুয়েলা।

'তোমাকে আমি বলিনি কারও সঙ্গে নেচো না?'

'ওহ্, রানা–' মুখে কথা সরছে না, রানার কনুই আঁকড়ে ধরে কেঁদে ফেলল

কনসুয়েলা। রানা তাকে সাবধানে, ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল। গলির দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে সরে আসছে ওরা। কনসুয়েলার চোখ দুটোয় এখনও আতঙ্ক। 'কে···কে ওই লোক?'

'ওর নাম জানোয়ার,' বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না, ওকে তুমি আর কোনদিন দেখবে না।' ভাবল, যত জোর দিয়ে বলতে পারল, আত্মবিশ্বাসটা সেরকম জোরাল হলে ভাল হত।

কনসুয়েলার মুখে ক্লান্ত হাসি। 'আমিই ঠিক বলেছিলাম। আমাদের উচিত ছিল চারদেয়ালের ভেতর থাকা।'

তার কপালে চুমো খেল রানা। 'তুমি তাই থাকবে। আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ।' রানার হাত সরিয়ে দিয়ে নিজের চেষ্টায় হাঁটতে চেষ্টা করল কনসুয়েলা। দেখা গেল টলছে সে। তাড়াতাড়ি আবার তাকে ধরে ফেলল রানা, তা না হলে পড়ে যেত।

'রিয়োর একটা বিস্ময় তুমি,' বলল রানা, 'কিন্তু তারপরও তোমাকে বাড়িতে ফিরতে হবে।' চোখের কোণ দিয়ে একটা তোবড়ানো ট্যাক্সি দেখতে পেল রানা, চালাচ্ছে স্কেলিটান কস্টিউম পরা এক লোক। কঙ্কাল সাজা ড্রাইভার জনসমুদ্রের উদ্দেশে কখনও ভেংচি কাটছে, কখনও মাথা দুলিয়ে হাসছে। কনসুয়েলাকে সেদিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানা। মেয়েটা বাধা দিচ্ছে না।

'ওখানে তুমি কিছু দেখলে?'

'প্রচুর স্টোরেজ স্পেস। কিন্তু সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'তারমানে তুমি এগোতে পারছ না?'

হাত তুলে ক্যাব ড্রাইভারকে সংকেত দিল রানা। পঞ্চাশ ডলার ভাড়া নিয়ে ম্যাগাজিন শার্ট পরা দু'জন মার্কিন তরুণকে নামাচ্ছে সে। 'হয়তো পারছি। লাম্বাডা এয়ার ফ্রেইট কোত্থেকে অপারেট করে জানো তুমি?'

'সান পিয়েট্রো এয়ারপোর্ট থেকে। তুমি চাও ওখানে তোমাকে আমি নিয়ে যাই?'

'শুধু দেখিয়ে দাও, যদি তোমার বাড়ির পথে পড়ে।' চারদিক ভাল করে একবার দেখে নিয়ে কনসুয়েলাকে ট্যাক্সিতে উঠতে সাহায্য করল রানা। কঙ্কাল একটা সিগারেট ধরাচ্ছে। বলল, 'টান না দিয়ে হাতের ওটা ফেলে দাও। এই বাজে অভ্যাসটা তোমার ক্ষতির কারণ হবে।'

দশ

কারনিভাল যখন অন্তিমদশায় পৌঁছাল, কেবল্ কার নিয়ে রানা তখন সুগার লোফ

পাহাড়চূড়ায় উঠছে। মাতালরা হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করেছে ঘণ্টাকয়েক আগেও নর্দমাগুলো যেরকম আরামদায়ক ছিল, এখন আর সেরকম লাগছে না, কাজেই উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির পথ ধরছে তারা। সৈকতে জ্বালা হাজার হাজার আগুন কালো কয়লার ছোট ছোট স্তূপে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় এখন নাচিয়েদের তুলনায় তাদের পরিত্যক্ত জিনিস-পত্রের সংখ্যাই বেশি।

কেবল্ কার প্রথম পাথুরে দাঁড়ায় পৌঁছাল। ভারী মেটাল ডোর বিকট শব্দে খুলে গেল। আরোহী বলতে রানা ছাড়া দু'জন মধ্যবয়সী লোক। আকাশের কাছাকাছি এই কেবল্ কার স্টেশনে বেশ কয়েকটা স্যুভেনির শপ আছে, ধাপ বেয়ে সেদিকে নেমে গেল লোক দু'জন। রানা এগোল দ্বিতীয় কার-এ চড়বার জন্য, দেখল মাটি থেকে হাজার ফুট উপরে বিপুল বোঝা নিয়ে তারগুলো কেমন ঝুলে আছে। রাস্তা আর সৈকত থেকে ভেসে আসা সাম্বা মিউজিকের নিস্তেজ হয়ে পড়া শব্দ শুনতে চাইলে কান পাততে হয়। কার-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গুঞ্জন তুলল তারগুলো। ঝাঁকি খেয়ে রওনা হয়ে গেল কার।

নীচে তাকিয়ে সুগার লোফ পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঝোপ-ঝাড় আর ঘাস দেখতে পেল রানা। ডান দিকে আটলান্টিক মহাসাগর, বাঁয়ে সুগার লোফের দ্বিগুণ উঁচু কোরকোভাডো পাহাড়, চূড়ায় যীশুর বিশাল স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে আছে। নতুন প্রভাতের সূর্যকিরণ গোটা শহরকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। কার-এর ভিতরটা বেশ গরম, কিন্তু তারপরও অস্বস্তি বোধ করছে রানা। বিরাট এই শহরেই কোথাও ওকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে জানোয়ার।

ওর ধারণা ছিল জানোয়ার হয় অক্টোপাসের পেটে স্থান পেয়েছে, নয়তো কবীর চৌধুরীর অয়েল ট্যাংকার সিলভার বোদালের সঙ্গে ডুবে মরেছে। দেখা যাচ্ছে, ওর ধারণা ভুল ছিল। প্রশ্ন হলো, জানোয়ার কি কার্তেজ লাম্বাডার হয়ে কাজ করছে? কিন্তু তা কী করে হয়! কবীর চৌধুরীর মত মনিবকে সে ছাড়বে কেন? কার্তেজ লাম্বাডা কবীর চৌধুরী কি না, এই প্রশ্নটা এখন আর অগ্রাহ্য করতে পারছে না রানা। সময়ই হয়তো এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার একটা পথ করে দেবে।

কেবল্ কার পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছাল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে গাছপালা দিয়ে ঘেরা ছোট একটা মালভূমিতে নামল রানা। একটাই কাফে, বাইরেও টেবিল ফেলা হয়েছে। গিফট শপগুলো বেশিরভাগই বন্ধ। চওড়া এসপ্লানেড-এ এসে দাঁড়াল ও। হারবারে নোঙর ফেলা বোটগুলো দেখা যাচ্ছে। এবার চোখ বুলাল কোপাকাবানা আর ফ্ল্যামেঙ্গে সৈকতে। দ্বিতীয় সৈকতের সামনে সাগরের ভিতর চলে গেছে সরু একটা মাটির ফালি, যেন মানুষের তৈরি একটা বাঁধ। ওই বাঁধের মাথায় একটা এয়ারপোর্টের পরিচিত রানওয়ের প্যাটার্নটা ফুটে আছে।

রানা দেখল একটা প্লেন টেক-অফ করবার জন্য ছুটতে শুরু করেছে। ওর

ধারণা হলো, ওটা সম্ভবত একটা কার্গো প্লেন। কয়েনের খোঁজে পকেটে হাত ভরে এসপ্লানেডের আরেক কিনারায় ছুটে এল ও, আজ একমাত্র এদিকের টেলিস্কোপটাই ভাড়া খাটছে। কয়েন পড়তেই এয়ারপোর্টের ঝকঝকে ছবিটা রানার চোখের সামনে চলে এল। টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে প্লেনটাকে খুঁজে নিল ও, ইতোমধ্যে রানওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে। আকাশে উঠবার পর বাঁক নিল, তারপর সোজা সুগার লোফ চূড়ার দিকে এগোল। ককপিটে খুদে দুটো মূর্তি দেখতে পেল রানা, আর ঠিক তখনই বাঁক নিয়ে সাগরের দিকে ঘুরে গেল প্লেনটা। এখন ওটার একপাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গায়ে লেখা–লাম্বাডা এয়ার ফ্রেইট। লেখাটার দু'পাশে লাম্বাডা করপোরেশনের ট্রেড মার্ক আঁকা। টেলিস্কোপ ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো রানা, মুখে চিন্তার রেখা ফুটে আছে। ঘুরতে যাবে, অনুভব করল এসপ্লানেডে একা নয় ও।

ওর থেকে বিশ গজ ডাইনে চোখে বিনকিউলার চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডক্টর তাপসী রায়। ওর মত তাকেও খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। আজ পুরোপুরি উপমহাদেশীয় ঐতিহ্যের অনুসারী: সালোয়ার-কামিজ পরেছে সে, গলায় পেঁচানো ওড়না উড়ছে বাতাসে। এরকম ঢোলা পোশাকের জন্যই কি না, চোখের সামনে বিনকিউলারটা একদম মানায়নি। এগোবার সময় আপন মনে হাসল রানা। তার নরম কাঁধে একটা হাত রাখল ও। 'আগে কি আমাদের কোথাও দেখা হয়েছিল?'

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ঘুরল তাপসী, ভেঙচি কাটল রানাকে। 'চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে,' বলল সে, কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিল। 'আচরণটাও।'

ডান ভুরু সামান্য একটু উপরে তুলল রানা। 'ভেনিসে এই আচরণের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদ করেছ বলে তো মনে পড়ছে না।'

'সেটা আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাওয়ার আগের কথা।'

'মনে নেই, তোমার সুটকেসে পা বেধে যাওয়ায় প্রায় আছাড় খাচ্ছিলাম?' হেসে উঠল রানা। 'চলো, তাপসী। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

'সে তো আমারও আছে।' বিনকিউলারটা ঢাউস হ্যান্ডব্যাগে ভরে রানার সঙ্গে হাঁটছে তাপসী। কেবল্ কার স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে ওরা। 'আমরা একসঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি। আমার ধারণা, এখনও বোধহয় সময় আছে।'

'কিসের সময়?'

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে তাপসী ফিসফিস করে বলল, 'দুনিয়াটাকে বাঁচানোর।' তার কথা কেউ শুনে ফেলল কি না দেখবার জন্য ভয়ে ভয়ে তাকাল চারদিকে। আশপাশে অবশ্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'জানতে পারি, কে এটাকে ধ্বংস করছে?'

'তোমার পরম শত্রু–কবীর চৌধুরী,' আবার ফিসফিস করল তাপসী। চেহারায় পরিষ্কার আতঙ্কের ছাপ।

'হোয়াট!'

তাপসীর মুখে কাঁপা-কাঁপা হাসি। 'ও, ইয়েস! কার্তেজ লাম্বাডা আসলে তোমার প্রাণের দুশমন সেই পাগল বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরীই। রবি ঠাকুরের ওই চেহারা আসলে ওর ছদ্মবেশ।'

'কিন্তু তা কী করে হয়!' কার-এ ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছে রানা। 'কবীর চৌধুরীর একটা পা নেই, তার মাথার একপাশের খুলি নেই, সে ঘাড় নাড়তে পারে না, মুখটা...'

'সব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল তাপসী। 'তবে ক্লোন প্রযুক্তির সাহায্যে নতুন একটা পা বা খুলির হাড় তৈরি করা তার মত বিজ্ঞানীর জন্যে কঠিন কিছু না।'

এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে তাপসীর হাত ধরল রানা, তারপর কেবল্ কারে চড়ল। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে তথ্য বিনিময় করতে রাজি আছি।'

'এর একটা অর্থ এ-ও হতে পারে যে তুমি বেশি কিছু জানতে পারোনি।'

হাসল রানা। 'তাহলে শোনো, আমার সদিচ্ছার প্রমাণ দিই। শহরে কবীর চৌধুরীর ওয়্যারহাউস চেক করা হয়েছে, কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। সব সরিয়ে ফেলেছে সে।'

তাপসীর ঠাণ্ডা চোখে পলক পড়ছে না। 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমি এখানে আসার পর থেকে ওই ধরনের ছ'টা প্লেন টেক-অফ করল।'

'তুমি জানো কোথায় যাচ্ছে ওগুলো?' তাপসীর উত্তর শুনবার জন্য রানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'জানলে কী এখানে থাকি!' জবাবটার বিশ্বাসযোগ্যতা আছে, তাপসীর চোখের পাতা এতটুকু কাঁপল না।

'সেক্ষেত্রে এটাই আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত—জানা। তবে তার আগে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে কার্তেজ লাম্বাডা যে কবীর চৌধুরী সে-সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে। তা ছাড়া, নাসাই বা তাকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছে কেন? আর, সবশেষে—এতে কোন সন্দেহ নেই যে তুমি খুব ভয় পাচ্ছ—নিজের বিপদটাও খুলে বলো আমাকে।'

কেবল্ কার সচল হলো। জানালার সামনে বসে দূর সৈকতের দিকে তাকাল তাপসী। 'সব কথাই বলব তোমাকে। তা হলে প্রথম থেকেই শুরু করি। আমাদের নাসায় অনেক গোপন কমপিউটরে ফাইল আছে, আমার সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স এ-প্লাস হওয়ায় সেগুলোয় ইন করা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়। তা ছাড়া, আমি ভারতীয় মেয়ে হওয়ায় উপমহাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোপন ফাইলগুলো আপ-টু-ডেট করার দায়িত্বও দেয়া হয় আমাকে।'

'কিন্তু একজন অ্যাস্ট্রনটের জন্যে এ-সব কাজ বেমানান নয়?' রানা মেলাতে পারছে না।

ক্ষীণ একটু হাসল তাপসী। 'জানতাম প্রশ্নটা তুমি তুলবে। শোনো তা হলে। নাসার একটা আলাদা ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট আছে, আমি সেখানেই চাকরি করি। আর ওই বিশেষ চাকরিটা পাওয়ার শর্ত পূরণ করার জন্যে অ্যাস্ট্রোনট হিসেবেও পুরোদস্তুর ট্রেনিং নিতে হয়েছে আমাকে। আমি, স্বভাবতই, একজন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।'

'তুমি এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবেও এ-প্লাস।'

'ধন্যবাদ।' তারপর বিড়বিড় করল তাপসী। 'গিল্টি মিয়া ভাল আছে তো?'

'হোয়াট!' এবার রানা শুনতে পেয়েছে।

'তোমার ফাইল আপ-টু-ডেট করতে গিয়েই প্রথমে ব্যাপারটা আমি খেয়াল করি,' বলল তাপসী, রানাকে অবাক হতে দেখে ক্ষীণ একটু হাসল। 'দেখলাম, তোমার ফাইলে যত জায়গায় কবীর চৌধুরীর প্রসঙ্গ ছিল সব মুছে ফেলা হয়েছে।

'আমার ইমিডিয়েট বসকে রিপোর্ট করার আগে ভাবলাম দেখি তো কবীর চৌধুরীর ফাইলেও কেউ হাত দিয়েছে কি না। ওমা, দেখি কী, কমপিউটরের মেমোরি থেকে গোটা ফাইল কে যেন মুছে ফেলেছে। স্বভাবতই আমি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠি। আমার ইমিডিয়েট বস্ মিস্টার সেলিঙ্গারকে সব কথা জানাই। তিনি আমাকে শান্ত হতে পরামর্শ দিয়ে বললেন, এ-সব খুঁটিনাটি বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমার উচিত দেশ অর্থাৎ কোলকাতা থেকে একবার বেড়িয়ে আসা।

'সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যাই আমি, বুঝে ফেলি এখানে নয়-ছয় কিছু আছে। তাকে বললাম, প্রথম কথা, আমার ছুটি পাওনা নেই; দ্বিতীয় কথা, খুব অভাবের মধ্যে আছি। ছুটি পেলেও কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। বস্ তখন তাঁর বসের কথা তুলে বললেন—লাম্বাডা করপোরেশনে পাঠাবার জন্য উনি একজন লোক চেয়েছেন, আমি যেতে ইচ্ছুক কি না। যদি যাই, অফিসের খরচে বেড়ানোও হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, ভেবে দেখি।

'সেদিনই আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার মিস্টার ডীন ম্যাকফারসন-এর সঙ্গে গোটা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম। উনি বললেন, হ্যাঁ, কনসালটেন্ট-কাম-অবজারভার হিসেবে লাম্বাডা করপরেশনে দায়িত্ব পালনের জন্যে মিস্টার শেলিঙ্গারের কাছে একজন লোক চেয়েছি। ওয়েল অ্যান্ড গুড, তুমিই যাও—তবে, যদি কোন গোলমাল দেখতে পাও, মিস্টার শেলিঙ্গারকে সে-সব জানাবে না। তাঁকে বলবে, সব ঠিক আছে। আসল রিপোর্টটা তুমি আমার কাছে পাঠাবে, গোপনে।

'আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সার, আমি চলে গেলে কবীর চৌধুরীর ফাইল রহস্যের তা হলে সমাধান হবে কী করে? সার উত্তরে বললেন—আমি জানি, রওনা হওয়ার আগে কার্তেজ লাম্বাডার ফাইলটা ভাল করে একবার পড়ে নেবে তুমি। দেখতে পাবে, কবীর চৌধুরীর সঙ্গে কত মিল তাঁর। দু'জনেই আদর্শ বিশ্বব্যবস্থা চালু করবার জন্যে যেন খেপে আছে। কবীর চৌধুরী বিজ্ঞানী, কার্তেজ

লাম্বাডা বিজ্ঞানী না হওয়া সত্ত্বেও ট্রেনিং দিয়ে অ্যাস্ট্রোনট বানাবার জন্যে কোত্থেকে কে জানে এমন সব শিক্ষানবিস নিয়ে আসছেন যাদের মধ্যে মানবিক ত্রুটি এত সামান্য যে না থাকবারই মত। তারা এত দ্রুত সব কিছু শিখে নিচ্ছে যে আট বছরের কোর্স শেষ হয়ে যাচ্ছে মাত্র বারো মাসে।

'যাই হোক, রওনা হওয়ার আগে কার্তেজ লাম্বাডার ফাইলটা ওপেন করলাম আমি। প্রথমেই চমকে উঠলাম ফটোয় তাঁর চেহারা দেখে। আমার জন্যে আরও অনেক চমক অপেক্ষা করছিল। ক্যালিফোর্নিয়ায়, লাম্বাডা করপরেশনে আসার পর রবি ঠাকুর অর্থাৎ কার্তেজ লাম্বাডাকে তো দেখলামই, আরও দেখলাম তরুণ আইনস্টাইন, নিউটন, ডারউইন, শেকস্‌পীয়ার, গান্ধী, গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, সক্রেটিস, আরিস্টটল–এরকম বহু বিজ্ঞানী, কবি, দার্শনিক আর মনীষীকে, সবাই অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার ট্রেনিং নিতে এসেছে…'

'আসলে কারা ওরা?' তাপসী শ্বাস নেওয়ার জন্য একটু থামতেই চট করে জানতে চাইল রানা।

'যেভাবে সাজিয়েছি সেভাবে বলতে দাও, তা না হলে সব গুলিয়ে ফেলব। কার্তেজ লাম্বাডা রবি ঠাকুরের মত দেখতে কেন, মনে এই প্রশ্ন নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছলাম। প্রথম দিনই মিস্টার লাম্বাডার প্রধান বাটলার ফার্নান্দেজ সীল করা একটা মোটা এনভেলাপ দিয়ে গেল, বলল: সার পাঠিয়েছেন। খুলে দেখি এক হাজার ডলারের একশোটা কড়কড়ে নোট, সঙ্গে টাইপ করা একটা চিরকুটে লেখা: লাম্বাডা করপোরেশনের তরফ থেকে সামান্য দক্ষিণা। এটা আপনার প্রাপ্য। আরও পাবেন। সিএল।

'আমার কাছে রেডিও ছিল, নাসায় রিপোর্ট করে নির্দেশ চাইলাম। মিস্টার ম্যাকফারসন নির্দেশ দিলেন, টাকা ফিরিয়ে দিয়ো না, যত দেয় তত নাও, আর চেষ্টা করো ভিতরে ঢোকার।

'এটা আট মাস আগের ঘটনা। এই আট মাসে আমি এক এক করে আবিষ্কার করেছি: কার্তেজ লাম্বাডা বাংলা জানেন, কিন্তু প্রকাশ করেন না; তাঁর সঙ্গে আমার ইমিডিয়েট বস্‌ মিস্টার শেলিঙ্গারের বিশেষ খাতির আছে, তিনিই নাসার সমস্ত ফাইল থেকে কবীর চৌধুরীর নাম মুছে ফেলেছেন; স্পেস শাটল সাপ্লাই দেয়ার টেন্ডারটা পেতে মিস্টার লাম্বাডাকে সাহায্য করেছিলেন মিস্টার শেলিঙ্গার; শিক্ষানবিস অ্যাস্ট্রোনটদের নিয়ে আসা হয় ইন্দোনেশিয়ার একটা অখ্যাত দ্বীপ থেকে, সেখানে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি আছে, সে-সব ল্যাবে উন্নতমানের সাইবর্গ বানানো হয়–মানে, এরা সবাই অর্ধমানব এবং অর্ধমেশিন; অবশেষে একদিন "রানা আসছে!" বলায় কার্তেজ লাম্বাডা হেসে ফেললেন, বললেন, "ধরলে কীভাবে যে আমি আসলে কবীর চৌধুরী?'

'অথচ তারপরও তুমি বেঁচে আছ?' রানার কণ্ঠে ও চেহারায় নিখাদ অবিশ্বাস।

তিক্ত এক চিলতে হাসির সঙ্গে তাপসী বলল, 'আটঘাট সব জানা ছিল, ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে তাই আর দেরি করিনি, একটা হেলিকপ্টারে চড়ে

এয়ারপোর্টে পৌঁছাই, সেখান থেকে ভেনিসে। পিছু নিয়ে দু'বার হামলা করেছে জানোয়ার, কবীর চৌধুরীর...'

কেবল্ কার-এ ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ না থাকলেও, হঠাৎ রানার মনটা খুঁত খুঁত করে ওঠায় জানালার শার্শির সামনে দাঁড়িয়ে ডকিং স্টেশনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শহুরে ভিড় থেকে অনেকটা দূরে, নির্জন শূন্যে ঝুলছে দু'জন। নিজেদেরকে অরক্ষিত মনে হলো রানার। তার উপর, মনে হঠাৎ সন্দেহ জাগল, শীঘ্রিই অশুভ কিছু একটা যেন ঘটতে যাচ্ছে।

'কীভাবে কী করা হবে, কিছু ভেবেছ তুমি?'

তাপসীর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কার। রানার গায়ে ছিটকে পড়ল তাপসী, সেখান থেকে ছুটে গেল একটা রেইল-এর দিকে। গতি হারিয়ে দুলতে শুরু করল কার। 'কী ঘটল?'

একটা হাত পাতল রানা। 'তোমার বিনকিউলারটা দাও।'

হ্যান্ডব্যাগ থেকে বিনকিউলারটা বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল তাপসী। সেটা চোখে তুলে কেবল্ কার স্টেশনের দিকে তাকাল রানা। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করছে, ইঞ্জিনরুমের এক পাশের একটা দরজা খুলে গেল, মাথা নত করা একটা মূর্তি বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের পুরো দৈর্ঘ্য নিয়ে সিধে হলো। রানার পেটে অকস্মাৎ এক টুকরো বরফ তৈরি হলো যেন, আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। মাথার উপর হাত তুলে ইস্পাতের একটা মই নামাল ও, মইটা কেবল্ কার-এর ছাদে আটকানো।

'কী ব্যাপার?' তাপসীর কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা।

বিনকিউলারটা তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। নিজেই দেখো।'

বিনকিউলার তুলল তাপসী। 'হে ভগবান! জানোয়ার! এখন কী হবে?'

'ভয় পেয়ো না...'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল তাপসী। 'এ সম্ভব নয়! জানোয়ার কেবল্ টেনে নিচ্ছে!'

এরই মধ্যে মই বেয়ে উঠতে শুরু করেছে রানা। হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় ছাদে যাওয়ার ট্র্যাপডোর খুলে ফেলল। 'জানোয়ার সব পারে। এসো!' শূন্যে একটা কাঁধ বের করে দিল ও, ইঙ্গিতে প্রবেশপথের উল্টোদিকের দরজায় হুকের সঙ্গে আটকানো এক প্রস্থ চেইন দেখাল তাপসীকে। 'সঙ্গে করে নিয়ে এসো ওটা।'

লোয়ার কেবল্ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে জানোয়ার দেখল কার-এর মাথা ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে রানা। আপন মনে হাসল সে। কেবল্-এর ঘন তেল আঙুলের ফাঁক গলে ঝরে পড়ছে, রিইনফোর্সড্ স্টীল ফাইবারের আঁটসাঁট বিনুনি দুই বাহুর ফুলে ওঠা পেশীর টানে নীচে নেমে আসছে, স্থির হলো তার বেরিয়ে থাকা দাঁতের সামনে পৌঁছে। মুখটা আরও বড় করে খুলল জানোয়ার, তারপর এবড়োখেবড়ো দু'সারি ইস্পাতের দাঁত দিয়ে কেবলটা চেপে ধরল। মেটাল

ফাইবারের গভীরে কামড় বসাচ্ছে সে, অনুভব করছে তন্তুগুলো এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ওগুলো যেন একটা ক্যান্ডিবারের ডেকোরেশন।

ছাদ দোল খাচ্ছে, এইমাত্র কোন রকমে উঠে এসে চেইনটা ধরবার জন্য ঝুঁকেছে রানা, এই সময় বজ্রপাতের মত বিকট শব্দ শোনা গেল। কেবল্ কার অকস্মাৎ একপাশে কাত হয়ে পড়ল, হিসহিসে একটা কেবল এঁকেবেঁকে পিছন দিকে ছুটল রানার মাথার উপর বাতাসে চাবুক মারবার জন্য। উপত্যকার মেঝেতে মরা সাপের মত পড়ে থাকল সেটা।

ঢালু ছাদে গড়াতে শুরু করল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা কেবল্ গাইড ধরে ফেলল, তা না হলে হাজার ফুট নীচে পড়ে থাকত ওর লাশ। পা দুটো শূন্যে ঝুলছে। কোত্থেকে কে জানে হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে তারগুলোর ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় শিস বাজিয়ে ওকে যেন বিদ্রূপ করে গেল। হ্যাচের ভিতর থেকে উপরে উঠল তাপসীর মুখ। 'ঝুলে থাকো!'

চোখ বুজল রানা, অনুভব করল ওর পা দুটো শূন্যে লাথি ছুঁড়ছে। পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে থাকা দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে নিঃশ্বাস ফেলছে ও। ভারসাম্য হারানো কেবল্-কার ঘড়ির দোলকের মত একটা শান্ত ছন্দ ফিরে পাচ্ছে, সুযোগ মত মাথার উপর ফাঁকটার কিনারা লক্ষ্য করে লাফ দিল ও। একই সঙ্গে পা দুটোকেও টেনে নিল। প্রাণপণ চেষ্টায় কেবল্ কার-এর প্রায় খাড়া ছাদে শরীরটাকে সাঁটিয়ে রাখতে পারছে। নীচে একবার চোখ বুলাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। জমিন হারিয়ে গেছে কুয়াশার ভিতর; লম্বা ঘাসের উপর দিয়ে বাতাসের ছুটোছুটিতে যে প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে সেগুলো জায়গা করে নিচ্ছে ওর মগজে। চোখ দুটো শক্ত করে বুজে কোন রকমে ঝুলে থাকল যতক্ষণ না বমি-বমি ভাবটা দূর হলো।

'রানা!' তাপসীর কণ্ঠে আরও বড় বিপদের আভাস রয়েছে। 'অন্য কারে ঢুকছে জানোয়ার।'

মাথা ঘুরিয়ে নীচে তাকাল রানা। যে-কোন মুহূর্তে অবশিষ্ট কেবল্ ছিঁড়ে যাবে, সেই সঙ্গে নীচে খসে পড়বে ওদের কারটা, এই আশঙ্কায় জর্জরিত হচ্ছিল ও। এই মুহূর্তে যা দেখছে তা-ও খুব কম বিপজ্জনক নয়। লোয়ার কেবল্ কার-এর ছাদে উঠছে জানোয়ার। স্টেশন থেকে নিশ্চয়ই দোল খেয়ে প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়েছে দৈত্যাকার উল্লুকের মত। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—কন্ট্রোলরুম থেকে কেউ তাকে সাহায্য করছে।

যেন রানার এই অনুমান সত্যি প্রমাণিত করবার জন্যই হাত তুলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিছু হটবার সংকেত দিল জানোয়ার। সেই সঙ্গে কার দুটো ঝাঁকি খেয়ে পরস্পরের দিকে রওনা হয়ে গেল। আবার প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঝুলে থাকতে বাধ্য হচ্ছে রানা। মাত্র একটা কেবল্ ধরে রেখেছে, ফলে আপার কার এদিক-ওদিক দুলছে। আবার ছাদের ফাঁকটায় নিজেকে তুলে আনল ও, সাবধানে ওয়ালথারটা বের করল। 'ওর আসা আমরা ঠেকাতে পারব না।'

কার দুলছে, একটা রেইল ধরে কোনরকমে তাল সামলাচ্ছে তাপসী। 'কিন্তু ওই জিনিস তুমি ব্যবহার করবে কী ভাবে?'

রানা কোন জবাব দিল না। শরীর যেখানে একদিক থেকে আরেকদিকে অনবরত গড়াগড়ি খাচ্ছে, সেখানে ভালভাবে লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টানার সুযোগ নেই। রানাকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না জানোয়ার ওদের উপরে এসে পৌঁছায়। সেটা ঘটতে খুব বেশি সময় লাগবে না। লোয়ার কার নিষ্ঠুর একটা ভঙ্গি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। ছাদে হাঁটু গেড়েছে জানোয়ার, রোদে ঝিক্‌ঝিক্ করছে তার ইস্পাতের দাঁতগুলো।

'ওই চেইনটা ধরে থাকো,' বলল রানা। কাত হয়ে থাকা হ্যাচকে ছাড়িয়ে উপরে উঠল ও, এগিয়ে আসা কার-এর দিকে লক্ষ্যস্থির করছে। হঠাৎ ধোঁয়ার খুদে একটা কুণ্ডলী দেখা গেল, সেই সঙ্গে রানার নীচের একটা জানালা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। প্রথম গুলিটা জানোয়ারই করেছে। তাপসীর বিষম খাওয়ার শব্দ পাচ্ছে রানা, হ্যাচ গলে বাইরে বেরিয়ে আসছে হলুদ ধোঁয়ার একটা মোচড় খাওয়া স্তম্ভ। রানার চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। অনুভব করল আঙুলগুলো কাঁপছে। শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখবার আর ঝুলে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টায় আঙুলের ফাঁক গলে পিস্তলটাকে পড়ে যেতে দিল ও। ছাদের উপর দিয়ে হড়কে শূন্যে লাফ দিল সেটা।

ইতোমধ্যে লোয়ার কার ওদের পাশে চলে এসেছে–লাল দুটো বাক্স অকস্মাৎ ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, গাছে ঝুলে থাকা ভারী ফলের মত দোল খাচ্ছে বাতাসে। ফাঁকটার ওপারে শয়তানি হাসি হাসছে জানোয়ার, ঋজু হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তার পিছনের কারকোভাডো পাহাড়ের চেয়ে কম নাটকীয় নয়। ঝাঁকি খেয়ে মাথাটা প্রায় ঘুরে গেছে, নিজেকে এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি রানা, এই সময় শূন্যে লাফ দিল জানোয়ার, ধাতব একটা আওয়াজ তুলে ওদের কার-এর ছাদে নামল।

চাপ পড়ায় ককিয়ে উঠল কেবল্, গোটা স্ট্রাকচার ঝাঁকি খাচ্ছে। মাথা তুলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা, তাতে লাভ হলো এই যে জানোয়ারের ছোঁড়া লাথিটা ওর মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আঘাত করল রুফ হাউজিং-এ। হড়কে একপাশে সরে যাচ্ছে রানা, সরাসরি নীচে তাকিয়ে আরেকবার দেখে নিল জমিন থেকে কত উপরে রয়েছে ওরা।

এই সময় নড়াচড়াটা চোখের কোণে ধরা পড়ল। ঘটনাটা কার-এর দূরপ্রান্তে ঘটছে। ভাঙা জানালা গলে কার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে তাপসী। গভীর মনোসংযোগের কারণে ঠোঁট জোড়া পরস্পরকে চেপে ধরেছে। তার বাম হাতে কী যেন একটা রয়েছে। তারপর রানা জিনিসটা চিনতে পারল–ভেনিসে যে সেন্ট অ্যাটোমাইজারটা দেখেছিল ও। চোখেমুখে অবজ্ঞার ভাব, নতুন চ্যালেঞ্জটাকে সামলাবার জন্য ঘুরল জানোয়ার। সাবধানে পা বাড়াল সে, যেন অসহায় একটা শিকারের দিকে এগোচ্ছে নির্দয় একটা মাকড়সা। হাত তুলল তাপসী, পরমুহূর্তে

হুউউউস্ শব্দের সঙ্গে আগুনের একটা শিখা ছুটে গিয়ে আঘাত করল সরাসরি ইস্পাতের দাঁতে। ব্যথা আর রাগে গর্জে উঠল জানোয়ার, পিছু হটতে গিয়ে আরেকটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিল। একটা পা হোঁচট খাচ্ছে, অপর পায়ের নীচে কিছু থাকল না–খোলা হ্যাচের ভিতর হারিয়ে গেল সেটা।

চেঁচিয়ে উঠে পিছনদিকে কাত হলো সে, প্রকাণ্ড শরীরটা হ্যাচ গলে কার-এর ভিতর পড়ছে। ডাইভ দিল রানা, তারপর দ্রুত হাতে হ্যাচ বন্ধ করে ওটার উপরই শুয়ে থাকল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরেই অনুভব করল ট্র্যাপডোরের কবাট ওকে নিয়ে উঁচু হচ্ছে, ও যেন সোলার মত হালকা। সদ্য তৈরি ফাঁকটা লক্ষ্য করে আরেক প্রস্থ আগুনের শিখা ছুঁড়ল তাপসী। গর্জে উঠে সাড়া দিল জানোয়ার। হ্যাচের ঢাকনিতে আর কোন চাপ নেই।

'জ্বলে-পুড়ে মর্!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। তাপসীর কাঁধ থেকে চেইনটা তুলে নিল ও, তারপর ছুঁড়ে জড়িয়ে নিল কেবল্-এর সঙ্গে। নীচ থেকে ভেসে আসা কাঁচ ভাঙার আওয়াজ বলে দিল তাপসীর পথ অনুসরণ করছে জানোয়ার। 'এসো!' লিঙ্কড্ হল্টারে নিজেকে আটকে নিয়ে তাপসীর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'আমাকে ধরে ঝুলে পড়ো!'

তাপসীর দৃষ্টি রানাকে ছাড়িয়ে গেল, অনেক নীচের জমিনে চোখ বুলিয়ে স্থির হলো বহুদূরের কেবল্ কার স্টেশনের উপর। 'আসছ না কেন! এটাই বাঁচার একমাত্র উপায়!' কিন্তু তারপরেও ইতস্তত করছে তাপসী। তার পিছনে কর্কশ, রোমহর্ষক একটা হুংকার শোনা গেল। কার-এর কিনারা থেকে উপরে উঠে আসছে জানোয়ার। সোজা সামনে ঝাঁপ দিল তাপসী। সারাসরি রানার বুকে পড়ে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল। পায়ের চাপ দিয়ে শূন্যে ভাসল রানা, চেইনের শেষ মাথায় ঝুলছে, ওদের পিছনে পিছিয়ে পড়ছে কেবল্ কার। ভয়ে রানার কানের সামনে চেঁচিয়ে উঠল তাপসী। তার আলিঙ্গনে এত জোর, যেন দেহ থেকে প্রাণ বের করে নেবে। তীব্র বাতাস ছোবল মারছে ওদের কাপড়চোপড়ে, নেমে যাওয়ার গতি প্রতিমুহূর্তে বেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে কেবল্-এর সঙ্গে চেইনের ঘষা খাওয়ার কর্কশ ধাতব ককানি।

রানা অনুভব করল ইস্পাতের লিঙ্কগুলো মাংস কেটে হাড়ে পৌঁছে যেতে চাচ্ছে। মুখ তুলল ও, ভেজা ভেজা চোখে ধরা পড়ল নতুন একটা আতঙ্কের উৎস। কখন থেকে কে জানে, কেবল কারটাও ওদের পিছু নিয়ে নামতে শুরু করেছে। কন্ট্রোলরুমে যে-ই থাকুক, কী ঘটছে দেখতে পেয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওদেরকে পালাতে দেওয়া যাবে না। কারটা যদি ওদের নাগাল পেয়ে যায়, জানোয়ারের হাতে ধরা পড়বার আগেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে থেঁতলে যাবে দুটো শরীর। কারটা আসছেও তীরবেগে। দূরত্ব কমে আসায় তার থেকে নতুন একটা খপ্‌খপ্ আওয়াজ বেরুচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে নীচে, বটম স্টেশনের দিকে তাকাল রানা। ওটা এখন এত কাছে চলে এসেছে যে কন্ট্রোলের ভিতর দাঁড়ানো লোকটার আকৃতি পরিষ্কার চেনা

যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে লোকজন হাত তুলছে আকাশের দিকে। ওদের পিছনে জানোয়ার তার হিংস্র মুখ কাঁচের গায়ে চেপে ধরেছে, ব্যগ্র হয়ে সংঘর্ষ ঘটবার অপেক্ষায় আছে সে।

রানা দেখল সবুজে ঢাকা পাহাড়ের গা ছোট-বড় ধাপ তৈরি করে নেমে যাচ্ছে। তাপসীর কানের কাছে চিৎকার করল ও, 'তোমাকে লাফ দিতে হবে!' তাপসীর আলিঙ্গনে এতটুকু ঢিল পড়ল না। 'এখন!' তারগুলো আর্তনাদ করছে, নীচের জমিন যেন বহুবর্ণ কাঁচের সমষ্টি। নিজের গা থেকে তাপসীকে ছাড়াল রানা, তারপর তাকে খসে পড়তে দিল। হাতের মাংসে এত গভীরে দেবে গেছে চেইন, নিজেকে কোনমতে মুক্ত করতে পারছে না ও। কংক্রিটের গহ্বর বিশ ফুট দূরে থাকতে বাতাস বিরতিহীন খামচাচ্ছে, সেটা অগ্রাহ্য করে শরীরটাকে মোচড়াল রানা। নিজেকে মুক্ত করতে যা দেরি, ঝপ করে খসে পড়ল নীচে।

পা দুটো প্রায় খাড়া ঢালে ধাক্কা খেলো। একটা কাঁধ পড়ল নালার পাশে। পাঁচ-সাতটা গড়ান দিয়ে বেত গাছের গোড়ায় স্থির হলো শরীর, পিছু নিয়ে নেমে আসছে ছোট ছোট পাথরের একটা সরু ধস। উপর দিক থেকে ভেসে এল প্রচণ্ড সংঘর্ষের আওয়াজ, যেন বিরাট বড় একটা বাড়ি অনেকক্ষণ ধরে ভেঙে পড়ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে আরেকটা ধস নামল। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে ইঁট আর কংক্রিটের ভাঙা টুকরোও নেমে আসছে। কী ঘটেছে আন্দাজ করতে পেরে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল রানা। মাত্র একটা কেবলে ঝুলে থাকায় জানোয়ারকে নিয়ে কারটা থামতে ব্যর্থ হয়, সরাসরি ছুটে এসে ধাক্কা খেয়েছে স্টেশনে। যে-কোন সাধারণ মানুষ এরকম একটা আঘাতে নির্ঘাত মারা যাবে, কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে রানা জানে জানোয়ারের তেমন কিছু হবে না।

'রানা!' খানিক দূরের প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা থেকে ভেসে এল আওয়াজটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে ডান পাঁজরের খাঁচায় বেশ জোরালো একটা ব্যথা অনুভব করল রানা।

'এদিকে।' আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে উঠে বসেছে রানা, এই সময় বেতঝাড়টাকে ঘুরে ওর পাশে চলে এল তাপসী। কাছাকাছি আসতেই চোখ পড়ল ডিনার জ্যাকেটের ছেঁড়া ল্যাপেলে চেপে থাকা হাতটার উপর।

'রানা! তোমার কিছু ভেঙেছে?'

ম্লান একটু হাসল রানা। মাথা নেড়ে দু'হাত বাড়িয়ে সিধে হতে যাবে, হঠাৎ দেখল ওগুলোর ভিতর সেঁধিয়ে গেছে তাপসী। ওর মুখে মুখ রাখল মেয়েটা—উষ্ণ, ভেজা আর ভরাট। ব্যাপারটা রানা উপভোগ করল ঠিকই, তবে একটু পরই মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিল। 'এটা কী জন্যে?'

তাপসীর চোখে কীসের যেন আলো জ্বলছে। 'আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।'

'সুযোগ করে দিয়ো, আমি তোমাকে বারবার বাঁচাতে চাই।' পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আবার ওরা চুমো খাচ্ছে, এই সময় ছুটে আসা অ্যামবুলেন্সের আওয়াজ ভেসে এল। পরস্পরকে ছেড়ে দিল ওরা, অ্যামবুলেন্সের আওয়াজও

থামল। 'ব্রাজিলে শুনেছি প্রাইভেট অ্যামবুলেন্স সার্ভিস খুব ভাল,' বলল রানা। আরেকটা চুমো খাওয়ার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকতে যাবে, দেখল ব্যথায় মুখ কোঁচকাল তাপসী। 'কী ব্যাপার?'

আবার মুখ কোঁচকাল তাপসী। 'বড় লাগছে গো।'

'কোথায়?'

'গোড়ালিতে।'

'কই, দেখতে দাও আমাকে।' সহানুভূতি জানিয়ে তাপসীর একটা হাতে মৃদু চাপ দিল রানা, তারপর পিছু হটল।

নিজেকে শক্ত করল তাপসী, মুখ তুলে আকাশে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড পর তার চোখ আবার মাটিতে ফিরে এল। 'ওটা আমার গোড়ালি নয়, রানা।'

তাপসীর গা বেয়ে উঠে এসে, তাকে নিজের বাহুর ভিতর টেনে নিল রানা। দু'জোড়া ঠোঁট পরস্পরকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। 'তুমি এত খুঁটিনাটি বিষয় খেয়াল করো কেন!' ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে নিজেদেরকে নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা। নতুন করে কিছু নুড়ি পাথর গড়াতে শুরু করল, পাহাড়ের গা বেয়ে কেউ একজন নামছে। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল রানা, দেখল স্বাস্থ্যবান দু'জন লোক একটা ভাঁজ করা স্ট্রেচার বয়ে আনছে। সাদা টিউনিক আর ট্রাউজার পরে আছে তারা। মনে মনে আরেকবার ব্রাজিলিয়ান হেলথ সার্ভিসের প্রশংসা করল রানা। দু'জনের মধ্যে মোটাসোটা লোকটা ওর পাশে দাঁড়িয়ে স্ট্রেচারের ভাঁজ খুলতে শুরু করল।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আমাদের কোন অ্যামবুলেন্স সার্ভিস দরকার নেই। আমরা সুস্থ আছি।'

লোকটা হাসিহাসি মুখ করে রানার দিকে ঝুঁকল। 'না, তোমরা সুস্থ নও।' স্ট্রেচারের একটা হাতল অকস্মাৎ মুগুর হয়ে গেল, রানাও বিয়্যাক্ট করতে দেরি করে ফেলল। কপালের পাশে লাগল বাড়িটা। এক পলকে নিভে গেল সব আলো।

এগারো

চোখের সামনে অস্পষ্ট ধূসরতা। হঠাৎ সেখানে একটা মুখ হাজির হলো, অসমতল রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকি খাওয়ার সঙ্গে তাল বজায় রেখে উঁচু-নিচু হচ্ছে। সাদা পরিচ্ছদ চিনতে পারল রানা, পাহাড়ের গায়ে এই লোকটাই ওকে মেরেছিল। আবার চোখ বুজে হাত দুটো নাড়বার চেষ্টা করল। কর্ড দিয়ে বাঁধা ওগুলো, পড়ে আছে পেটের উপর। পা দুটো মনে হলো ঢিল করে বাঁধা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। হাতের উপর কীসের যেন চাপ। চোখ মেলে দেখল বুকে জড়ানো দ্বিতীয় একটা স্ট্র্যাপ স্ট্রেচারের সঙ্গে আটকে রেখেছে ওকে।

একটা অ্যামবুলেন্সের পিছন দিকে রয়েছে ও, পাশের স্ট্রেচারে একই ভাবে

বেঁধে রাখা হয়েছে তাপসীকে। ওদের মাঝখানে, দরজার দিকে পিছন ফিরে, বসে রয়েছে মোটাসোটা গার্ড। লোকটার চোখ দুটো অসম্ভব লাল, কোটরের কিনারায় এমনভাবে বেরিয়ে আছে যে, মনে হচ্ছে পরবর্তী ঝাঁকিতেই খসে পড়বে। আবার হাত দুটো আলাদা করতে চাইল রানা, কিন্তু পারল না। যে-ই ওকে বেঁধে থাকুক, কাজটায় কোন খুঁত রাখেনি।

রানা দেখল তাপসীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে ঠোঁট চুষল গার্ড। লোকটা কী ভাবছে জানে ও। মাথাটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে মুখের ভাব দেখে বুঝল তাপসীও জানে। তার চোখ দুটো ভয় আর আশঙ্কায় বড় বড় হয়ে আছে।

অজ্ঞান হয়ে থাকবার ভান করে কোন লাভ নেই বুঝতে পেরে চোখ দুটো ভাল করে মেলল রানা। কপালের একটা পাশ ব্যথায় দপ্‌দপ্‌ করছে।

বাঙ্কগুলোর পাশের একটা পকেটে হাত গলাল গার্ড। সরু একটা লেদার কেস বেরুল। ক্লিক করে শব্দের সঙ্গে খুলে গেল সেটা। ভিতরে হাত ভরে লম্বা ব্লেডের একটা স্ক্যাল্‌প্‌ল্‌ বের করল। তাপসীকে শিউরে উঠতে দেখল রানা।

'সাবধান, কেটে যাবে!'

রানার উদ্দেশ্য ছিল লোকটার মনোযোগ নিজের দিকে ফেরানো, কিন্তু সেটা পূরণ হলো না। মারমুখো ভঙ্গিতে ওর দিকে একবার তাকাল বটে লোকটা, কিন্তু তারপরই স্ক্যালপলের ধার পরীক্ষা করে আবার তাপসীর দিকে মনোযোগ দিল। মরিয়া হয়ে নিজের চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে রানা। ওর পায়ের ঠিক উপর দিকে, দরজার কোণে, খাড়া করে ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে একটা ফায়ার এক্সটিংগুইসার। ও ভাবছে, পা দিয়ে কি ওটার নাগাল পাওয়া যাবে?

চকচকে ঠোঁট জোড়াকে আরেকবার গোসল করিয়ে তাপসীর দিকে ঝুঁকল গার্ড, লম্বা করা হাতে ক্ষুরের মত ধারাল স্ক্যাল্‌পেল্‌টা ধরে আছে। মাথাটা ঝট করে ঘুরিয়ে নিল তাপসী, আতঙ্কে গোটা শরীর লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তার ইভনিং গাউনের একটা স্ট্র্যাপের নীচে ঢুকে গেল ব্লেড, তারপর এক টানে ঘ্যাঁচ করে কেটে ফেলল।

নিজের শরীর সামনের দিকে ঝাঁকি খাওয়াল রানা, হাঁটু ভাঁজ করে স্ট্র্যাপমুক্ত করল পা, তারপর উপরদিকে লাথি চালাল। ফায়ার এক্সটিংগুইশারের গোড়ায় আঘাত করল একটা পায়ের আঙুল, সেই সঙ্গে প্লাঞ্জার নিচু হয়ে গেল। ডিম ভাঙার মত শব্দ করে অকস্মাৎ উথলানোর ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল রাশি রাশি ফোম, সিলিঙে বাড়ি খেয়ে ঝরে পড়ল সবার শরীর ও মাথার উপর। কী ঘটেছে দেখবার জন্য ঝট করে ঘুরে বসল গার্ড। তারপর, ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে, আবার ঘুরল সে। ঘুরে শুধু এইটুকু দেখবার সুযোগ পেল–রানার লাথি তার মুখে লাগতে যাচ্ছে।

রানার পা তার চোয়ালের পাশে লাগল। ছিটকে দরজার গায়ে পড়ল মোটাসোটা লোকটা, হাতের স্ক্যাল্‌পেল্‌ ফেলে দিল মেঝেতে। হড়কে তাপসীর দিকে চলে যাচ্ছে ওটা। নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে ইতোমধ্যে স্ট্র্যাপের ভিতর

থেকে একটা হাত বের করে ফেলেছে তাপসী, শরীরটাকে মুচড়ে ওটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল। আঙুল দিয়ে টেনে এনে হাতলটা মুঠোয় ভরল, তারপর মেঝে থেকে তুলে ঝট করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

কর্ড দিয়ে বাঁধা হাত দুটো সামনে ঠেলে দিল রানা। ঘ্যাচ্-ঘ্যাচ্ করে দু'বার ঘষা দিতেই কেটে গেল কর্ড। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার তাপসীর দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছে গার্ড, স্ট্র্যাপমুক্ত হয়ে তার ঘাড়ের পাশে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। ঠিক সেই মুহূর্তে গর্তে পড়ে বড় একটা ঝাঁকি খেলো অ্যামবুলেন্স। রানাকে সঙ্গে নিয়ে স্ট্রেচারে পড়ল গার্ড, সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে দরজার দিকে ছুটল স্ট্রেচার। তারপর কীভাবে কী ঘটল বলা মুশকিল, হঠাৎ দেখা গেল অ্যামবুলেন্সের দরজা খুলে গেছে।

তাপসীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। গার্ড আর রানাকে নিয়ে অ্যামবুলেন্স থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল স্ট্রেচার। চারদিকে ধুলোর মেঘ। সংঘর্ষ ঘটবার মুহূর্তে রানা অনুভব করল গার্ডের ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। নিজেকে এক পাশে গড়িয়ে দিল ও, থামল কাঁচা রাস্তার কিনারায় পৌঁছে। ধীরে ধীরে সিধে হওয়ার পর দেখল অ্যামবুলেন্স চলে গেছে, স্ট্রেচারটাও আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ধুলোর মেঘ সরে যাচ্ছে দেখে ইতস্তত ভঙ্গিতে কয়েক পা এগোল ও। একটা পাহাড়ের ঢালু গা দেখা যাচ্ছে, নেমে গেছে বাম দিকে। ঢালের গায়ে মেইন রোড। রোডের উল্টোদিকে ব্রাজিলিয়ান এয়ারওয়েজের বিশাল এক সাইনবোর্ড। ওটার নীচে পড়ে রয়েছে স্ট্রেচারটা। মোটাসোটা লোকটার বাঁকা ঘাড় দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সে মারা গেছে।

রাজধানী ব্রাসিলিয়ার মাঝখানে তিনতলা অফিস বিল্ডিঙের গ্রাউন্ডফ্লোরে রানা এজেন্সির শাখা অফিস। প্রথমে একটা কমপিউটর সফটওয়্যারের দোকান, তার পিছনে ইনভেস্টিগেটিভ গবেষণা ও কাজকর্ম চলে। আগেই টেলিফোন করেছে রানা, তাই শাখা প্রধান শাওন চৌধুরী ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দোকানে বেরিয়ে এসে অপেক্ষা করছে।

খানিকটা পথ বাকি থাকতে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ফুটপাথ ধরে হেঁটে আসছে রানা, রাস্তা পেরুবার সময় দেখে নিল দোকানের ভিতর এই মুহূর্তে কোন খদ্দের নেই। সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে শাওনের বাড়িয়ে ধরা হাতটা ধরল। 'আমাদের সৌভাগ্য, মাসুদ ভাই, কতদিন পর আবার আপনাকে পেলাম। আসুন, সোহেল ভাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন...'

পথ দেখিয়ে কাউন্টারের ভিতর, তারপর পিছনের একটা দরজা দিয়ে রানাকে প্যাসেজে বের করে আনল শাওন। সোহেল ওর জন্য অপেক্ষা করছে শেষ মাথার একটা কামরায়। 'তাপসীর কোন খবর পেলি?' ঘরে ঢুকেই জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'নাসার লোকজনও তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না।

নিশ্চয়ই কোথাও আটকে রাখা হয়েছে।'

কিংবা হয়তো মেরেই ফেলেছে, ভাবল রানা। 'আর লাম্বাডা ওরফে কবীর চৌধুরী?'

'সে গা ঢাকা দিয়েছে। ভেনিস ছেড়ে চলে গেলেও কেউ বলতে পারছে না কোথায় গেছে। কীভাবে ভেনিস ত্যাগ করল, এটাও আমাদের কাছে একটা রহস্য।'

'তাকে কিন্তু বেশি সময় দেয়া যাবে না, সোহেল,' কামরার ভিতর হঠাৎ পায়চারি শুরু করে বলল রানা। 'সময় পেলে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে...'

'ভয়ঙ্কর বলতে কী বোঝাতে চাস? তোর হাতে কোন প্রমাণ আছে? অফিশিয়ালি এখনও আমরা এমন কিছু পাইনি যে তাকে কবীর চৌধুরী বলে প্রমাণ করা যাবে। এমনকী পক্ষিরাজের নিখোঁজ হওয়ার জন্যেও আমরা তাকে দায়ী করতে পারছি না। তা ছাড়া, নিজের শাটল কেন সে চুরি করবে?'

পায়চারি থামিয়ে ভুরু কোঁচকাল রানা। 'এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। তবে সে যে মারাত্মক একটা কিছু করতে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারছি।'

'দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের হাড় কোন আদালতে এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না,' শুকনো গলায় বলল সোহেল। ডেস্কে বসেই একটা কমপিউটর অন করল রিমোট-এর সাহায্যে, তারপর খালি একটা চেয়ার দেখাল রানাকে। ওকে পৌঁছে দিয়ে আগেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে শাওন।

'ভেনিসে বসকে তুই যে কাঁচের ফায়ালটা দিয়েছিলি, সেটার কথা বলি। ওটা অ্যানালাইজ করা হয়েছে। তোর ডায়াগনোসিস একশো ভাগ ঠিক ছিল। জিনিসটা হাইলি টক্সিক নার্ভ গ্যাস, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু ডেকে আনে। কিন্তু—এটা রীতিমত হতবুদ্ধিকর—বহুবার এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে, প্রতিটিতে দেখা গেছে যে গাছপালা বা পশু-পাখিদের ওপর এটার কোন প্রভাব পড়ে না।'

তথ্যটা হজম করতে গিয়ে রানার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। 'ফর্মুলা সম্পর্কে বল।'

কমপ্যাক্ট ডিস্ক ট্রের দিকে হাত বাড়াল সোহেল। একটু পরই স্ক্রীনে একটা ফর্মুলার ছবি ফুটে উঠল। অপলক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড দেখল রানা। কেমিকেল সিম্বল বেশিরভাগই ওর জন্য কোন অর্থ বহন করে না। দুটো শব্দও অত্যন্ত বেখাপ্পা আর বেমানান লাগল। 'Orchidaceae negra?' নিশ্চিত হওয়ার জন্য সোহেলের দিকে তাকাল রানা। 'ওটা কি সত্যিই কোনও ধরনের অর্কিড?'

সোহেল মাথা ঝাঁকাল। 'অত্যন্ত বিরল প্রজাতির। একসময় মেক্সিকোর ইউকাটান পেনিনসূলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সবার ধারণা ছিল এই অর্কিড চিরকালের জন্যে দুনিয়ার বুক থেকে হারিয়ে গেছে। তারপর একজন মিশনারি আমাজোকো-র উজান থেকে একটা নিয়ে আসেন...'

'ইউকাটান পেনিনসূলা থেকে অনেক দূরে জায়গাটা,' মন্তব্য করল রানা।

'হ্যাঁ।' চেয়ার ছেড়ে ওয়াল ম্যাপের দিকে এগোল সোহেল। নীল পেন্সিল দিয়ে একটা এলাকার উপর বৃত্ত আঁকল।

ম্যাপটা পরীক্ষা করল রানা, বিশেষ করে লক্ষ করল কী কঠিন সব বাধা টপকে নিজের পথ করে নিয়েছে নদীটা। 'তাহলে সারা দুনিয়ায় এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে এই বিশেষ নার্ভ গ্যাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?'

'হ্যাঁ, আমরা অন্তত সেটাই জানতে পেরেছি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'সান পেট্রো এয়ারপোর্ট থেকে কার্গো প্লেনগুলো কোথায় গেছে আমরা কী তা জানি? খাতায় তো ওগুলোর গন্তব্য লেখা থাকবার কথা।'

'গন্তব্য লেখা আছে শুধু দুটো প্লেনের। একটা গেছে বাহিয়া, আরেকটা রেসিফে। লাম্বাডা বা কবীর চৌধুরীর মিল-কারখানায় ওভারহল ইকুইপমেন্ট আর মেইন্টেন্যান্স টীম নিয়ে গেছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

'তাপসী ছ'টা প্লেনকে টেক-অফ করতে দেখেছে।'

'তার কোন রেকর্ড নেই, রানা। প্লেনগুলো, সংখ্যায় যাই হোক, এই মুহূর্তে ব্রাজিলের যে-কোন প্রান্তে থাকতে পারে। কোন সিভিল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড না করলেও চলবে ওগুলোর। জঙ্গলের ভিতর লগিং ক্যাম্প আর মাইনিং অপারেশনকে সাহায্য করবার জন্যে ভূরি ভূরি স্ট্রিপ রয়েছে।'

ম্যাপে আঁকা নীল বৃত্তটার দিকে আবার চোখ সরু করে তাকাল রানা। 'তাহলে এটাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ভাল করে দেখে নিতে হয়।'

'হ্যাঁ, আমাদের তাই ধারণা,' বলল সোহেল।

পরদিন প্রয়োজনীয় রসদ সহ একটা মোটর লঞ্চ নিয়ে একাই রওনা হয়ে গেল রানা। লঞ্চটায় রানা এজেন্সির এক্সপার্টরা কিছু কারিগরি ফলিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওর দু'হাতের কয়েকটা নখে ম্যাচ করা রঙের আবরণও লাগিয়ে দিয়েছে তারা।

উজানের দিকে নদীর রঙ কাদার মত, লতানো আগাছায় মোড়া গাছপালা ভিড় করে আছে পারে, ঝুরিগুলো পানির উপর সাপের মত ঝুলছে। হাজার হাজার অদৃশ্য পাখির চেঁচামেচি শুনতে খারাপ লাগছে না। তবে মনে ভয় ধরিয়ে দেয় ঝাঁক ঝাঁক মশার গুঞ্জন। তারপর গাছগুলো কাছে সরে এল। এক সময় রানার অনুভূতি হলো, ও যেন সরু একটা ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে কোন নালার ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে। সূর্য হারিয়ে গেল। ভর দুপুরে নেমে এসেছে গাঢ় ছায়া। যতই এগোচ্ছে মোটর লঞ্চ, ততই পিছিয়ে পড়ছে সভ্যতা। অচেনা অরণ্যের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে রানা।

মশা ছাড়াও আরও অন্যান্য পোকামাকড়ের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে, একই সঙ্গে লঞ্চ চালাতে হচ্ছে ভাটির দিকে ভেসে আসা বনভূমির রাশি রাশি আবর্জনা এড়িয়ে। নদী আরও সরু হয়ে গেল। রাত নামার পর হেডল্যাম্পের আলোয় মনে হলো সামনের টানেল এত লম্বা যে এই চলা কোনদিন থামবে না। রানা তরী

ভিড়াল তীর থেকে খানিকটা দূরে। নিজের সঙ্গে আধ মিনিট তর্ক করে সিদ্ধান্ত নিল বাতাসবিহীন কেবিনের বদলে খোলা ডেকে ঘুমাবে।

মশারির নীচে শুয়ে মশাদের গান শুনছে রানা। পানির ছলাত-ছলাত, সরীসৃপের খসখস, খুদে ডানা ঝাপটানোর গুঞ্জন, শিকারে বেরুনো পেঁচার কর্কশ চিৎকার–এমন কনসার্ট সহজে শোনার সুযোগ হয় না। প্রকৃতি নিজেই যেন উদরপূর্তিতে ব্যস্ত। ধারাল দাঁত নরম মাংসে ডুবে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ, সব সময় সজাগ, যে-কোন মুহূর্তে চলে আসবে আরও বড়, আরও ধারাল দাঁত। যে শব্দ দিয়ে প্রকৃতি তার নিষ্ঠুর ভারসাম্য বজায় রাখছে, সেই একই শব্দ ঘুমপাড়ানির কাজ করল রানার জন্য।

শীত-শীত ভাব নিয়ে ঘুম ভাঙবার পর পানিতে কুয়াশা দেখতে পেল রানা। যেন গাছপালার ওপাশে কোথাও একটু পরই ভোর হবে বা হচ্ছে। একজোড়া অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া ট্যাবলেট খেলো দু'ঢোক হুইস্কির সঙ্গে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে আবার উজানে রওনা হলো ও।

খানিক পরই জরুরী একটা সিদ্ধান্তে আসবার প্রয়োজন হলো। সামনে নদীটা একটা সবুজ দ্বীপের দু'পাশ দিয়ে বইছে। দুটো আলাদা চ্যানেল, দুটোরই মাথার উপর গায়ে-গায়ে লেগে থাকা ডালপালা শামিয়ানার মত ঝুলে আছে। একটাও কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না, না দিচ্ছে কোনরকম হাতছানি। রাত নামবার পর ভুলে কোন বাঁক এড়িয়ে যায়নি তো? নামকাওয়াস্তে চার্টটা একবার পরীক্ষা করল, কম্পাস বের করে বিয়ারিংও নিল। যে চ্যানেলের পানিতে আগাছা কম সেটায় ঢুকল রানা লঞ্চ নিয়ে। এ পথ দিয়ে কেউ অন্তত সম্প্রতি গেছে।

একটু পরেই দম আটকে আসার অবস্থা হলো ওর। চারপাশ আর উপর দিক থেকে চেপে আসছে ডালপালা। অনেকক্ষণ হলো সকাল হয়েছে, কিন্তু আলোয় এতটুকু উজ্জ্বলতা নেই। বাতাসে পচা পাতার গন্ধ। আতঙ্কিত না হয়ে চিন্তা করতে চাইছে রানা: সভ্য জগতে ফিরে যাওয়াটা এখন কত কঠিন? প্রতি একশো গজ এগিয়ে পিছন ফিরে তাকানোটা আভাসে পরিণত করল, স্মরণযোগ্য কোন ল্যান্ড মার্ক দেখতে পাবে এই আশায়। তবে এক ঘণ্টা পর বুঝল, এ স্রেফ সময়ের অপচয়। আগাছা আর নলখাগড়ার ভিতর খোলা এক ফালি জল দেখতে হুবহু আগেরটার মতই।

পুরো আধবেলা প্রাকৃতিক দৃশ্যে কোন পরিবর্তন ঘটল না। তারপর বাঁক ঘুরে আঁকাবাঁকা আরেক সরু নদীতে চলে এল লঞ্চ। এবার গাছের গায়ে কিছু ফাঁক চোখে পড়ল, দেখা গেল নদীর সমান্তরাল রেখা ধরে আরেকটা জলপথ এগিয়ে চলেছে। দিনের আভা গাঢ় কালোয় পরিণত হওয়ার সময় ওই দ্বিতীয় জলপথে চলে এল লঞ্চ। দ্বিতীয় রাতটা ঝম-ঝম বৃষ্টির কারণে কেবিনে ঘুমাতে বাধ্য হলো রানা।

পরদিন জঙ্গলে ঢুকবার পর এই প্রথম আদম সন্তানের দেখা পাওয়া গেল। বৃষ্টি ছেড়ে গেছে, দূর হয়েছে গাঢ় কালিমা, উজানের দিকে মুখ করে ইঞ্জিন স্টার্ট

দিল রানা। একটু পরেই দেখল একটা ক্যানু এগিয়ে আসছে। ক্যানুটায় বসে আছে পাঁচজন খুদে মানুষ। প্রায় লিলিপুটিয়ানই বলা যায়। পরিচ্ছদ বলতে নাভির নীচে এক ফালি করে ন্যাকড়া। প্রত্যেকের হাতে বল্লম দেখা যাচ্ছে। লঞ্চটা দেখামাত্র ঝট করে বল্লম নামিয়ে বৈঠা তুলে নিল তারা। পানিতে ঘন-ঘন বৈঠা চালিয়ে দ্রুত তীরের দিকে ক্যানুকে সরিয়ে নিল, সেখান থেকে একটা শাখা ধরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

এই ঘটনার পর রানার মনে হতে লাগল, আড়াল থেকে ওর উপর নজর রাখা হচ্ছে। মাঝে-মধ্যে পাখির ডাক শোনা গেল তীরের কোন গাছের ডাল থেকে। দূরে কোন পাখি সেই ডাকে সাড়াও দিল। ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে মনে হলেও, রানার মনে প্রশ্ন জাগল, একটা পাখি কি এত তাড়াতাড়ি সাড়া দেবে–প্রথম ডাকটা থামার সঙ্গে সঙ্গে? তারপর, ঝোপের ভিতর খসখস আওয়াজ। যেন কোন মানুষ মাথা নিচু করে স্থান বদল করছে।

চারদিনের দিন দুপুরবেলা নদী নিঃশেষে হারিয়ে গেল স্পঞ্জের মত নরম বিশাল এক জলাভূমিতে। রানার সমস্ত আশা আর উৎসাহ গোত্তা খেয়ে নীচে নামল। চিহ্নিত করা যায় এমন কোন স্রোত নেই যে অনুসরণ করবে। আর গায়ে গায়ে লেগে থাকা নলখাগড়াগুলো লম্বায় লঞ্চের চেয়ে বেশি উঁচু। সেই ভয়টা আবার ভোগাতে শুরু করল, কোথাও হয়তো ভুল বাঁক ঘুরেছে ও। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে গেলে কেউ হয়তো ফেরে না। ফুয়েলের অবস্থা সংকটে ফেলে দেবে।

এগোবার সময় কম্পাস ছাড়া আর কিছুর সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। ওর আনুমানিক হিসেব বলছে, সোহেলের চিহ্নিত জায়গায় পৌঁছে গেছে লঞ্চ। তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলবার উপায় নেই। মূল বা প্রধান নদী ত্যাগ করবার সময় শেষবার রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করেছে ও। এখন ওর ধারণা সেট আবার অন করাটা মারাত্মক বোকামি হবে। এদিকে কোথাও যদি কবীর চৌধুরীর আস্তানা বা ঘাঁটি থাকে, যে-কোন রেডিও সিগনাল ইন্টারসেপ্ট করবার ব্যবস্থাও থাকবার কথা।

নলখাগড়ার প্রায় নিশ্ছিদ্র পাঁচিল ভেঙে এক ঘণ্টা এগোবার পর সামনের জলপথ খুলে গেল, মাথায় সাদা পালক নিয়ে রাশি রাশি বেত গাছ দাঁড়িয়ে আছে। পালক মানে শুধু পালক নয়, ওগুলো আসলে রক্ত-মাংসের বক। তারপর নদীর আকৃতি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো, দুই পারে গাছ আর ঝোপ। এদিকের পানিতে ঝাঁক-ঝাঁক হাঁস ভাসছে। লঞ্চ আসতে দেখে আকাশ ঢেকে উড়তে শুরু করল। রানার মন খারাপ, ভাবল, ওগুলোই না শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেয় আমাকে। ইঞ্জিনের স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা, সামনে পানির বিস্তার দেখে মনে হলো বড়সড় একটা লেকে পড়তে যাচ্ছে লঞ্চ।

দশ মিনিট পর নলখাগড়া আর আগাছা দূরে সরে গেল। এদিকে পানির উপরটা মসৃণ, মাছেরা লাফালাফি করছে। কিন্তু কোন হাঁস বা পাখি নেই। রানা ভাবল, কেন? এখানে কী এমন আছে যা দেখে ভয় পেয়েছে ওগুলো? উত্তর এল

ঠিক বো-র সামনে পানির আকস্মিক উত্থান থেকে। মুহূর্তের জন্য বড় কোন মাছ বা কুমির বলে সন্দেহ করল রানা। ভুল ভাঙল বাতাস কাটবার আওয়াজে। ওকে লক্ষ্য করে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে। দ্বিতীয় শেলটা বিস্ফোরিত হলো লঞ্চের পিছন দিকে, পানিতে। আত্মরক্ষার জন্য বন-বন করে হুইল ঘুরিয়ে নলখাগড়ার দিকে লঞ্চ ছোটাল রানা।

বো পানি থেকে উপরে উঠে আছে, ওটা একটা হাই-পাওয়ারড্ স্পীডবোট, মুহুর্মুহুঃ কামান দেগে ছুটে আসছে সরাসরি। হঠাৎ থমকে গেল রানা। দু'পাশ থেকে আরও দুটো বোট ওর দিকে ছুটে আসছে। লঞ্চের চারপাশে গোলা পড়ায় পানি টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। আবার লঞ্চ ঘুরিয়ে লেকটা আড়াআড়িভাবে পেরুচ্ছে রানা। গাছপালার মাঝখানে একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে, সেটাকেই টার্গেট করল।

ওকে ধাওয়া করছে তিনটে স্পীডবোট, প্রথমটা বাকি দুটোর চেয়ে একটু এগিয়ে আছে। এই লঞ্চটা সোহেলের তদারকিতে রানা এজেন্সির এজেন্টরা সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছে, রানা যাতে যে-কোন সঙ্কট একাই সামাল দিতে পারে। একটা বোতামে চাপ দিল ও। লঞ্চের পিছনে ঘটাং করে একটা আওয়াজ হলো। এর মানে হলো দুটো রিলিজ চেম্বার খুলে গেছে। বোতামে আরেকটু চাপ বাড়াতে ডেপথ-চার্জের মত সিলিন্ডার আকৃতির একজোড়া বস্তু বিশ গজ ব্যবধানে সারফেসে ভেসে থাকবার জন্য বেরিয়ে গেল সদ্য খোলা চেম্বার থেকে।

প্রথম স্পীডবোট ওগুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটে আসবে। হেলমসম্যান মাইন বলে ধরে নিয়েছে, ধাক্কা লাগলে বিস্ফোরিত হবে। তার ধারণা নির্ভুল, তবে পুরোপুরি নয়। এগুলো মাইনই, তবে ম্যাগনেটিক। স্পীডবোট যেই মাঝখানে চলে এল অমনি ওগুলো মাছের মত লাফ দিয়ে আটকে গেল খোলের গায়ে। বিস্ফোরণ ঘটল এক মুহূর্ত পর। কমলা আর হলুদ সগর্জন শিখা ছাড়া দেখবার মত তেমন কিছু থাকল না।

লেক থেকে নদীতে চলে এল লঞ্চ। দুটো স্পীডবোট এখনও ধাওয়া করছে রানাকে। কামানের গোলা নিয়মিতই এসে পড়ছে আশপাশের পানিতে। বোতাম টিপে এবার একটা টর্পেডো রিলিজ করল রানা। চুরুট আকৃতির টর্পেডো পানিতে মাথা তুলে শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শোঁকার ভঙ্গিতে স্পীডবোটকে ধাওয়া করল। হেলসমসম্যান বিপদ টের পেয়ে দিক বদলে পালাবার চেষ্টা করেও পারল না। একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে বোটের নাগাল পেয়ে গেল টর্পেডো। আগুনের আরও একটা স্তম্ভ তৈরি হলো নদীর বুকে।

তৃতীয় বোটটা পিছিয়ে পড়ছে, রণেভঙ্গ দেওয়াই মতলব। কিন্তু বিধি বিমুখ। অপ্রত্যাশিত একটা বিপদ দেখা দিয়েছে। একা শুধু স্পীডবোট নয়, ভুগছে লঞ্চটাও। সামনে থাকায় রানার বিপদই বরং বেশি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, নদী টানছে ওদেরকে। যেমন-তেমন নয়, এ যাকে বলে মহা টান। এত প্রবল স্রোত কল্পনাও করা যায় না।

সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর একটা গর্জন। টানটা যেন রাশি রাশি জলের জন্যও মাত্রা ছাড়ানো, ফলে এলোমেলো ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে। স্পীডবোট উল্টে গেল, সম্ভবত আকারে ছোট বলে। গর্জনটা হয়ে উঠল অত্যাচার, কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে। তারপর হঠাৎ মসৃণ হয়ে গেল নদীর সারফেস, ঠিক খাদের কিনারা থেকে নীচে লাফ দেওয়ার আগে।

পতনের সময় খাদের তলাটা রানা দেখতে পেল না, কারণ জলপ্রপাতের নীচের অংশটা পুরোপুরি কুয়াশায় ঢাকা।

বারো

পতনের সময় লঞ্চটা ওকে ত্যাগ করল। ওটার পিছু নিয়ে নামছে রানা, নিজেকে জানিয়ে রাখল–তুমি মারা যাচ্ছ। তবে মৃত্যু সহজে আসবে না, তার আগে অনেক ব্যথা আর কষ্ট পেতে হবে।

মানসিকভাবে প্রস্তুতি থাকায় ব্যথা বা অসুবিধেগুলো ভোগাতে পারছে না। একবার মনে হলো বুদ্বুদের রাজ্যে রয়েছে। তারপর ভাবল বরফের তৈরি নির্জন একটা ঘরে শুয়ে আছে। এক সময় এ-ও মনে হলো, সে মারা গেছে। তারপর জ্ঞান হারাল।

ঝম-ঝম বৃষ্টির মধ্যে জ্ঞান ফিরবার পর চোখ মেলে দেখল, আকাশ ছোঁয়া পাহাড় প্রাচীর ওকে ঘিরে রেখেছে। নদী সগর্জনে বয়ে চলেছে একটা গভীর গিরিখাদের ভিতর দিয়ে। আরেক দিকে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠছে রানার চোখ–হঠাৎ ওগুলো সরু হয়ে গেল। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে দৃশ্যটা দেখতে পেল, এক কথায় অসম্ভব।

প্রকাণ্ড একটা রঙধনু নিষ্প্রভ হয়ে মুছে যেতে শুরু করেছে; সেটার একদিকের গোড়ায়, একটা পাথরের মাথায়, দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দরী একটা মেয়ে। লম্বা, সবুজ একটা রোব পরে আছে মেয়েটা, কোমরের কাছে চেরা। মাথায় এক ধরনের হেডড্রেস দেখা যাচ্ছে, তাতে ফিতে আর পাখির পালক গোঁজা। রানার দিকে নয়, সে তাকিয়ে আছে নদীর উজান অর্থাৎ জলপ্রপাতের দিকে। রানার শরীর এখনও পানিতে অর্ধেকটা ডোবা, একটা ঢেউ এসে গালে চড় মারতে পুরোপুরি ডাঙায় উঠে এল ও। তারপর আবার যখন তাকাল, দেখল মেয়েটা নেই।

আদৌ ওখানে কোন মেয়ে ছিল কি না সন্দেহ, ভাবল রানা। আহত আর ক্লান্ত একজন মানুষ ভুলভাল দেখতেই পারে। তবে পাহাড়ের ওদিকটাই একমাত্র চড়বার যোগ্য, আশ্রয় পেতে হলে বৃষ্টি মাথায় করে ওখানেই উঠতে হবে ওকে।

কোন রকমে দাঁড়াল রানা। হাড়গোড় ভাঙেনি, বিধাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এক পা, তারপর আরেক পা। বাহ্, দারুণ। ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে গেল। তবে থামল সেই যেখানে মেয়েটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। আশপাশে কেউ কোথাও নেই। তবে কাদার উপর পায়ের ছাপ দেখল রানা। অগভীর একটা নালা নেমে এসেছে পাহাড় চূড়া থেকে, সেটার কিনারা ঘেঁষে আবার উঠতে শুরু করল। দম নেওয়ার জন্য থামল একবার। চারদিকে ঝোপ ছাড়া কিছুই দেখল না। তবে ঝোপের গায়ে গাঢ় একটা ছায়া দেখে এগিয়ে গেল রানা। লতানো কিছু গাছ সরাতেই বেরিয়ে পড়ল গুহার মুখটা।

উত্তেজনায় রানার হার্টবিট বেড়ে গেল। ছোট্ট একটা টর্চ বের করে জ্বালল ও। ভিতরে ঢুকে সাবধানে এগোচ্ছে। না, গুহা নয়, টানেল। মেঝে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। টর্চের অল্প আলোয় শেষ মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। তারপর ধাপ পাওয়া গেল, পাথুরে মাটি কেটে তৈরি করা। ধাপ বেয়ে উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে গেল রানা। বিশ্রাম নিতে তিনবার থামতে হলো। তারপর একটা বাঁক ঘুরে শেষ মাথায় আলোর আভাস দেখতে পেল। সেই আলোয় পরিষ্কার ফুটে আছে একটি নারী মূর্তি। কিন্তু টর্চ নিভিয়ে টানেলের দেয়ালে রানা সেঁটে আসতেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

এরপর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। আলোর বৃত্তটা ক্রমশ বড় আর রোদ ঝলমলে সবুজ হয়ে উঠল। খানিক পরই টানেল থেকে বেরিয়ে এসে রোদের মধ্যে দাঁড়াল ও। ওর উপরে পাহাড়ি ঢাল, সামনে আকাশ ছোঁয়া বনভূমি আর ঘন ঝোপ-ঝাড়। মেয়েটার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও।

সরু একটা পথ ধরে এগোল রানা। পথের উপর যেভাবে আগাছা জন্মেছে, এটা খুব কমই ব্যবহার করা হয়। অদ্ভুত পোশাক পরা মেয়েটা কোত্থেকে এল এখানে? রানার কেন যেন মনে হচ্ছে ওই কস্টিউম আগে কোথাও দেখেছে ও। পথটা একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। লতানো গাছে প্রায় ঢাকা একটা পাথুরে কাঠামোর ভগ্নাবশেষ দেখতে পেল। সন্দেহ নেই এক কালে এখানে একটা দালান ছিল। চারদিকে তাকিয়ে এরকম আরও অনেক পাথর দেখতে পেল রানা।

ও একটা প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষে পৌঁছেছে। উঁচু আর লম্বা পাঁচিল আভাস দিচ্ছে ওদিকে রাজার প্রাসাদ বা দুর্গ ছিল। জঙ্গলের ভিতরও প্রচুর পিলার রয়েছে। ভাঙা দালানগুলোর ভিতর দিয়ে এদিক-ওদিক হেঁটে মেয়েটাকে খুঁজছে রানা। পাঁচ-সাতশো গজ এগিয়ে আরেকটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছাল। গাছপালার ভিতর বিস্ময়কর একটা কাঠামোর আভাস পাওয়া গেল।

রানা উত্তেজিত। ধীরে ধীরে, সাবধানে এগোল। ওর ধারণাই ঠিক। আকাশ ছোঁয়া কাঠামো, একটা পিরামিড। জমিন থেকে একশো ফুট উঁচু, মাথায় ছোট একটা মন্দির। এক প্রস্থ সিঁড়ি উঠে গেছে উপরদিকে, সেই সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় পোজ দেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রহস্যময়ী সেই মেয়েটি। রানার দিকে তাকিয়ে নেই, তবে অঙ্গভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু আছে যে দেখে মনে হয় ওর জন্যই অপেক্ষা করছে।

যেন রানার উপস্থিতি টের পেয়েই একজোড়া পিলারের আড়ালে আবার হারিয়ে গেল মেয়েটা। রানা অস্বস্তি বোধ করছে, তবে একই সঙ্গে অদ্ভুত একটা মোহও পেয়ে বসেছে ওকে। চারদিকে তাকিয়ে কোন মানুষজন দেখতে পাচ্ছে না। পাখিরা ডাকাডাকি করছে। ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এক দল বানর। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবার পর ধীর পায়ে পিরামিডের গোড়ায় এসে দাঁড়াল ও।

সোহেল ওকে ইউকাটানের মায়ান সভ্যতা সম্পর্কে লেকচার দিয়েছিল। পিরামিডটা দেখে সে-সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রানার। তারপর মেয়েটার পরনের ওই পরিচ্ছদ। এ কী সম্ভব যে মায়ানদের একটা দল বাধ্য হয়ে দেশান্তরী হয়েছিল, তারপর চলে এসেছিল সুদূর দক্ষিণে? এমন তো নয় যে বিলুপ্ত বলে ধরে নেওয়া কোন জাতি দক্ষিণ আমেকিার রেইন ফরেস্টে আজও টিকে আছে, আর ঘটনাচক্রে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে রানার?

প্রকাণ্ড আকারের ধাপ বেয়ে উপরে উঠছে রানা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে হাজার হাজার বছর আগে এত বড় আকৃতির পাথর কীভাবে বহন করা হয়েছে। কোন কোন পাথরের ব্লক পাঁচ ফুট উঁচু, বারো ফুট লম্বা। মেয়েটা যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেখানে পৌঁছাল রানা। দুটো পিলারের মাঝখানে একটা প্যাসেজের মুখ দেখা যাচ্ছে, নেমে গেছে পিরামিডের গভীর প্রদেশে। প্রবেশ মুখের দু'পাশে দুটো পাথরে খোদাই করা হয়েছে বল্লম বাগিয়ে ধরা বীর যোদ্ধাদের মূর্তি। পিছনের জঙ্গলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্যাসেজে ঢুকে পড়ল রানা।

ছোট ছোট ধাপ নীচের দিকে নেমে গেছে। অনেক নীচে আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির মাঝামাঝি দূরত্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই সুন্দরী অপরূপা। এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, চোখাচোখি হতে সাদর অভ্যর্থনাসূচক মিষ্টি হাসিতে ভরে তুলল মুখটা। যেন খুব ভাল করে জানে আর কোন রকম আমন্ত্রণ জানাবার প্রয়োজন নেই, ঘুরে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল। পিছু নিল রানা। খাটো টিউনিক আর হেডড্রেস পরা লোকজন সারি সারি হাঁটছে, দু'পাশের দেয়ালে এই একই দৃশ্য আঁকা। ওদের মতই হেডড্রেস পরে রয়েছে মেয়েটা।

একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে আলোর আভা লক্ষ্য করে নেমে এল সে। রানার কেবলই মনে হচ্ছে, ওর চোখের সামনে বিরাট এবং মহৎ কোন রহস্য উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। দেখবার মত যে জিনিসই থাকুক, পিরামিডের একেবারে মধ্যিখানটায় কোথাও থাকবে সেটা। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এল ও, অবাক বিস্ময়ে চারদিকে তাকাল।

প্রথমে রানার মনে হলো, ও একটা ক্যাথেড্রাল-এ রয়েছে। রঙিন কাঁচের বিশাল সব দেয়াল শূন্যে উঠে গেছে, তৈরি করেছে পিরামিডের পিঠ। দেয়ালগুলোর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বনভূমি। ভিতর দিকেও প্রচুর চারা গাছ, পাতাবাহার আর ঝোপ-ঝাড় রয়েছে। ক্রিস্টাল রক উদ্ভাসিত হয়ে আছে, যেন ওগুলোর ভিতর থেকে আলো বেরুচ্ছে। সর্পিল একটা খাল, তার মাঝখানে

রূপালি সেতু ঝুলছে। খিলান আকৃতির ওই সেতুর গোড়ায় রানার জন্য অপেক্ষা করছে মেয়েটা। সেদিকে পা বাড়িয়ে অকস্মাৎ রানার মনে পড়ে গেল আগে কোথায় দেখেছে তাকে। সর্বনাশ! দেখেছে লিলিথ গ্লাস শপে!

মেয়েটা ব্রিজ পেরুতে শুরু করেছিল, হঠাৎ থেমে দেখে নিল রানা অনুসরণ করছে কি না। তার দৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা রানাকে একটা শঙ্কার মধ্যে ফেলে দিল। সেতুর দিকে না গিয়ে খালটাকে এক পাশে রেখে ঘুরপথ ধরল ও। খালের পানি পরিষ্কার, সারফেসের মসৃণতা ভাঙছে দূর প্রান্তে অলস ধারায় নেমে আসা ছোট্ট ঝর্ণার তৈরি মৃদু আলোড়নে। শুধু একজন অ্যালার্মিস্ট সন্দেহ করবে। তবে আয়ুর প্রশ্নে রানা অবশ্যই একজন অ্যালার্মিস্ট।

খালের কিনারা পাথর দিয়ে বাঁধানো, ঝোপ থেকে হঠাৎ ওর সামনের পথে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এল যোয়ান অভ আর্ক আর প্রিন্সেস ডায়ানা। এদেরকে দেখেই চিনতে পারল রানা: প্রথমবার ক্যালিফোর্নিয়ায় দেখেছে, শিক্ষানবিস অ্যাস্ট্রোনট। মেয়ে দুটো হাসি মুখে, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল ওর দিকে, যেন ও কিছু করবে সেই অপেক্ষায় আছে। ঘাড় ফিরিয়ে প্রথম মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। সে এখনও সেতুর উপর। হাসছে সে-ও। অপেক্ষা করছে।

পা ফেলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল কোথাও গোলমাল আছে। ওর পায়ের নীচে পাথরের টুকরোটা কোন কিছুর সঙ্গে আটকানো হয়নি, একটা গর্তের উপর স্প্রিঙ দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সামনে বাড়ার কোন সুযোগ পাওয়া গেল না, পাথরটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে পুলে ফেলে দিল ওকে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল রানা, পরমুহূর্তে হাত বাড়াল পুলের কিনারা লক্ষ্য করে। ও যেন শূন্যে থাকতেই সাঁতার কাটতে শুরু করেছিল।

রানার হাত পাথরে লেগেছে মাত্র, এই সময় ইস্পাতের চাবুকের মত কী যেন একটা ওর বুক পেঁচিয়ে ধরল। হ্যাঁচকা টানে পিছন দিকে টেনে নেওয়া হলো রানাকে। কী ঘটছে পলকের জন্য দেখতে পেল ও। কুৎসিত মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দৈত্যাকার একটা অ্যানাকন্ডা। দক্ষিণ আমেরিকার এই সাপ প্রথমে কামড়ও দেয় না, গিলেও খায় না, শিকারকে পেঁচিয়ে নিয়ে চাপ দিয়ে মারে। এই মুহূর্তে ওটার কয়েল বা কুণ্ডলী রানার বুকে চেপে বসছে। সারফেসের নীচে তলিয়ে যাওয়ার আগে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল রানা। দম নিতে পারছে না ও। যে-কোন মুহূর্তে বুকের খাঁচা ভেঙে যাবে, চটকানো ফুসফুসে গেঁথে যাবে পাঁজরের টুকরো হাড়।

হাত দিয়ে প্যাঁচমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সাপের প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে পেরে উঠছে না। ওর ফুসফুসের বাতাস নিয়মিত ছন্দে চাপ দিয়ে বের করে নেওয়া হচ্ছে। আধ ঢোক পানি খেয়ে ফেলল রানা। আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করছে। পুলের তলায় আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিল ও। ওগুলো একটা পাথর আঁকড়ে ধরল। সেটা তুলে ধাঁই করে মারল মুখের সামনে দোলকের মত দুলতে থাকা আকৃতিটা লক্ষ্য করে। লাগল একেবারে সরাসরি অ্যানাকন্ডার মাথায়।

প্যাঁচে ঢিল অনুভব করল রানা। নতুন শক্তি পাচ্ছে, কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করল। কিন্তু প্যাঁচগুলো আবার টান টান, আঁটসাঁট হয়ে উঠল। সাপটার অসম্ভব ওজন পুলের মেঝের সঙ্গে চেপে রাখছে ওকে। মরিয়া হয়ে শরীরটা মোচড়াল রানা, আঙুলগুলো প্রাণপণে সেঁধিয়ে দিল টিউনিকের ব্রেস্ট পকেটে। অস্পষ্ট একটা ছবির মত পুরানো দৃশ্যটা মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল ও। ভেনিসে, তাপসীর কামরা থেকে একটা রিট্র্যাক্টেবল বলপয়েন্ট কলম নিয়েছিল ও। পকেট থেকে বেরিয়ে এল সেটা। প্রচণ্ড চাপে দু'পাশের পাঁজরের হাড় যখন মনে হলো এক হতে চলেছে, সাপটার ঘাড়ে কলমের সীস ঠেকিয়ে মাথায় আঙুলের টোকা মারল রানা।

কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেলেও কিছু ঘটল না। প্যাঁচে এতটুকু ঢিল পড়েনি; সাপটা এখনও ওর মুখ হাঁ করাবার চেষ্টা করছে, ও যাতে ডুবে মারা যায়। তারপর হঠাৎ কুণ্ডলী পাকানো পিচ্ছিল শরীরটা এমন একটা বোঝায় পরিণত হলো যার নিজের কোন শক্তি নেই। হাত-পা খেলিয়ে প্যাঁচ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল রানা, অনুভব করল বুকের খাঁচা বড় হচ্ছে। সাপটা পানির ভিতর ভেসে থাকল, যেন ঝুলে আছে। তিনটে ঝাঁকি খেলো ওটা, তারপর স্থির হয়ে গেল।

সাঁতরে পুলের কিনারায় চলে এল রানা, হাপরের মত ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। একটু পর পাথরের উপর উঠে বসল, চোখ বুজে ফুসফুসকে স্বাভাবিক হতে সময় দিচ্ছে। আবার চোখ খুলবার পর সামনে এক পাটি জুতো দেখতে পেল ও। জুতোর উপর প্রকাণ্ড কোন গাছের বিশাল কাণ্ডের মত কাপড়ে মোড়া পা। কাপড় অর্থাৎ ট্রাউজারের উপর জানোয়ার। মুখ খোলা রেখে নিঃশব্দে কদর্য হাসি হাসছে সে, যেন বলতে চায় দুনিয়াটা তার মত নিষ্ঠুর লোকদের জন্যই বরাদ্দ করা হয়েছে।

'হায়, রানা–' প্রতিধ্বনি তুলে উপর থেকে নেমে এল আওয়াজটা–'তোমাকে মারবার জন্যে যতবারই আমি মজাদার প্ল্যান তৈরি করি, ততবারই তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাও!' বলবার ঢঙে নির্ভেজাল খেদ প্রকাশ পেল।

জানোয়ারের বিশাল হাত দুটো নীচে নেমে এসে খেলনা পুতুলের মত অনায়াসে তুলে নিল রানাকে, তারপর সাবধানে নামিয়ে রাখল খেদ প্রকাশকারীর সামনে, এরই মধ্যে চাপড় মেরে দেখে নিয়েছে রানার কাছে কোন ছুরি বা আগ্নেয়াস্ত্র নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাদ–আদি ও অকৃত্রিম চেহারা নিয়ে এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসেছে কবীর চৌধুরী। তার হাতে ছোট ব্রিফকেসের মত ঝুলছে একটা ল্যাপটপ কমপিউটর। উপরের একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে সবই চাক্ষুষ করেছে সে।

'খেলাটা এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলে কেন?' সকৌতুকে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'একঘেয়ে লাগছিল,' রানার জবাব। ভাবল, এটাও সম্ভবত একটা মুখোশ।

সিল্ক টিউনিকের সামনেটা আঙুলের উল্টোপিঠ দিয়ে ঝাড়ল কবীর চৌধুরী। 'তোমার মত আমিও ইদানীং কৌতুক প্রিয় হয়ে উঠেছি, বুঝলে! শোনো, তুমি যখন পণ করেছ যে মরবেই না, তা হলে চলো আমাদের সঙ্গে—মহাশূন্য পরিভ্রমণ করে আসি! বেশি দিন থাকব না, মাত্র দু'বছর। বলা যায় না, এ দু'বছরে তুমি হয়তো আমার একজন অন্ধ ভক্তে পরিণত হবে।'

'তুমি হেঁটে এলে এতটুকু না খুঁড়িয়ে, ঘাড় নাড়ছ স্বাভাবিক ভাবে। ব্যাপারটা কী? আমার ধারণা ছিল আগুনে পুড়ে, অ্যাসিডে ঝলসে, হাঙরের কামড় খেয়ে তোমার আসল চেহারা বহু বছর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এটা তা হলে পেলে কোথায়?'

কথা না বলে জানোয়ারের উদ্দেশে একটা ইঙ্গিত করে হাঁটা ধরল কবীর চৌধুরী। জানোয়ার রানার চোখে চোখ রেখে একটা হাত ঝাপটাল। হাঁটতে শুরু করে হোঁচট খাচ্ছে রানা।

সামনে ভারী ইস্পাতের দরজা। পকেট থেকে একটা চাকতি বের করে কবাটের সরু ফাটলে অর্ধেকটা ঢোকাল কবীর চৌধুরী। রানা ধারণা করল ওটা একটা ম্যাগনেটিক চাকতি। আকারে পাঁচ টাকার কয়েনের মত। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। কবীর চৌধুরীর পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকবার সময় সুযোগ পেলেও হাত সাফাইয়ের কাজটা এত তাড়াতাড়ি না সারবার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

ভিতরে ওর জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। সামনে কমপিউটর আর টিভি মনিটর নিয়ে অন্তত তিন থেকে চারশো তরুণ ও সুদর্শন টেকনিশিয়ান বসে আছে বিশাল অপারেশন রুমে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কেউ তারা ভুলেও রানার দিকে তাকাচ্ছে না, সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। বেশ কয়েকটা রকেট টেক-অফ করবে, তারই বিভিন্ন স্তরের প্রস্তুতি দেখানো হচ্ছে মনিটরগুলোয়। এই সব রকেটের সাহায্যে, কোন সন্দেহ নেই, কিছু একটা মহাশূন্যে পাঠানো হবে।

ডানাসহ একটা স্পেসক্রাফটের গা থেকে ক্রেনের মস্ত ধাতব থাবা সরে যেতে খোলের গায়ে লেখা হরফগুলো পরিষ্কার পড়তে পারল রানা: পক্ষিরাজ।

একটা মনিটরে ডক্টর তাপসীকে দেখা যাচ্ছে, রকেটের ইঞ্জিন নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে বেচারি। আরও কয়েকটা মনিটরে চোখ বুলাবার পর রানা বুঝতে পারল একটা নয়, কয়েকটা স্পেস শাটলকে মহাশূন্যে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কবীর চৌধুরীর দিকে তাকাল ও। 'ঠিক কী করতে চাইছ বলো তো?'

রানার কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করে অপারেশন রুমের ইকুইপমেন্ট আর লোকজনের দিকে পিছন ফিরল কবীর চৌধুরী, এগিয়ে এসে একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়াল। ওখানে তাক দেখা যাচ্ছে একটা, তাতে গম্বুজ আকৃতির একটা গ্লাস কেস। ভিক্টোরিয়ান যুগে এ-ধরনের গ্লাস কেসে উজ্জ্বল রঙের ছোট পাখি স্টাফ করে রাখা হত। কবীর চৌধুরী রেখেছে ভারী সুন্দর একটা কালো অর্কিড। ওটার ফুলের ডগা টকটকে লাল, যেন রক্তে চুবানো হয়েছে। রানার মনে পড়ে গেল, সোহেল ওকে কমপ্যাক্ট ডিস্কে রেকর্ড করা ফর্মুলা দেখাবার সময় এই অর্কিড

সম্পর্কে লেকচার দিয়েছিল। ORCHIDACEAE NEGRA. জানোয়ারের অগ্নিদৃষ্টি গ্রাহ্য না করে কবীর চৌধুরীর পাশে চলে এল রানা। 'এটার কী রহস্য, এই অর্কিডটার?' ও জানে, ওর মুখ থেকে এই প্রশ্ন শুনবার জন্যই ওকে এখানে নিয়ে এসেছে পাগলটা।

আধবোজা চোখে কবীর চৌধুরী যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে: 'একটি মহান সভ্যতার অভিশাপ। আমাদের চারপাশের এই বিশাল শহরটা যে জাতি তৈরি করেছিল তারা না মহামারীতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, না কোন যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে। তারা অস্তিত্ব হারিয়েছে এই সুন্দর ফুলটির প্রতি ভালবাসার কারণে।'

অর্কিডটার নম্র অবয়বের দিকে আবার তাকাল রানা। সারফেসের দীপ্তিময় সৌন্দর্য মন কাড়লেও, রঙের ভিতর অশুভ কী যেন একটা লুকিয়ে আছে। ফুলের আকৃতিটাও কুৎসিত, ঠিক যেন একটা কীট।

'ফুলটা বিষাক্ত মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

'দীর্ঘ সাহচর্যে, হ্যাঁ,' বলল কবীর চৌধুরী। 'এটার পরাগরেণুর সংস্পর্শে এলে মেয়েরা বন্ধ্যা হয়ে যায়। দুর্ভাগা মায়ানরা এটা কখনোই বোঝেনি। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রতিটি সংকটে তারা এই ফুলের কাছে ধরনা দিয়েছে, পুজো করেছে পরম পরিত্রাতা ভেবে, অথচ তাঁদেরকে ধ্বংস করবার জন্যে এই ফুলই দায়ী। মর্মান্তিক, কি বলো?'

'তবে ওই অর্কিড এখন শুধু মেয়েদেরকে বন্ধা করে না। তুমি ওটার ক্ষতি করার ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়েছ।'

'হ্যাঁ, স্বীকার করি, বাড়িয়েছি। ভেনিসে। তা তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। এই অর্কিড এখন মৃত্যু ছড়ায়।'

'তবে পশু-পাখিদের মধ্যে নয়।'

'নয়। নয় গাছপালার মধ্যেও।' হাত দুটো উদারভঙ্গিতে দু'পাশে মেলে ধরল কবীর চৌধুরী। 'যে-কোন মূল্যে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কেউ যেন পরিবেশ দূষণের জন্যে আমাকে দায়ী করতে না পারে।' তার হাসির তুলনা চলতে পারে পাকা কবরে তৈরি ফাটলের সঙ্গে।

'আচ্ছা, যে পক্ষিরাজ ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার পথে নিখোঁজ হলো, সেটাকে এখানে দেখছি কেন?'

'এখানে নয়, এখানে নয়,' হেসে উঠে বলল কবীর চৌধুরী। 'পক্ষিরাজ রয়েছে আর্কটিক-এ, আমার একটা স্পেস রিসার্চ স্টেশনে। এরকম স্পেস স্টেশন আমার একটা নয়, ছয়-ছয়টা আছে।'

'ছ-য়-টা?' অবাক হওয়ার ভান করল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল কবীর চৌধুরী। রানা যেমন ধারণা করেছে, জ্ঞান দান অর্থাৎ লেকচার দেওয়ার প্রবণতা মাথাচাড়া দিচ্ছে তার ভিতর। 'ছয় মহাদেশে ছয়টা। প্রতিটি স্টেশনে রকেট লঞ্চিং ফ্যাসিলিটি আছে। প্রতিটি ফ্যাসিলিটি থেকে একটা করে স্পেস শাটল মহাশূন্যের উদ্দেশে রওনা হবে কাল মাঝরাতে, একযোগে। ছয়

নম্বর শাটলের ইঞ্জিনে সামান্য ত্রুটি দেখা দিয়েছে, আশা করা যায় সময়মতই তা সারানো যাবে।'

'তাহলে পক্ষিরাজকে তুমিই হাইজ্যাক করেছ?'

অর্কিডের দিকে পিছন ফিরে সারি সারি মনিটরগুলোর উপর চোখ বুলাল কবীর চৌধুরী। 'তুমি সস্তাদরের ট্যাবলয়েড পত্রিকার ভাষা ব্যবহার করছ, রানা। এটা বললে বরং ভদ্রোচিত শোনায় যে আমি আমার সম্পত্তির দখল নিয়েছি নতুন করে। সব মিলিয়ে আমার দরকার ছিল ছয়টা আবাবিল স্পেস শাটল। ছয়টাই বানানো হয়। কিন্তু একটায় মারাত্মক টেকনিকাল ফল্ট ধরা পড়ে। সে এমনই একটা ফল্ট, মেরামত করতে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে। কিন্তু অত সময় দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে পক্ষিরাজকে হাতে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হলো।' হঠাৎ চোখ গরম করে রানার দিকে তাকাল সে। 'তুমি ভাল করেই জানো, আমার ভেতর ধৈর্য বলে কিছু নেই।'

'তো অপারেশনটা কী?'

উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুলল পাগল বিজ্ঞানী, এই সময় একজন টেকনিশিয়ান তার কানে কানে কিছু বলল। গম্ভীর হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর চেহারা।

'জানোয়ার!'

বোবা জানোয়ার আওয়াজ করল: 'ঘোঁৎ!'

'রানাকে ভালমত সার্চ করেছ তো?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

মাথা ঝাঁকাল জানোয়ার।

'যাও তা হলে, আমাদের ফ্যাসিলিটি ওকে ঘুরিয়ে দেখাও,' হুকুম করল কবীর চৌধুরী। 'সব দেখানো শেষ হলে ওকে আমার চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বসাবে। আধঘণ্টা পর আসছি আমি।'

আবার মাথা ঝাঁকাল জানোয়ার।

'আর শোনো। ওর নাম মাসুদ রানা, খোদ শয়তানও ওর কুবুদ্ধিকে ভয় পায়। তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, কিন্তু তারপরও আমি হুকুম করছি সঙ্গে একজন গার্ডকে রাখো। আরেকটা কথা। যদি দেখো ফ্যাসিলিটির কোনও ক্ষতি করতে যাচ্ছে ও, যেভাবে পারো মেরে ফেলবে।' টেকনিশিয়ানের সঙ্গে হন-হন করে একটা মনিটরের দিকে এগোল কবীর চৌধুরী।

জানোয়ারের ইঙ্গিতে একজন গার্ড ছুটে এল, হাতে বাগিয়ে ধরা কারবাইন। রানাকে চোখ ইশারায় পিছু নিতে বলে হাঁটা ধরল জানোয়ার। রানার পিছনে থাকল গার্ড, একটু পরপরই শিরদাঁড়ায় ঠেকছে কারবাইনের মাজল।

পিরামিডের ভিতরটা আকারে এত বড়, কল্পনাকেও যেন হার মানাতে চায়। পথ দেখিয়ে জানোয়ার প্রথমে কবীর চৌধুরীর স্পেস রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে এল রানাকে। পিরামিড সংলগ্ন একটা বিশাল চাতালে স্টেশনটা। মাথার উপর সিলিং থাকায় বুঝবার কোন উপায় নেই যে চাতালটা পিরামিডের পেটের ভিতর নয়

এখানে একটা লঞ্চিং টাওয়ারের পাশে খাড়া করে রাখা হয়েছে গায়ে আবাবিল-৬ লেখা একটা স্পেস শাটলকে। সাদা ওভারঅল পরা টেকনিশিয়ানরা ওটার নীচে সংযুক্ত কয়েকটা রকেটের চারদিকে ব্যস্তভাবে কাজ করছে। তাদের মধ্যে জিনসের প্যান্ট-শার্ট পরা ডক্টর তাপসীও রয়েছে। কাছে যাওয়া সম্ভব হলো না, রকেটগুলো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়ল জানোয়ার।

'আমাকে ভাল করে সব দেখাতে বলা হয়েছে,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল রানা। 'রকেটগুলো আরও কাছ থেকে দেখতে চাই আমি। টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে কথাও বলতে চাই।'

ঘাড় ফিরিয়ে গার্ডের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল জানোয়ার, তারপর পাকা চাতালের উপর ঘুরে গেল, দিক বদলে পাঁচ পা এগিয়ে থামল মেঝেতে বসানো একটা ধাতব ঢাকনির সামনে। ঢাকনিটা আসলে একটা দরজার কবাট। ঝুঁকে কবাটের ফাটলে একটা ম্যাগনেটিক চাকতির অর্ধেকটা ঢোকাল জানোয়ার। ঠিক এরকম একটা চাকতি কবীর চৌধুরীর কাছেও দেখেছে রানা। ইস্পাতের ঢাকনি সরে যেতে এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখা গেল। নীচে নেমে ছোট্ট প্যাসেজ হয়ে আলোকিত বিশাল একটা হলঘরে বেরিয়ে এল ওরা।

সশস্ত্র গার্ডরা কড়া নজর রাখছে চারদিকে। হলঘরের উপর ফাঁকা, সেই ফাঁকে স্পেস শাটলের নীচের অংশ আর রকেটগুলো দেখা যাচ্ছে। টেকনিশিয়ানরা কয়েক দলে ভাগ হয়ে মই বা মঞ্চে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। কিছু মই খালি দেখা গেল। শাটল থেকে অসংখ্য মোটা পাইপ, নানা আকারের টিউব, সাপ্লাই লাইন, তার ইত্যাদি নেমে এসেছে নীচে—কোনটা ঢুকেছে হলরুমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ইস্পাতের তৈরি ভ্যাটে, কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি প্রকাণ্ড ট্যাংকের ভিতর। এরকম দুটো ভ্যাটের গায়ে লেখা রয়েছে: ORCHIDACEAE NEGRA.

ওগুলোর পাশে রয়েছে 'অক্সিজেন' আর 'সিএনজি' লেখা কয়েকটা ভ্যাট। 'ওয়াটার' লেখা কয়েকটা ট্যাংকও দেখল রানা। ওগুলোর গায়ে পাইপ বা টিউব ফিট করা রয়েছে, প্রতিটি সংযোগের পাশেই একটা করে মিটার দেখা যাচ্ছে—কী পরিমাণে সাপ্লাই দেওয়া হলো তা জানবার জন্য।

রানার দৃষ্টি বারবার ছুটে যাচ্ছে তাপসীর দিকে। টেকনিশিয়ানদের কী যেন বোঝাচ্ছে সে। কথা বলবার ফাঁকে নীচে একবার তাকাল। রানাকে দেখে হকচকিয়ে গেল সে, তারপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ইঙ্গিতে একটা মই দেখাল। রানা নিরীহ একটা ভিজে বিড়াল সেজে সেদিকে এগোল। কিন্তু স্যাঁৎ করে সরে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়াল জানোয়ার। রেগেমেগে মাথা নাড়ছে।

প্রতিবাদের সুরে রানা কিছু বলতে যাবে, এই সময় গার্ড কারবাইন দিয়ে গুঁতো মারল পিঠে। 'হট্-হট্!' রানা যেন একটা গাধা বা ঘোড়া, খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নার্ভ গ্যাস ভর্তি ভ্যাট আর পানি ভর্তি ট্যাংক লোহার রেইলিং দিয়ে ঘেরা। রেইলিঙের ভিতরও কয়েকজন গার্ডকে দেখা গেল। ওগুলোর মাঝখান দিয়ে

রানাকে পথ দেখাচ্ছে জানোয়ার, কারবাইন উঁচিয়ে ধরে পিছনে রয়েছে গার্ড। সামনেই একটা ইস্পাতের দরজা। পকেট থেকে আবার ম্যাগনেটিক চাকতিটা বের করে কবাটের সরু ফাটলে খানিকটা ঢোকাল জানোয়ার। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল জানোয়ার। তারপর পালা করে রানা আর গার্ডকে ইঙ্গিত করল। দোরগোড়া টপকে ভিতরে ঢুকল রানা। গার্ড ঘুরে গিয়ে দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বোঝা গেল, ভিতরে ঢুকবার অনুমতি নেই তার।

জানোয়ার তার হাতের চাকতিটা দরজার কবাটে আরেকবার ব্যবহার করল। সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সামনে চোখ বুলিয়ে সুসজ্জিত একটা অফিস সেকশন দেখছে রানা। জায়গাটা কাঁচের পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা—কনফারেন্স রুম, ওয়েটিং রুম, চেম্বার, লাউঞ্জ ইত্যাদি সবই দেখা যাচ্ছে। তবে খালি, কোথাও কোন মানুষ নেই। অ্যান্টি রুম থেকে ওয়েটিং রুম হয়ে কবীর চৌধুরীর চেম্বারে চলে এল ওরা। রানাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসবার ইঙ্গিত করল জানোয়ার, তারপর ডেস্ক ঘুরে রিভলভিং চেয়ারটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা এমন অটল আর অনড়, দু'মিনিট পর রানার সন্দেহ হলো দৈত্যটা চোখ খুলে ঘুমাচ্ছে না তো?

'এসো, গল্প করে সময়টা কাটাই,' অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে উর্দুতে বলল রানা। 'তোমার হুজুর সম্পর্কে কিছু শোনাও। তুমি তাকে খুব শ্রদ্ধা করো, তাই না?'

জানোয়ার একচুল নড়ল না।

'ও, ভুলে গিয়েছিলাম—তুমি তো আসলে বোবা,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল রানা। 'ঠিক আছে, গল্প করতে হবে না। তবে খানিকটা অতিথি সেবা করতে চাইলে আমি তোমাকে মানা করব না। যদি জিজ্ঞেস করো কী হলে সন্তুষ্ট হব আমি, তা হলে বলব: কড়া এক কাপ কফি হলে সত্যি মন্দ হত না।'

রানা থামতেই নড়ে উঠল জানোয়ার। বলা উচিত তার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। অকস্মাৎ রানা দেখল জানোয়ারের লম্বা করা হাতে একটা পিস্তল রয়েছে, মাজলটা ওর দু'চোখের মাঝখানে তাক করা। মানসিক বিকৃতির শিকার জানোয়ারের ভাব দেখে মনে হলো, এই বুঝি ট্রিগার টেনে দিল। তবে না, আঘাতটা এল অন্য দিক থেকে। পিস্তলটা ধরে আছে বাঁ হাতে, হঠাৎ একবার তার ডান হাতটায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। লাগল, শুধু এটুকুই জানে রানা। কীভাবে লাগল বলতে পারবে না। পটকা ফাটার মত একটা শব্দ হলো।

বাম গালে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে চোয়ালের হাড়। এরকম চড় রানা কেন, দুনিয়ায় আর কেউ কখনও খেয়েছে কি না সন্দেহ। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, চেয়ার ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল ওর শরীর। উড়ে গিয়ে পড়ল একটা ফাইলিং কেবিনেটের গায়ে, সেখান থেকে খসে মেঝেতে রানা লড়ছে চৈতন্য ধরে রাখবার লড়াই। জানে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সম্পূর্ণ

অরক্ষিত হয়ে পড়বে ও।

ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এল জানোয়ার। পিস্তল নেড়ে রানাকে সিধে হতে বলছে সে। একদিকে চোয়ালে প্রচণ্ড ব্যথা, মাথাটাও ঘুরছে, আরেক দিকে গুলি খেয়ে মরবার আতঙ্ক–রানার বুকের ভিতর লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে ও। তাই দেখে হিংস্র হাসি ফুটল জানোয়ারের মুখে। ইঙ্গিতে দরজার দিকটা দেখাল, তারপর পিছু হটে পথ ছেড়ে দিল রানাকে।

জিভ বের করা ক্লান্ত কুকুরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। জানোয়ার পিছু হটছে, ও তাকে অনুসরণ করছে। তিন-চারটে কামরা পার হয়ে একটা সরু প্যাসেজ পেরুল ওরা, তারপর ঢুকল ছোট্ট একটা কিচেনে। জানোয়ারের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে দু'কাপ কফি বানাবার আয়োজন শুরু করল রানা।

ওর এজেন্সির ব্রাসিলিয়া শাখার এক্সপার্টরা ডান ও বাম হাতে চারটে নখের গায়ে পাতলা আচ্ছাদন পরিয়ে দিয়েছে। ওগুলো নরম প্লাস্টিকের মত, আঙুলের ডগা দিয়ে ঘষলে নখ থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে আসবে। দু'ধরনের বিষ ওগুলো। ডান হাতেরগুলো শুধু গরম ফুটন্ত পানিতে নিঃশেষে গলবে। পরে সেই পানিতে কেউ চুমুক দিলে মৃত্যু ঘটবে তিন সেকেন্ডের মধ্যে।

নিজেকে শাসন করছে রানা, বোঝাচ্ছে: জানোয়ার প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছে বলে রাগের মাথায় ডান হাতের দাওয়াই খাওয়াতে পারো না। সে মারা গেলে কবীর চৌধুরী খেপে যাবে। তখন তার পরিকল্পনা আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবার সুযোগটাও হাতছাড়া হতে বাধ্য। তারচেয়ে বাম হাতের বিষ প্রয়োগ করে দানবটাকে আধঘণ্টার জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখো।

ভান নয়, এখনও মাঝে মধ্যে মাথাটা ঘুরে ওঠায় টলছে রানা। সেটা লক্ষ করে ভারী কৌতুক বোধ করছে জানোয়ার। নিজের 'সামান্য' একটা চড়ের তাৎপর্য দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ সে। খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে রানার চোখ-মুখ পরীক্ষা করছে, ফলে ওর হাতের তৎপরতা অনুসরণ করবার সুযোগ ঘটল না। কেটলির ফুটন্ত পানিতে ডান হাতের নয়, বাম হাতের বিষ ফেলল রানা। ওই পানি দিয়ে নিজের জন্যও কফি বানাতে হলো। এখন সন্দেহ বা খেয়ালবশত জানোয়ার যদি জেদ ধরে প্রথমে রানাকে কফি খেতে হবে? সেক্ষেত্রে আধঘণ্টার জন্য জ্ঞান হারাবে রানা। অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে জানোয়ার ওকে মেরে ফেলতেও পারে।

তবে সেরকম কিছু ঘটল না। কফির কাপটা রানার হাত থেকে নেওয়ার আগে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখল জানোয়ার। তারপর বার কয়েক ফুঁ দিল কাপটায়, বিরতিহীন চুকচুক আওয়াজ করে প্রথম দফাতেই অর্ধেক খালি করে ফেলল। সময় মত রানা হাত বাড়াল বলে ধরতে পারল, তা না হলে অবশিষ্ট কফি সহ কাপটা পড়ে যেত। কাপ নামিয়ে রেখে জানোয়ারকেও ধরে ফেলল রানা, তিন মণ বোঝাটা ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল মেঝেতে। এরপর পিস্তলটা টেনে নিয়ে খুলল। বুলেটগুলো বের করে ফেলে দিল ওয়েস্ট বিন-এ। পিস্তলটা আবার যথাস্থানে গুঁজে রাখবার আগে জানোয়ারের মাথার পিছনে সজোরে বাড়ি মেরে

খুলিতে একটা ক্ষত তৈরি করল। তারপর সার্চ করল তাকে। ম্যাগনেটিক চাকতি ছাড়া লোকটার কাছে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।

নিজের আর জানোয়ারের কফি ফেলে দিল রানা, কেটলি আর কাপগুলো ভাল করে ধুয়ে রেখে দিল জায়গা মত। সবশেষে চাকতিটা নিয়ে চেম্বারে ফিরে এল ও। হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলিয়ে আন্দাজ করল কবীর চৌধুরীর আসতে এখনও নয় মিনিট দেরি আছে। রিভলভিং চেয়ারের পিছনে প্রাইভেট লেখা একটা দরজা আগেই দেখেছে, সোজা হেঁটে গিয়ে সেটার সামনে থামল, চাকতির সাহায্যে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল। এটা ছোট একটা স্টাডি রুম, টেবিলের উপর কমপিউটর দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত ভুলে অন করে রেখে গেছে কবীর চৌধুরী। স্ক্রীনের দিকে একদৃষ্টে ঝাড়া দু'মিনিট তাকিয়ে থাকল রানা।

কয়েক সেকেন্ড পর পর মনিটরের দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। কবীর চৌধুরীর নিজস্ব স্পেস স্টেশন 'নিউ স্টার্টিং পয়েন্ট' রয়েছে মহাশূন্যে, অ্যাটমসফিয়ার থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে। সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতির রিপোর্ট পাঠাচ্ছে একটা রোবট। এরকম রিপোর্ট আরও আসছে পাঁচ মহাদেশে তৈরি করা পাঁচটা স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে। তথ্য ও পরিসংখ্যান দেখে রানা জানতে পারল, পাঁচটা স্পেশ শাটলে করে একশো পঁচাত্তর জন সাইবর্গকে কাল মধ্যরাতে নিউস্টার্টিং পয়েন্টে পাঠানো হবে। সবশেষে, এক ঘণ্টা পর, রওনা হবে ব্রাজিলের রেইন ফরেস্ট থেকে ছয় নম্বর আবাবিল, তাতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরীর সঙ্গে মাত্র পাঁচজন সাইবর্গ থাকবে। আরোহী কম থাকলেও, ছয় নম্বর স্পেস শাটলে তরল নার্ভ গ্যাস ভর্তি পঁচিশটা ইস্পাতের তৈরি ভ্যাট তোলা হবে। মহাশূন্যে পাড়ি জমাবার আগে, পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে থাকতেই, ওই ভ্যাটগুলো শাটল থেকে ফেলে দেবে কবীর চৌধুরী।

রানার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ভেনিসে ছোট্ট একটা ফায়াল বিস্ফোরিত হওয়ায় দু'জন বিজ্ঞানীকে সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতে দেখেছে ও। হাফ টন ওজনের ভ্যাট ওগুলো, মোট পঁচিশটা, তারমানে সাড়ে বারো টন নার্ভ গ্যাস পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কমপিউটর হিসেব কষে দেখাচ্ছে, এই পরিমাণ নার্ভ গ্যাস পৃথিবীর মোট জনসংখ্যাকে একবার নয়, পাঁচবার মেরে ফেলতে পারবে। অর্থাৎ সব মানুষকে খুন করতে যতটা নার্ভ গ্যাস দরকার, তারচেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ব্যবহার করা হবে। তথ্য-পরিসংখ্যান সবই বাস্তব, অথচ রানার মনে হচ্ছে—এ সম্ভব নয়, এমনকী কবীর চৌধুরীর মত একটা পাগলও দুনিয়ার সব মানুষকে মেরে ফেলবার মত নিষ্ঠুর কোন কাজে হাত দিতে পারে না।

একটা ঘোরের মধ্যে স্টাডি রুমটা পরীক্ষা করল রানা। কয়েকটা দেরাজ খুলে দেখল ভিতরে কী আছে। বান্ডিল বান্ডিল কাগজে জটিল সব অঙ্ক আর সাংকেতিক চিহ্ন দেখা গেল। চেয়ারে সাদা আলখেল্লার সঙ্গে একটা কোট ঝুলছে দেখে পকেটগুলো সার্চ করল রানা। আরেকটা ম্যাগনেটিক চাকতি চলে এল হাতে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। কবীর চৌধুরী আধ ঘণ্টার কথা বলেছে। এখনও ওর হাতে চার মিনিট সময় আছে। কামরার ভিতর আর কী আছে দেখতে গিয়ে চেয়ারের পিছনে লম্বা একটা শো-কেস পেল ও। বোতাম টিপে সেটার আলো জ্বালল। ভিতরে শুয়ে রয়েছেন বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, এই সময়কার কবীর চৌধুরী, মহাত্মা গান্ধী, বার্টান্ড রাসেল, মাও সে-তুং প্রমুখ। রক্ত-মাংসের মানুষ নন, তাঁদের হুবহু চেহারা নিয়ে তৈরি মুখোশ।

ব্যবহার বিধিতে লেখা রয়েছে মুখোশগুলোকে পকেট কমপিউটরের সাহায্যে অপারেট করা যায়। কমপিউটর প্রয়োজনীয় নির্দেশ পায় কন্ট্যাক্ট লেন্সে বসানো সেনসর আর ব্রেনওয়েভ থেকে, ফলে বুঝতে পারে কখন কেমন মুখভঙ্গি করতে হবে, কখন হাসতে হবে বা কখন কাঁদতে হবে। প্রতিটি মুখোশ চাপ দিয়ে এত ছোট করা যায়, যে-কোন লোক তার মুঠোর ভিতর লুকিয়ে রাখতে পারবে। ব্যাপারটা সত্যি কি না দেখবার জন্য চাকতি দিয়ে তালা খুলে কবীর চৌধুরীর একাধিক মুখোশ থেকে একটা বের করল রানা।

হাতে মাত্র দু'মিনিট সময় আছে, চেম্বারে ফিরে রানা দেখল কবীর চৌধুরী এখনও আসেনি। চট করে কিচেন থেকে আরেকবার ঘুরে এল ও। জানোয়ারের জ্ঞান ফিরতে এখনও বিশ মিনিট দেরি আছে।

কবীর চৌধুরী চেম্বারের দিকে এগিয়ে এল অগ্নিমূর্তি নিয়ে, তার পিছু নিয়ে সশস্ত্র একজন গার্ডকেও আসতে দেখা গেল।

'কোথায় সেই উল্লুকটা? আমি মানা করা সত্ত্বেও কোন্ সাহসে সে গার্ডকে সঙ্গে না নিয়ে ভেতরে ঢুকল?' আগের মতই, তার হাতে একটা ল্যাপটপ ঝুলছে।

চেম্বারে জানোয়ার নেই, রবীন্দ্রনাথের মুখোশ পরে রানা একা একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে–দৃশ্যটা দেখে কবীর চৌধুরী থামল না, ঘরগুলোর ভিতর দিয়ে হন-হন করে এগোল, প্যাসেজ হয়ে কিচেনের দিকে যাচ্ছে।

চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গার্ড। তার হাতের কারবাইন রানার মাথার পিছনে তাক করা।

তিন মিনিট পর কিচেন থেকে ফিরে এল কবীর চৌধুরী। রানা ভাবল, এবার একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু না, কবীর চৌধুরী একটা কথাও বলছে না। ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে তার। চোখে নগ্ন সন্দেহ। ধীরে ধীরে ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসবার পর বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'এর ব্যাখ্যা কী?'

'কীসের ব্যাখ্যা?'

'মওকা পেয়ে খুলি ফাটিয়েছ, অজ্ঞান করে কিচেনে ফেলে রেখেছ। কিন্তু পিস্তলটা ওর কোমরের বদলে তোমার হাতে নেই কেন? বুলেটগুলোই বা ওয়েস্ট বিনে কী করছিল? তা ছাড়া, এই ছদ্মবেশ নেয়ারই বা কী মানে?'

'অর্থাৎ তুমি জানতে চাইছ, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওই পিস্তলটা দিয়ে তোমাকে আমি খুন করিনি কেন, কেনই বা পালাতে চেষ্টা করিনি–এই তো?'

কবীর চৌধুরী অপেক্ষা করছে।

'তার আগে তুমি বলো, রেইন ফরেস্টের ভেতর তোমার এই ঘাঁটি থেকে আদৌ কারও পক্ষে পালানো কি সম্ভব?'

'না।'

'ব্যস, জবাব তুমি পেয়ে গেলে। পালানো সম্ভব নয়, তাই সে চেষ্টা আমি করিনি। আর ছদ্মবেশ নিয়েছি তোমার দেখাদেখি শখে, তুমি বললে খুলে ফেলব।'

'না, জবাব আমি এখনও পাইনি। ব্যাপারটা মিলছে না। লাভ নেই জেনেও চেষ্টা না করে তুমি ছাড়ো না। এটা তোমার স্বভাব।' কবীর চৌধুরীর চোখে সন্দেহ আরও গভীরতা পাচ্ছে। 'পালানোর সুযোগ না নেয়ার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে তোমার।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই কারণ আছে। সেটা কী তা-ও বলে দিচ্ছি। আমি প্রথমে জানতে চেষ্টা করব প্ল্যানটা কী, ঠিক কী করতে চাইছ তুমি। যদি দেখি তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়, প্রাণ দিয়ে হলেও প্রতিহত করব।'

'সত্যি রানা, তোমার এই সৎ সাহসের আমি প্রশংসা করি,' ভারী গলায় বলল কবীর চৌধুরী, চোখ-মুখ থেকে সন্দেহের ছায়াটা হঠাৎ করেই সরে গেছে। 'তোমার একটা আদর্শ আর নীতি আছে, সেই আদর্শ আর নীতির সঙ্গে তুমি আপস করতে জানো না। বিশ্বাস করো, আমিও ঠিক তোমারই মত। মানুষ আমাকে বিশ্বপ্রেমিক বলে, কারণ মানুষকে আমি পরমায়ু দিতে চাই, দিতে চাই মাটির বুকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আমার নিজের তৈরি একটা স্বর্গ। এ-ব্যাপারে আমারও একটা নীতি আছে—ছলে-বলে, কলে-কৌশলে উদ্দেশ্য পূরণ করি, সেই নীতির সঙ্গে আমিও কখনও আপস করি না। অবশ্য তোমার নীতি আর আমার নীতি আলাদা, সংঘর্ষটা সেজন্যেই হয়। এর একটা সমাধান হওয়া দরকার। তোমার সাহস, শক্তি আর বুদ্ধি যদি আমার মেধা, উদ্ভাবনী শক্তি, স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে হাত মেলাত, আমরা দু'জন অসাধ্য সাধন করতে পারতাম।'

কবীর চৌধুরী আবেগে আপ্লুত হয়ে আছে, বুঝতে পেরে তথ্য আদায়ের জন্য একটা টোপ ফেলল রানা: 'তোমার সম্পর্কে আমিও তা হলে একটা সত্যি কথা বলি। তুমি একাই অসাধ্য সাধনে সক্ষম। অতীতে অনেকবারই তার প্রমাণ রেখেছ। আমার ধারণা, এবারও তুমি খুব বড় কিছু একটা করতে যাচ্ছ। তবে এবারও বোধহয় তোমার পদ্ধতিটা আমি সমর্থন করতে পারব না।'

'পারবে, রানা! আমি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে দ্বিমত পোষণের কোন কারণই তুমি খুঁজে পাবে না। এমন অকাট্য যুক্তি দেখাব, আমার এই প্ল্যান সমর্থন করতে তুমি বাধ্য হবে।

'আইন-শৃংখলা বলো, অভাব-অনটন বলো, কিংবা রোগ-ব্যাধি, অব্যবস্থা, দুর্নীতি, দূষণ, বিশ্বায়ন, ক্রুসেড—সব মিলিয়ে কি বলা যায় যে দুনিয়াটা ভাল চলছে, দুনিয়ার মানুষ ভাল আছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, দুনিয়া ভালভাবে চলছে এ-কথা বলা যায় না।'

'এটাই আসল পয়েন্ট, এবং এই ব্যাপারে আমরা একমত হলাম। এবার

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট–দুনিয়াটাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার সুযোগ পেলে সেই সুযোগ কি আমাদের হারানো উচিত হবে?'

'দেখতে হবে যাকে তুমি সুযোগ বলছ, সেটা আদৌ…'

কিন্তু উত্তেজিত কবীর চৌধুরী এখন আর রানার কথা শুনতে পাচ্ছে না। তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। রানার মাথার উপর দিকের দেয়ালে স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। আশ্চর্য একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে সে।

'প্রথমে ছিল স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা,' ভরাট, আবেগঘন কণ্ঠে শুরু করল সে। 'এখন ব্যাপারটা নিরেট বাস্তব। দুনিয়ার বুকে নিজেদের নিখুঁত বীজ বপন করার জন্যে আমি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন একটা জাতি সৃষ্টি করেছি। একশো আশিজন সাইবর্গ। সব মিলিয়ে সাতশোটা তৈরি করেছিলাম, তার মধ্যে একশো আশিটা ত্রুটিহীন বেরিয়েছে। ওরা মানুষ, আবার ওরা মেশিনও। আমার মহাশূন্য স্টেশন টার্নিং পয়েন্টে দু'বছর থাকবে এই নব্বুইজন নারী আর নব্বুইজন পুরুষ। দু'বছরে প্রতিটি দম্পতি দুটো করে বাচ্চার মা-বাবা হবে। সব মিলিয়ে ওদের সংখ্যা দাঁড়াবে তিনশো ষাট।

'দুনিয়ার বুকে নেমে এসে ওরা প্রথমে একটা ল্যাবরেটরি বানাবে। সন্তানদের যান্ত্রিক অংশ তৈরি হবে ওখানে। শুধু তাই নয়, যান্ত্রিক অংশগুলোকে–এক অর্থে তাদের গোটা অস্তিত্বকেই–সারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করা হবে ওখান থেকে। এই কাজে, স্বভাবতই, কমপিউটর ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ কমপিউটর যেটাকে ভাল বলে মনে করবে, ভবিষ্যৎ সাইবর্গরা সেই কাজই করবে শুধু। ফলে দুনিয়ার বুকে হানাহানি, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, পাপ-পুণ্য, পরিবেশ দূষণ, ধর্মীয় উন্মাদনার ফলে খুনোখুনি–অর্থাৎ মন্দ কোন জিনিসই থাকবে না। প্রতিটি মানুষ হবে বিশুদ্ধ এবং অমিত সম্ভাবনার অধিকারী–ধরতে গেলে প্রায় একেকজন ঈশ্বর।

'তবে তার আগে তিক্ত একটা দায়িত্ব অবশ্যই আমাকে পালন করতে হবে। প্রথমে পৃথিবীর গলায় পরিয়ে দেব নেকলেস অভ ডেথ–মৃত্যুর মালা। আমার ছয় নম্বর আবাবিল স্পেসশোটলে পঁচিশটা নার্ভ গ্যাস ভর্তি ভ্যাট থাকবে। পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার ত্যাগ করার আগে পঁচিশটা পয়েন্টে ওগুলো ফেলা হবে। প্রতিটি ভ্যাটে হাফ টন করে নার্ভ গ্যাস আছে, একশো কোটি মানুষকে মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যাকে মানবজাতি বলি তার আর অস্তিত্বই থাকবে না। এর দু'বছর পর শুরু হবে একটা রেঁনেসা, পুনর্জন্ম, নতুন একটা দুনিয়া।'

'দুঃখিত, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না…'

'কেন?' রানার কথা গ্রাহ্যই করছে না কবীর চৌধুরী। 'কেন আমি এই কাজ করতে যাচ্ছি? এর পিছনে যুক্তিটা কী? এ এমন এক যুক্তি, সাধারণ বোধবুদ্ধি আর দেখার চোখ থাকলে যে-কেউ সেটা বলামাত্র উপলব্ধি করবে। ব্যাপারটা জনসংখ্যা নিয়ে, রানা। আমার হিসাবে দুনিয়ার লোকসংখ্যা সাত হাজার মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। তোমার কোন ধারণা আছে, ২০৭০ সালে এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে

দাঁড়াবে? ত্রিশ হাজার মিলিয়নে! এই সংখ্যা তোমাকে বিচলিত করছে না? তোমার দম আটকে আসছে না?

'এর পরিণতি মহামারী, দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধ। এত লোককে আমরা খাওয়ার কী, রানা? ততদিনে সর্বশেষ খাদ্যভাণ্ডার সাগরকেও আমরা নিঃশেষ আর দূষিত করে ফেলব। কোথাও আর খাওয়ার মত কিছু থাকবে না। সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখবার পরীক্ষিত মাধ্যম মাত্র একটা: যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ বাধলে ঘটেটা কী? ধ্বংস। শুধু মানুষের প্রাণ নয়, তার সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায় এখনও বেঁচে থাকাটা অর্থবহ করে রেখেছে যে-সব জিনিস—শিল্প, বই, পেইন্টিং, সঙ্গীত, স্থাপত্য, অসংখ্য সভ্যতার নিদর্শন, যা কিনা মানুষের মনন আর বুদ্ধিবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

'মানুষের আত্মবিধ্বংসী ক্ষমতা সবই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। মানুষ এমনকী শেষ পর্যন্ত নিজেকেও রক্ষা করতে পারবে না। তাই এই মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি। আমি নিজে একটা সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে যাচ্ছি। একটা নতুন জাতি পৃথিবীর বুকে বাস করবে, তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দেবে সাতশো কোটি নরাধম। তাদেরকে আমি ত্যাগ করতে যাচ্ছি ঠিকই, তবে পৃথিবীটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখব না। আসলে পৃথিবীকে বাঁচাব বলেই তো এত নিষ্ঠুর একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আমাকে। পৃথিবীর মর্যাদা মানুষ রাখতে পারেনি, কিন্তু আমার নতুন জাতি সাইবর্গরা পারবে।

'আমার হিসেবে কোন অতিরঞ্জন নেই, রানা। আমি যখন বলি মানুষ নিজেই পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলবে, তখন সত্যি কথাই বলি। যেটা ঘটবেই ঘটবে, আমি শুধু সেটা খানিক আগে ঘটাতে চাইছি। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিচ্ছেন আমাদের দ্বারা অ্যাটমসফিয়ার দূষিত হয়ে পড়ায় ওজোন স্তর বিপজ্জনকভাবে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ত্বকের ক্যানসার ভয়াবহ রকম বেড়ে যাবে। আবহাওয়া শুরু করবে খামখেয়ালিপনা। খরা, বন্যা, টাইফুন, হলোকস্ট। এগুলো হবে অনিবার্য সমাপ্তির পূর্ব লক্ষণ।

'আমি এই অসহায় আর অভিশপ্ত মানুষকে ভালবাসি, তাই তার এই ধুঁকে ধুঁকে মরা সহ্য করতে রাজি নই। বিশ্বস্ত অথচ আহত ঘোড়াকে গুলি করে মারতে হয়, কারণ তার কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারো না। সেরকম আমিও ওদের এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাতারাতি সবাইকে একযোগে মুক্তি দেব। মানুষের বদলে সাইবর্গরা নতুন জাতি হিসেবে আগামী একশো কোটি বছর পৃথিবীতে বাস করবে, আমি হব একাধারে তাদের ফিলসফার, জাতির জনক, এবং ঈশ্বর। সেখানে কারও মৃত্যু থাকবে না, থাকবে না জ্বরা, ব্যাধি, শোক, অভাব-অনটন...'

'এখানে তোমার একটা মাত্র আবাবিল,' কথার মাঝখানে বাধা দিল রানা, 'পঁচিশটা ভ্যাট, পাঁচজন সাইবর্গ, তুমি, জানোয়ার, ডক্টর তাপসী আর আমি উঠবার পর ওটায় নিশ্চয়ই আর কোন জায়গা থাকবে না?'

'আর জায়গার দরকারই বা কী?' নরম সুরে কথা বলছে কবীর চৌধুরী, চোখ-মুখ থেকে কোমল যে জিনিসটা ঝরে পড়ছে সেটাকে স্নেহ ছাড়া আর কিছু

বলা যায় না। স্পেস শাটলে উঠবে রানা, এটা নিজে থেকে জানিয়ে দেওয়ায় যারপরনাই উৎফুল্ল বোধ করছে সে। তার ধারণা, সম্ভবত চির শত্রুতার অবসান ঘটতে চলেছে। 'তাছাড়া–তোমাকে জানাতে কোন আপত্তি নেই–আমার সঙ্গে জানোয়ার যাচ্ছে না। নতুন পৃথিবীতে ওর কোন কাজ থাকবে না। ভাবছি ওকে একটা গুলি করে যাব। আর আমার ইচ্ছে না ডক্টর তাপসীকে সঙ্গে নিই। ওকেও আমি হয়তো নিজের হাতে মেরে রেখে যাব।'

'সে কী! কেন?'

'তাপসী আমার প্ল্যান ব্যর্থ করার চেষ্টা চালিয়েছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আমার বাকি পাঁচটা স্পেস শাটল বিভিন্ন মহাদেশে থাকলেও, এখানকার একটা কমপিউটরের মাধ্যমে ওগুলোর কন্ট্রোল প্যানেল অপারেট করা হয়। আজ সকালে কোন এক সুযোগে আমার একটা কমপিউটরের সাহায্যে বাকি পাঁচটা স্পেস শাটলে এমন কমান্ড পাঠিয়েছে সে, প্রয়োজনের সময় যাতে একটা রকেটও ইগনাইট না করে। জ্বালানি যদি না জ্বলে, রকেট উড়বে না; রকেট না উড়লে শাটলও রওনা হবে না। তার এই কুকীর্তি মাত্র আধঘণ্টা আগে ধরা পড়েছে।'

রানা চিন্তা করছে।

'কী ভাবছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে, চৌধুরী। যদি বিবেচনা করতে রাজি থাকো তো বলি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই বিবেচনা করা হবে, তুমি বলো।'

'সত্যি কথা বলতে কী, চৌধুরী, তোমার সঙ্গে হাত মেলাবার ব্যাপারে এখনও আমি কোনও সিদ্ধান্তে আসিনি। দুনিয়ার সব মানুষকে তুমি মেরে ফেলবে, আর এত বড় অন্যায় আমি সমর্থন করব, এটা তুমিও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না।'

'তোমার প্রস্তাবটা কী?' রাগ চেপে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'তাপসীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে দাও আমাকে। দু'জন মিলে আমরা তোমার প্ল্যানটা সংশোধন করব–যাতে দুনিয়ার মানুষও বাঁচে, আবার তোমার সাইবর্গরাও বংশবিস্তারের সুযোগ পায়।'

'অবশ্যই তোমাদের আনা সংশোধনী আমার পছন্দ হবে না। তখন কী ঘটবে?' কবীর চৌধুরীর চেহারা থমথম করছে।

'তখন তুমি আমাদেরকে নিয়ে যা খুশি তাই করবে,' বলল রানা। 'আমরাও, স্বভাবতই, তোমার প্ল্যান বানচাল করার জন্যে উঠে পড়ে লাগব।'

কবীর চৌধুরী আরও গম্ভীর হলো। 'তোমরা দু'জন আমার কোনও ক্ষতিই করতে পারবে না।'

'কে বলল আমরা মাত্র দু'জন? জানোয়ারকে আমরা সঙ্গে পাব না, যদি জানিয়ে দিই যে তাকে তুমি মেরে রেখে যাবে? আর সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশোর মত বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান, গার্ড? তারা যখন জানতে পারবে...'

'শাট আপ!' অকস্মাৎ বাঘের মত গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী। 'তোমার এত

বড় সাহস! আমার লোকজনকে নিয়ে দল পাকাবে, সেটা আবার আমাকেই শোনাচ্ছ? তুমি আসলে আদি ও অকৃত্রিম কয়লা, রানা। যতই আমি ধুই, কখনও পরিষ্কার হবে না। শোনো, বলে রাখি—ওরা পাঁচশো বিশ জন আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ওরা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে।' রানাকে ছাড়িয়ে দরজার দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে চেম্বারে ঢুকছে জানোয়ার। 'এই যে, উল্লুক কাঁহিকে! সচেতন হতে এতক্ষণ সময় নিলি? তোকে বলিনি, মাসুদ রানাকে শয়তানও ভয় করে? বলিনি, সঙ্গে গার্ড রাখবি?'

রানার চেয়ারের পাশে করজোড়ে দাঁড়াল জানোয়ার। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে যে আওয়াজটা করছে, একমাত্র কবীর চৌধুরীই সেটার অর্থ জানে।

'চাইছিস যখন, তখন তো তোকে মাফ না করে আমি পারব না,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু জীবনের বাস্তবতা মাঝে-মধ্যে আমাকে এমন পরিস্থিতির মুখে এনে ফেলে দেয় যে উপকারী বন্ধু বা স্নেহের পাত্রকে বিনা অপরাধে নিষ্ঠুর শাস্তি না দিয়ে আমার সামনে অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। হ্যাঁ-রে, জানোয়ার, তুই কী আমাকে সত্যি এতটা ভালবাসিস যে আমি বললে মরতেও দ্বিধা করবি না?'

আবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল জানোয়ার।

'বেশ, বেশ। ভারি খুশি হলাম শুনে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কবীর চৌধুরী। 'মনে রাখিস, তোকে যদি কখনও মরতে বলি আমি, সেটা তোর ভালর জন্যেই বলব। এখন শোন। আমাদের স্পেস শাটলের তিনতলায় যে হোল্ডে ভ্যাটগুলো রাখা আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখ রানাকে। ডক্টর তাপসী কড়া পাহারার মধ্যে রকেট ইঞ্জিন মেরামত করছে, কাজটা শেষ হলে তাকেও ওই সেলে রেখে আসবি। তবে সাবধান, আমি না বলা পর্যন্ত ভ্যাটগুলোয় গ্যাস ভরবি না।'

মাথা ঝাঁকাল জানোয়ার।

উর্দু থেকে আবার বাংলায় ফিরে এল কবীর চৌধুরী, কথা বলছে রানার উদ্দেশে: 'তোমার শয়তানি প্রকাশ হয়ে পড়ায় জানোয়ারের আয়ু কিছুটা বাড়ল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভ্যাটগুলোর সঙ্গে তোমাকে আর তাপসীকে শাটল থেকে ফেলে দেয়া হবে। তো এই ফেলে দেয়ার কাজটা করার জন্যে জানোয়ারের সাহায্য দরকার হবে আমার, তাই ওকে সঙ্গে না রেখে উপায় নেই।'

সে থামতেই দুর্বোধ্য আওয়াজ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জানোয়ার। তারপর ইঙ্গিতে রানাকে দেখিয়ে নিজের বাম তালুতে ডান হাত দিয়ে চটাস করে একটা ঘুসি মারল।

হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। 'শুনবে, রানা, জানোয়ার কী বলছে? ও বলছে, শাটলে তোলার দরকার নেই, তোমার হাড় থেকে মাংসগুলো এখানেই আলাদা করার অনুমতি দেয়া হোক তাকে।'

রানা ভাব দেখাল এসব নগণ্য ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহ নেই। 'তুমি তা হলে আমাদের প্রস্তাব না শুনেই প্রত্যাখ্যান করছ? প্ল্যানটা সংশোধন করতে একদমই রাজি নও?'

'শুনতে আপত্তি নেই, তবে তুমি যে ধরনের সংশোধনী আনতে চাইবে তা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। মানুষ জাতি ভাল নয়, এটাই হলো আসল কথা: কাজেই তাকে টিকিয়ে রেখে একটা সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তেই এরকম একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। যাই হোক, এত করে যখন বলছ, কাল রওনা হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে তোমার সঙ্গে শেষবার দেখা করব আমি। কী বলতে চাও, শুনব তখন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

রানার বুকের দিকে পিস্তলের মত তর্জনী তাক করল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু সাবধান, কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না। জানোয়ার, যদি দেখিস গোলমাল করছে, সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপে মেরে ফেলবি, কিংবা গার্ডকে বলবি সরাসরি মাথায় গুলি করতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার কাঁধে অসম্ভব ভারী একটা হাত রাখল জানোয়ার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা সরিয়ে দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, ঘুরে দরজার দিকে এগোল। ওর পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল গার্ড। দ্রুত ওকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এল জানোয়ার, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে—পথ দেখিয়ে স্পেস শাটলে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে।

পিছন থেকে কবীর চৌধুরী গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল, 'জানোয়ার, আমার প্রাণের শত্রুটাকে ভাল করে আরেকবার সার্চ করতে ভুলবি না।'

অফিস স্পেস থেকে বেরিয়ে এসে ভ্যাট আর ট্যাংকের মাঝখান দিয়ে রকেট আর শাটলের দিকে এগোল ওরা। শাটলের নীচে ফিট করা রকেটগুলোর ইঞ্জিন কাভার এখনও খোলা দেখল রানা, টেকনিশিয়ানরা ব্যস্ত ভঙ্গিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তাদের কাছাকাছি সশস্ত্র কয়েকজন গার্ডকেও দেখা গেল, নজর রাখছে তাপসীর উপর। রকেট ইঞ্জিনে নিশ্চয় গুরুতর ত্রুটিই ধরা পড়েছে, তা না হলে পরম শত্রু তাপসীকে ওগুলোর কাছে ঘেঁষতে দিত না কবীর চৌধুরী।

জানোয়ার মই বেয়ে উঠছে। আটটা ধাপ ওঠার পর নীচে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল সে। এবার রানা উঠতে শুরু করল। সব মিলিয়ে বাহান্নটা ধাপ বেয়ে ওঠার পর শাটলের নাগাল পেল জানোয়ার। আরও চল্লিশটা ধাপ টপকে চাকতির সাহায্যে শাটলের একটা হ্যাচ খুলল সে। এই হ্যাচটার একপাশে একটা বড় গর্ত রয়েছে, সেটা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে এক গোছায় অনেকগুলো সরু পাইপ। জানোয়ারের পিছু নিয়ে শাটলের ভিতর ঢুকল রানা। ওর পিছনেই রয়েছে গার্ড।

'মহাশূন্যে যেতে হলে তো অ্যাস্ট্রোনটদের বিশেষ পোশাক পরতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'সে-সব কোথায়?'

ইঙ্গিতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলল জানোয়ার। গার্ডকে নিয়ে চলে যাচ্ছে

সে, পিছন থেকে ডাকল রানা।

'তোমার হুজুর তোমাকে মেরে রেখে যাবে, এ-খবর কি তুমি জানো, জানোয়ার?'

ধীরে ধীরে ঘুরে রানার মুখোমুখি হলো জানোয়ার। তারপর প্রবল বেগে মাথা নেড়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে আওয়াজ করতে লাগল।

'তুমি "না" বললে কী হবে, তোমার হুজুর তো আমাকে সে কথাই বলল। নতুন দুনিয়ায় তোমার কোন কাজ থাকবে না, তাই সে তোমাকে মেরে ফেলবে...'

পরমুহূর্তে কেউ যেন গোটা দুনিয়াটা রানার মুখে ছুঁড়ে মারল। সেই অকল্পনীয় আঘাত রানাকে বিদ্যুৎগতিতে ছুঁড়ে দিল একটা ইস্পাতের ভ্যাটের দিকে। এটা আসলে জানোয়ারের আরেকটা চড়, একই গালে লাগলে এতক্ষণে রানা বোধহয় মারাই যেত। ভ্যাটের গা থেকে মেঝেতে খসে পড়ল ও, জ্ঞান হারিয়েছে আগেই। বলা মুশকিল এই জ্ঞান আবার কখন ফিরবে ওর। কিংবা আদৌ ফেরে কি না।

তেরো

রানা জ্ঞান হারাবার পর হাঁটু গেড়ে পাশে বসল জানোয়ার। নিস্তেজ শরীরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে, এক ইঞ্চি চামড়াও বাদ দিল না। প্রথমে ডান হাতের, তারপর বাম হাতের নখগুলো দেখল। দু'হাতের যে সব নখে আবরণ রয়েছে সেগুলো চিনতে পারল সে। প্রতিটি আবরণ নিজের নখ দিয়ে খুঁটে খুলে নিল। এগুলো হুজুরকে দেখাবার জন্য পকেটে রেখে দিল জানোয়ার, তারপর চাকতি দিয়ে হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল শাটল থেকে।

চোখে-মুখে পানির ছিটা দিয়ে আর ফুলে ওঠা গালে বরফ বুলিয়ে রানার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল তাপসী। চোখ মেলে প্রথমেই রানা খেয়াল করল, তাপসীর মাথার উপর একটা হ্যাচ খোলা। ধড়মড় করে উঠে বসল ও।

'ক'টা বাজে?'

'রাত আটটা।' রানার একটা কব্জি ধরল তাপসী। 'আপনি শান্ত হন, ঠাকুর। যা কিছু করার ঠাণ্ডা মাথায় করতে হবে। আপনি তিন ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন। ইতোমধ্যে কেউ যদি আপনার কাব্যশক্তি বা নোবেলপ্রাইজ কেড়ে নিয়ে থাকে, আমার কিছু করার নেই।'

তাপসী ওর পালস্ দেখছে বুঝতে পেরে হাতটা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'আমি সুস্থ, তাপসী। শুধু গালটা টাটিয়ে আছে, পারলে একটা পেইনকিলার দাও।' ইঙ্গিতে খোলা হ্যাচটা দেখাল। 'কে আছে ওপরে?'

'তুমি যেটাকে ওপর বলছ সেটা আসলে লোয়ার ডেক,' বলল তাপসী

'ওখানে লকার, ফ্রিজার ইত্যাদি আছে। আমরা রয়েছি লোয়ার হোল্ডে। লোয়ার ডেক থেকে সিঁড়ি বেয়ে আবাবিল স্পেস শাটলের কন্ট্রোল কেবিনে পৌঁছানো যায়। না, ওপরে কেউ নেই। তোমার জন্যে বরফ আর পানি আনার জন্যে হ্যাচটা আমিই খুলেছি।'

রানার পেশীতে ঢিল পড়ল। 'তারমানে কি তোমার কাছে ম্যাগনেটিক চাকতি আছে?'

'নাহ! ভিতরের হ্যাচ হাতল ঘুরিয়ে খোলা যায়।'

'কাজ শেষ করে হ্যাচটা তোমার বন্ধ করা উচিত ছিল।'

'ঘুম না হলে কাজ করতে পারব না, তাই তিন ঘণ্টা ছুটি দিয়েছে কবীর চৌধুরী। হ্যাচটা জানোয়ার খুলে দিয়ে গেছে, আমি যাতে লকারে শুতে পারি।'

কথাটা শোনামাত্র খিদে অনুভব করল রানা। 'আমরা খাব কী?'

'পাউরুটি, মাখন, জেলি–এইসব দিয়ে গেছে জানোয়ার। ইচ্ছে হলে খাও তুমি, আমার খিদে নেই।' খাবার ট্রে-টা আড়াল থেকে তুলে এনে রানার সামনে রাখল তাপসী।

দ্বিতীয়বার সাধতে হলো না, ট্রের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। তবে তাপসী বাধা দিল ওকে। নারীসুলভ আন্তরিক দরদ আর সেবার মনোভাব নিয়ে রুটিতে মাখন আর জেলি মাখিয়ে দিল সে, খানিক পর দেখা গেল নিজের হাতে রানাকে খাইয়েও দিচ্ছে।

খেতে খেতে আলাপ করছে ওরা।

'তোমার খিদে নেই কী এজন্যে যে রকেটের ফুয়েল ইগনাইট না করার যে কমান্ড তুমি সংশ্লিষ্ট কমপিউটরে পাঠিয়েছিলে তা ধরা পড়ে গেছে?'

মুচকি একটু হাসল তাপসী। 'কবীর চৌধুরী তোমাকে তা হলে কথাটা বলেছে! তবে না।' মাথা নাড়ল সে। 'খিদে নেই ক্লান্তিতে।'

'তুমি বলতে চাইছ এত বড় একটা ব্যর্থতার কোন প্রতিক্রিয়া নেই তোমার ভেতর?'

দীর্ঘ পাঁচ সেকেন্ড একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তাপসী। তারপর বলল, 'তাহলে শোনো। কমপিউটরগুলোকে একটা নয়, দুটো কমান্ড দিই আমি। প্রথমটা ধরা পড়ে গেছে, কারণ কমান্ডটা শাটলগুলোর কমপিউটরে ঢোকার পরও আমি সেটা মুছে ফেলিনি।

'এরপর দ্বিতীয় কমান্ডটা দিই। এবং সেটা জায়াগামত পৌঁছানোর পর আমি মুছে ফেলি।'

'তারমানে তুমি নিজেই চেয়েছ প্রথম কমান্ডটা কবীর চৌধুরীর চোখে ধরা পড়ুক!'

হ্যাঁ বা না কিছু না বলে তাপসী হাসছে।

'দ্বিতীয় কমান্ডটা কী ছিল?'

'মারে ভূত জব্দ হয় বলে বিশ্বাস করি আমি। বলতে চাইছি, টরচারে কাজ

হয়। কাজেই তোমার না জানাই ভাল।'

ব্যাপারটা নিয়ে রানা জিদ ধরল না। বলল, 'বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেছ তুমি। ওদেরকে বলেছ, কবীর চৌধুরী কী করতে যাচ্ছে?'

হেসে ফেলল তাপসী। 'জানি কী বলতে চাইছ। কবীর চৌধুরী অভিযোগ করছিল–তুমি নাকি ওদেরকে নিয়ে দল পাকাবার কথা ভাবছ। কিন্তু তা সম্ভব নয়, রানা।'

'কেন সম্ভব নয়? ওরা কি সত্যিসত্যি স্বেচ্ছায় মরতে চাইছে?'

'হ্যাঁ, চাইছে,' জোর দিয়ে বলল তাপসী। 'চাইছে এই জন্যে যে ওদের ব্রেন পুরোপুরি রক্ত-মাংসের নয়। ওরা সাইবর্গ, রানা! কমপিউটরের কমান্ড রিসিভ করতে পারে। কবীর চৌধুরী ওদেরকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে।'

হঠাৎ রানার মনে পড়ল, কবীর চৌধুরী ওকে বলেছে সাতশো সাইবর্গ তৈরি করেছে সে, তার মধ্যে ত্রুটিবিহীন বেরিয়েছে একশো আশিজন। ওহ্, গড! বাকি পাঁচশো বিশজন তা হলে বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান আর গার্ডের দায়িত্ব পালন করছে!

'অর্থাৎ কারও কাছ থেকে কোন সাহায্যই আমরা পাব না। তা হলে উপায়? আমাদের চোখের সামনে একটা বদ্ধ উন্মাদ দুনিয়ার সব মানুষকে মেরে ফেলবে?'

'আমি বলি কী, এসো প্রথমে নিজেদেরকে বাঁচাই আমরা,' বলল তাপসী। 'আমরা যদি বেঁচে থাকি, দুনিয়ার মানুষকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা অন্তত করতে পারব। কি, ঠিক বলিনি?'

'নিজেদেরকেই বা কীভাবে বাঁচাব আমরা?'

'বাঁচতে হলে প্রথমে দরকার শক্তি। আর শক্তি আসে বিশ্রাম ও ঘুম থেকে। চলো, লোয়ার ডেকে উঠে লকারে শুয়ে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে নিই। তারপর রণকৌশল নিয়ে গবেষণা করা যাবে।'

'খাওয়াদাওয়ার পর আমারও ঘুম পাচ্ছে বটে, তবে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে চাই।' হোল্ডের দেয়ালে ইস্পাতের ব্র্যাকেটে আটকানো পেটমোটা ভ্যাটগুলোর উপর চোখ বুলাল রানা। হ্যাচের পাশের গর্ত দিয়ে এক সঙ্গে ভিতরে ঢুকবার পর সরু ইস্পাতের পাইপগুলো আলাদা হয়ে পঁচিশটা ভ্যাটে প্রবেশ করেছে। 'শাটলের অর্ধেক জায়গা তো দেখছি ওগুলোই দখল করে রেখেছে। এগুলোয় কী ভরা হবে, জানো নিশ্চয়?'

'জানি না আবার! ব্যাপারটা তো ওপেন সিক্রেট।'

ট্রে সরিয়ে রেখে সিধে হলো রানা। 'তুমি যা হোক কিছু মুখে দাও, আমি ভ্যাটগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখি, কেমন?'

'না,' বলল তাপসী, গলার স্বরে খানিকটা অভিমান ঝরে পড়ল। 'সেই তখন থেকে বলছি আমি ক্লান্ত, আমার ঘুম পেয়েছে, কথাটা তুমি কানেই তুলছ না। তিন

ঘণ্টা পর জানোয়ার আমাকে নিতে আসবে…'

'কেন?'

'কারণ সাইবর্গরা মেকানিক হিসেবে ভাল নয়, রকেটে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে তা তারা মেরামত করতে পারছে না। আবার কবীর চৌধুরী নিজেও নতুন ধরনের এই রকেটের মেকানিজম ভাল বোঝে না। নিজে ঠিক করবে বলে রকেটের ইঞ্জিন খুলে ওঅর্কশপে নিয়ে গেলেও, আমি জানি আমাকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখছে সে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি লোয়ার ডেকে গিয়ে লকার খোলো, আমি একটু পরেই আসছি…'

'একটু পরে নয়, আমার সঙ্গে এখনই চলো,' জিদ ধরল তাপসী। 'তাছাড়া, ভ্যাটগুলো আগেই আমি পরীক্ষা করেছি, তুমি শুধু শুধু সময় নষ্ট না করলেও পারো। ওগুলো খালি, ঠন-ঠন করছে।'

অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাপসীর আবদার মেনে নিল রানা। মেয়েটার পিছু নিয়ে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল।

লকারগুলো প্লাস্টিকের তৈরি বিশাল আকৃতির বুদ্বুদের মত দেখতে, তবে প্রতিটিতে মাত্র একজন অ্যাস্ট্রোনট শুতে পারে। তাপসীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে উল্লাস বোধ করল রানা, মৌন সম্মতি জানিয়ে একটা লকারেই উঠল দু'জন।

তারপর কী হলো না হলো ওরাই ভাল বলতে পারবে। তবে বরাদ্দ করা তিন ঘণ্টার মধ্যে মাত্র পৌনে দু'ঘণ্টা ঘুমাতে পারল তাপসী। কাঁচা ঘুম থেকে তুলে রানা তাকে রীতিমত জেরা শুরু করল। কবীর চৌধুরীর ওঅর্কশপটা কোথায়, সেখানে কীভাবে পৌঁছানো যায়, ওঅর্কশপে কবীর চৌধুরীর সঙ্গে আর কে আছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তাপসী। তারপর তাকে নির্বাক করে দিয়ে মুখোশ আর সাদা আলখেল্লা খুলে ফেলল রানা। এখন আর বৃদ্ধ রবি ঠাকুর নয় ও। মুখোশটা পরতে যেমন সময় লাগে, খুলতেও কম সময় লাগল না। মুখোশের সঙ্গে রয়েছে সেনসরসহ কন্ট্যাক্ট লেন্স। ব্রেনওয়েভ ধরবার জন্য চামড়ার নীচের নার্ভগুলোয় আলাদা সেনসর সহ ক্লিপ বসানো আছে। এ-সব অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সাবধানে ছাড়াতে হলো শরীর থেকে। তাপসীকে রানা চমকটা দিল মুখোশটা খোলা শেষ হতে। ওর শার্টের কলার আর ট্রাউজারের পায়ার নীচের ভাঁজ থেকে বেরুল বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সহ নতুন আরেকটা মুখোশ–বর্তমান কবীর চৌধুরীর। দ্রুত, প্রায় অভ্যস্ত হাতে, সেটা পরে নিল রানা।

'কে বলবে কবীর চৌধুরী নও তুমি!' তাপসী উত্তেজিত। 'কিন্তু এই চেহারা তোমার কী কাজে আসবে, এখান থেকে যদি বেরুতে না পারো?'

কথা না বলে হাতের মুঠো খুলে ম্যাগনেটিক চাকতিটা দেখাল রানা। 'তুমি বলেছ চাকতি থাকলে শাটলের নাক থেকে হ্যাচ গলে বেরুনো সম্ভব, সেখান থেকে মোবাইল ছাদ হয়ে নীচে নামা যাবে।'

'কিন্তু দু'জন কবীর চৌধুরী বোধহয় শুধু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করবে, কাজের কাজ

কিছু হবে কি?'

'তোমার কাজ হবে ওঅর্কশপে কবীর চৌধুরীকে আটকে রাখা। পারবে না?'

'চেষ্টা করব,' বলল তাপসী। 'কিন্তু তাতে লাভ কী? নীচে নেমে কী করতে চাও তুমি?'

'আমিও বিশ্বাস করি যে টরচারে কাজ হয়। কাজেই আমি কী করব তা তোমার না জানাই ভাল।' হাসছে রানা।

'একটু পরেই আমাকে নিতে আসবে জানোয়ার। সে যদি তোমাকে এই মুখোশ পরা অবস্থায় দেখে, অবশ্যই কবীর চৌধুরী বলে ধরে নেবে না। আবার তোমাকে দেখতে না পেলেও সন্দেহ করবে।'

'তুমি এখনি হোল্ডে নেমে যাও,' বলল রানা। 'জানোয়ার এলে বলবে আমি একটা লকারে ঘুমাচ্ছি।'

'কিন্তু সে যদি তোমাকে দেখতে চায়?'

'দেখতে চাইলে এখানে উঠে আসবে। দেখবে আমি নেই। কোন পথে পালিয়েছি তাও সে বুঝতে পারবে। এরপর হন্যে হয়ে সবাই আমাকে খুঁজবে। খুঁজুক। এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। দেরি কোরো না, এবার তুমি হোল্ডে নামো। আমিও রওনা হচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাচের দিকে এগোল তাপসী। হাতঘড়ির উপর একবার চোখ বুলাল সে। তার হিসেবে জানোয়ারের আসতে এখনও পনেরো মিনিট দেরি আছে।

নিজের কোয়ার্টারে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল জানোয়ার, তার নিঃশ্বাসের ঝাপটায় দেয়ালের ক্যালেন্ডারটা বারবার ডানা মেলে উড়ে যেতে চাইছে। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, সেটা বাজতে শুরু করল। ঘুম ভাঙার পর চোখ না খুলেই, অন্ধের মত হাতড়ে টেবিল ক্লকটা ধরল সে, তারপর এক আছাড়ে সেটার নাড়ীভুঁড়ি সব বের করে ফেলল।

বিছানা ছেড়ে চোখ রগড়াল, লাথি মেরে দরজা খুলল, তারপর বিশাল হলরুমে বেরিয়ে এল। যে রকেট নিয়ে ডক্টর তাপসী আর টেকনিশিয়ানরা কাজ করছিল সেটা ওঅর্কশপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জানে সে। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওরা কাজ করছিল, সেটা এই মুহূর্তে খালি। তবে সশস্ত্র গার্ডরা চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। শাটলের নীচে বিশাল একটা গহ্বর দেখা যাচ্ছে। ওটা হলো এগজস্ট চেম্বার, রকেটের ফুয়েল জ্বলতে শুরু করলে আগুনের শিখা ওই গহ্বরের তলদেশ পর্যন্ত নেমে যাবে। তলায় টানেল আছে, উত্তাপ আর ধোঁয়া সেই টানেল দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল জানোয়ার। মুখ তুলে প্রকাণ্ড আকারের প্যানেলগুলোর দিকে একবার তাকাল সে, জানে শাটল রওনা হওয়ার সময় হলে ওগুলো সরে যাবে। তবে জানে না একটু আগে ওই প্যানেল বা

মোবাইল ছাদের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে চলে গেছে রানা। বিশাল হলরুমের শেষ মাথায় এসে একটা দরজা খুলল জানোয়ার, তারপর চওড়া একটা প্যাসেজ ধরে এগোল। বেশি দূর যেতে হলো না, কবীর চৌধুরীকে দেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এ তার মনিবই, নিঃসন্দেহে চিনতে পারছে সে, কিন্তু মনিবের মধ্যে কী যেন একটা নেই।

'কোথায় যাচ্ছিস?' জানোয়ারকে দেখেই কর্কশ কণ্ঠে প্রায় গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী। 'তোর না তাপসীকে ওঅর্কশপে নিয়ে আসার কথা?'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আওয়াজ করে বারকয়েক হাত নাড়ল জানোয়ার, বোঝাতে চাইল তাপসীকে আনার জন্য হুজুরের অনুমতি নিতে যাচ্ছিল সে।

'ঠিক আছে, অনুমতি দিলাম,' ভারী গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'আয়, আমারও অনেক কাজ আছে ওদিকে।'

প্যাসেজ থেকে দরজা পেরিয়ে বিশাল হলরুমে বেরিয়ে এল ওরা। চারদিকে অন্তত বিশজন সশস্ত্র গার্ডকে টহল দিতে দেখা যাচ্ছে। কবীর চৌধুরী বা জানোয়ারকে দেখে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন ভাবান্তর ঘটল না।

'একজায়গায় এত লোক কেন?' ধমকে উঠল কবীর চৌধুরী। 'বিপদ যদি আসে পিরামিডের বাইরে থেকে আসবে, তাই না? তা হলে এরা সবাই ভিতরে কী করছে? জানোয়ার!'

'ঘোঁৎ!' মনিবের মধ্যে কী নেই তা জানোয়ার এখনও ধরতে পারছে না।

'একজন বাদে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বল।'

'ঘোঁৎ!' এবার আওয়াজটা খুব জোরে করল জানোয়ার, গার্ডরা সবাই যাতে তার দিকে ফেরে। তারপর ইঙ্গিতে নির্দেশটা বুঝিয়ে দিল। লাইন দিয়ে হলরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল গার্ডরা, একজন বাদে।

'এবার তুই যা, তাপসীকে নামিয়ে আন,' নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী।

ঝুলন্ত মঞ্চের দিকে এগোবার সময় গার্ডকে পিছু নেওয়ার ইঙ্গিত করল জানোয়ার।

'ওর এখানে কাজ আছে,' পিছন থেকে বলল কবীর চৌধুরী। 'তুই একা যা।'

মঞ্চ থেকে মই বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে জানোয়ার। মই বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার সময় ধাপ গোণা প্রায় একটা নেশার মত হয়ে গেছে তার। এখনও গুণছে সে। সাত···আট··· নয়···। একটু আগের খুঁতখুঁতে ভাবটার আর কোন অস্তিত্বই নেই।

'এই,' গার্ডকে ডাকল কবীর চৌধুরী। 'কারবাইন রেখে ভ্যাট দুটো পাইপ থেকে খোলো।'

একটা গোছায় পঁচিশটা সরু পাইপ থাকলেও ভ্যাট দুটোয় ঢোকার সময় দু'ভাগ হয়ে ঢুকেছে, ধরেই নেওয়া চলে যে একটায় আছে তেরোটা পাইপ, আরেকটায় আছে বারোটা।

নির্দেশ পেয়ে এগিয়ে এল গার্ড। কবীর চৌধুরীর হাতে কারবাইনটা ধরিয়ে

দিল। 'চাকতিটা দিন, মহামান্য প্রভু,' প্রায় যান্ত্রিক কণ্ঠে বলল সাইবর্গ গার্ড। 'ভ্যাট থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হলে পাইপ লক করতে হবে। কারণ এক ফোঁটা নার্ভ গ্যাস বাতাসে মিশে গেলে আপনাকে আমরা বাঁচাতে পারব না।'

'এই নাও, বৎস,' বলে পকেট থেকে চাকতিটা বের করে গার্ডের হাতে ধরিয়ে দিল কবীর চৌধুরী।

ঘুরে রেইলিং টপকাল গার্ড, মই বেয়ে একটা ভ্যাটের মাথায় উঠে যাচ্ছে। এক এক করে দুটো ভ্যাট থেকেই সরু পাইপের গোছা দুটো বিচ্ছিন্ন করল সে। রেইলিঙের বাইরে থেকে কবীর চৌধুরী বলল, 'প্রীত হলাম। এবার...'

শাটলের সেকেন্ড ফ্লোরের হ্যাচের সামনে পৌঁছে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করল জানোয়ার। চাকতিটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না সে। প্রতিটি পকেট তিনবার করে সার্চ করল। কিন্তু নেই। ভয়ে ভয়ে ঘাড় বাঁকা করে নীচে তাকাল। ভাবছে। চাকতি হারিয়ে ফেলেছে শুনলে মনিব তাকে ভয়ানক গালমন্দ করবেন। এই সময় গলায় কিছু আটকাতে বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো তার। মুখের ভিতর একটা আঙুল পুরে বাঁকা করল, তারপর টেনে বের করে আনল রূপালি চাকতিটা। নিজের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পেয়ে আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিল জানোয়ার। যে জিনিস মুখের ভিতর রয়েছে তা কী পকেট হাতড়ালে পাওয়া যায়! চিন্তায় পড়ে গেল সে। তার মনে হলো, ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। চাকতিটা তার মুখের ভিতর গেল কীভাবে!

খানিক পরেই শাটল থেকে তাপসীকে নিয়ে নেমে এল জানোয়ার। বিস্ময় ভরা অপলক দৃষ্টিতে কবীর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আছে তাপসী। সে একটা নিঃশব্দ ইঙ্গিত, একটা সূক্ষ্ম ইশারা পেতে চাইছে, যা দেখে বুঝতে পারবে রানাকেই দেখছে সে, কবীর চৌধুরীকে নয়।

'গার্ড,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তুমি খালি হাতে পিরামিডের বাইরে চলে যাও।'

'মহামান্য প্রভু যা বলেন,' কুর্নিশ করে পিছু হটল গার্ড, তারপর ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'জানোয়ার,' উর্দুতে বলল কবীর চৌধুরী। 'তোমাকে আমার দরকার। তাপসী একাই ওঅর্কশপে গিয়ে ইঞ্জিনটা দেখুক।' জানোয়ার তাকিয়ে নেই দেখে তাপসীর উদ্দেশে একটা চোখ টিপল।

তাপসী নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল, সে রানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'ঠিক আছে, আমি যাই,' বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল সে। ওর পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে দেখলে আসল কবীর চৌধুরী ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

তাপসী চলে যাওয়ার পর জানোয়ারকে নিয়ে পড়ল রানা। 'তোকে একটা জরুরী কথা বলব, জানোয়ার। কথাটা খুব কঠিন আর জটিল। জানি তোর মাথায় বুদ্ধি কম, তাই যতটা পারা যায় সহজ করে বলছি। তুই তো জানিসই যে দুনিয়ায় আমি নতুন একটা জাতিকে বসবাস করতে দেব। এই জাতি আমিই তৈরি

করেছি। দুনিয়াতে শুধু তারাই থাকবে। মানুষ বলতে একা শুধু আমি থাকব। কি বলছি বুঝতে পারছিস, জানোয়ার?'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল জানোয়ার। মাথা নাড়ছে। অর্থাৎ, বোঝাতে চাইছে, যদি বুঝতে পেরে থাকেও, মেনে নিতে পারছে না।

'তোকে আমি ভালবাসি, জানোয়ার,' বলল রানা। 'সত্যি ভালবাসি। কিন্তু অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। এখন তুই-ই বল, কী ভাবে মরতে চাস? রানা আর তাপসীকে আমি হয়তো মহাশূন্যে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেব। কিংবা ওদেরকে হয়তো এখানেই রেখে যাব, বাকি সাতশো কোটি মানুষের মত ওরাও নার্ভ গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। কিন্তু তুই আমার স্নেহধন্য...'

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে জানোয়ার। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। দৃষ্টিতে আক্রোশ আর ঘৃণা। রানার দিকে এক পা এগোল সে।

'এত রাগছিস কেন তুই, জানোয়ার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুই তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও আমার কথায় মরতে রাজি ছিলি।'

জানোয়ার এখন আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছে না। কিছুক্ষণ হলো তার মনে আবার ফিরে এসেছে খুঁতখুঁতে ভাবটা। মনিবের হাতে বাগিয়ে ধরা কারবাইন দেখে তার চৈতন্য ফিরেছে: ওখানে কারবাইন নয়, থাকবার কথা একটা ল্যাপটপ।

অকস্মাৎ উন্মত্ত হাতির মত কর্কশ একটা ডাক ছাড়ল জানোয়ার। তারপর আবার সেই চড় মারবার জন্য হাত তুলল।

আনআর্মড কমব্যাটে ওই দৈত্যের সঙ্গে রানা পারবে না। বাধ্য হয়ে পিছু হটছে ও। চড় তুলে ছুটে এল জানোয়ার, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে লাথি চালাল। লাথিটা আসছে দেখে একপাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা। বলতে পারবে না কী ভাবে সংযোগ ঘটল, শুধু অনুভব করল ওর নিতম্বে কেউ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়েছে, সেই ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠে এসেছে ও। রেইলিং টপকে একটা অ্যালুমিনিয়াম ট্যাংকের গায়ে পড়ল, সেখান থেকে খসে মেঝেতে, হাতের কারবাইনটা শরীরের নীচে চাপা পড়েছে।

উড়ে নয়, হেঁটে এল জানোয়ার। লোহার রেইলিং টপকাল না, স্রেফ গায়ের ধাক্কায় ঝালাই ভেঙে ঢুকে পড়ল ভিতরে। কারবাইনটা রানা ছাড়েনি, তবে কায়দা মত এমনভাবে ঘোরাতেও পারেনি যে ট্রিগার টানলে জানোয়ারকে লাগবে। ভুললে চলবে না লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট নার্ভ গ্যাস ভর্তি ভ্যাটে লাগলে কী ঘটবে। ঝুঁকে হালকা একটা পুতুলের মত রানাকে দু'হাত দিয়ে ধরে তুলে নিল জানোয়ার। তুলল একেবারে মাথার উপর। জোরে আছাড় মারতে হলে এত উপরেই তুলতে হয়। জানোয়ারের মাথার উপর ঝুলছে রানা, দেখল কারবাইনের মাজল সরাসরি তার চাঁদিতে তাক করা। তারপরও রানা ট্রিগারে টান দেয়নি।

হঠাৎ রানাকে মিছিমিছি একবার ভয় দেখাল জানোয়ার। ভয় দেখাল মানে, আছাড় মারবার ভঙ্গি করল, কিন্তু আছাড় মারল না। তারপরই গলা ছেড়ে ঘোঁৎ-

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে নাকি স্বরে হাসি। ঠিক তখনই ট্রিগারে পেঁচানো রানার আঙুল ঝাঁকি খেলো। সেমি অটোয় ছিল কারবাইন, ছোট্ট এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হলো জানোয়ারের মাথার মাঝখানে।

লাশ সটান আছাড় খেতে হলরুমের পাকা মেঝেতে ছিটকে পড়ল রানা, কারবাইন হাত থেকে ছুটে আরেক দিকে চলে গেল।

সংক্ষিপ্ত বুলেট বৃষ্টির পর নীরবতা জমাট বাঁধবার সময় পেল না। মৃদু যান্ত্রিক শব্দ শুনে উৎসের সন্ধানে একটা পিলারের দিকে তাকাল রানা। ব্র্যাকেটে আটকানো একটা মোবাইল ক্যামেরা ওর দিকে ঘুরে যাচ্ছে। লেন্সটা সরাসরি ওর দিকে তাক হলো। পর মুহূর্তে অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ভেসে এল পাগল বিজ্ঞানীর হুংকার: 'তোমার এত বড় স্পর্ধা, রানা, আমার ছদ্মবেশ নিয়েছ! এই, গার্ডরা সবাই কোথায় গেলে! অ্যাটেনশন, অ্যাটেনশন, প্লিজ! অস্ত্রধারী গার্ডরা যে যেখানে আছ, হলরুমে ঢুকে আমার ছদ্মবেশধারীকে গ্রেফতার করো। দিস ইজ ইওর মেকার কলিং! আমি কবীর চৌধুরী তোমাদের স্রষ্টা...'

একের পর এক দরজা খুলে পিলপিল করে সাইবর্গ গার্ডরা হলরুমে ঢুকছে, প্রত্যেকের হাতে বাগিয়ে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র। যেন মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে টলমল পায়ে সিধে হলো রানা। চারদিক থেকে বৃত্তটা ছোট হয়ে আসছে দেখে হাত দুটো একটু উঁচু করল ও—আত্মসমর্পণের ভঙ্গি।

আবার অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'ওকে তোমরা এমন জায়গায় নিয়ে যাও যেখানে একটু আঁচ পাবে। তবে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করো। ওঅর্কশপ থেকে আরও একজনকে পাঠাচ্ছি। দু'জনকে একসঙ্গে আটকে রাখবে তোমরা।'

পাঁচ মিনিট নয়, তিন মিনিটের মধ্যে দু'জন গার্ড পাহারা দিয়ে নিয়ে এল তাপসীকে। গার্ডদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে কবীর চৌধুরী, তারা আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে হলরুমের এক প্রান্তে এসে একটা ট্র্যাপডোরের দরজা খুলল। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামবার সময় দু'জন গার্ড সামনে থাকল, দু'জন পিছনে।

'তোমার সার্ভিস দরকার নেই তার?' প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় তাপসীকে জিজ্ঞেস করল রানা।

তাপসীর মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। মাথা নাড়ল সে। 'সত্যি বিরল প্রতিভা। গিয়ে দেখি কোথায় ত্রুটি তা তো ধরতে পেরেছেই, বারো আনা মেরামতও করে ফেলেছে।'

'তুমি যে কারিগরি ফলিয়েছ, সেটা কি ধরা পড়ে গেছে?'

'না। আর তুমি যেটা করতে চেয়েছিলে, সেটা? পেরেছ করতে?'

'পেরেছি, কিন্তু যা করেছি সেটা সেরকমই থাকবে, নাকি বদলে যাবে, বলা মুশকিল।' রানা উদ্বিগ্ন। 'যদি বদলে যায়, দুনিয়ার কেউ আমরা বাঁচব না।'

প্যাসেজটা দু'বার বাঁক নিল। সামনে ভারী কাঠের একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, ইস্পাতের পাত দিয়ে মুড়ে মজবুত করা হয়েছে। এই দরজা খুলবার জন্য সরু

ফাটলে ম্যাগনেটিক চাকতি ঢোকাতে হয় না। একজোড়া ভারী বোল্ট সরিয়ে সামান্য একটু ফাঁক করা হলো কবাট। পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। উল্টোদিকের দেয়াল ধরে কোন রকমে ভারসাম্য রক্ষা করল। ঘুরে হাত বাড়াল, জানে তাপসী ধাক্কাটা সামলাতে পারবে না।

সরাসরি ওর আলিঙ্গনের ভিতর ঢুকে পড়ল তাপসী। ঘটাং করে শব্দ হলো, অর্থাৎ বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তাপসীকে সিধে হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়ে উঁচু, খিলান আকৃতির চেম্বারটার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। মাঝখানে একটা টেবিল রয়েছে, টেবিলের চারদিকে দুটো করে চেয়ার। এক্সিকিউটিভ বোর্ডরুম বলে মনে হলো, তবে কোন জানালা নেই।

'এ আমাদেরকে কোথায় রেখে গেল বলো তো?' ফিসফিস করল রানা।

'বেযমেন্টে নামার পর প্যাসেজ ধরে কত দূরে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল তাপসী। 'পিরামিডের বাইরে বেরিয়েছি বলে তো মনে হয় না।'

মুখ তুলে অনেক উপরে, সিলিঙের দিকে তাকাল রানা। কেন যেন মনে হলো ওরা একটা কুয়ার ভিতর রয়েছে।

'রানা, তুমি জানো কবীর চৌধুরী আমাদেরকে নিয়ে কী করবে?'

'কী জানি কী করবে। যদি আগের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে, কয়েক মাইল ওপরে ওঠার পর শাটল থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে, ভ্যাটগুলোর সঙ্গে।'

'তাহলে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা বা তার কিছু বেশি বেঁচে আছি,' বলল তাপসী। 'মা দুর্গা! রক্ষে করো গো, মা।'

'হ্যাঁ, শেষবারের মত দুর্গতিনাশিনীকে ভাল করে ডাকো, তাপসী,' সিলিং থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ভেসে এল কবীর চৌধুরীর ভরাট কণ্ঠস্বর। 'পরে আর সময় পাবে না। কাল নয়, বুঝলে, এখন থেকে ছ'ঘণ্টা পর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি। শুধু শুধু দেরি করে ঝুঁকির মাত্রা বাড়াই কেন বলো। হাই, রানা, জীবনের শেষ ভোরটাকে কীভাবে নেবে তুমি? মনে রেখো, একা শুধু তোমার জীবনে নয়, গোটা মানবসভ্যতার জন্যে এটাই সর্বশেষ ভোর। এরপর মানুষ পদবাচ্য মাত্র একজন প্রাণী থাকবে–আমি।'

'কিন্তু একদিন তুমিও মারা যাবে, কবীর চৌধুরী।'

'না! মিথ্যেকথা! আমি কোনদিন মরব না! আমি অমর! আমি অমর! কেন, তোমাকে আমি বলিনি, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে নিজের প্রতিরূপ তৈরি করব আমি? এখনই তো ক্লোন প্রযুক্তির সাহায্যে শরীরের ভাইটাল সব পার্টস তৈরি করছি। তা না হলে আমি খোঁড়াচ্ছি না কেন? কীভাবে ঘাড় নাড়তে পারছি? এক সময় আমার প্রতিটি ভাইটাল অর্গানই কৃত্রিম হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমাকে মানুষ বলা যাবে না, কিন্তু অমর অবশ্যই বলতে হবে।'

'বেশ, পরমায়ু পেলে তুমি,' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'কিন্তু তারপর? তারপর কী?'

'তারপর আমি ঈশ্বর। পৃথিবী নামক গ্রহের সমস্ত সম্পদ একা আমার দখলে চলে আসছে। এখানে আমার অনুগত ভৃত্যের মত একটা জাতি বংশ বিস্তার করবে।

আমি হব তাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক, হায়াত আর রিজিকের মালিক। আমি হব...'

'চোপ শালা!' মনে মনে বলল রানা। দাঁতে দাঁত পিষছে। 'আগে ছিলি আধপাগল, এখন দেখছি বদ্ধ উন্মাদ!'

'হায়, মানুষ হয়ে জন্মে এই একটাই দুঃখ রয়ে গেল–রানা, তোমার কাছ থেকে আমি প্রাপ্য মর্যাদাটুকু আদায় করতে পারলাম না। তুমি আমার কত ক্ষতি করেছ, কিন্তু বলতে পারবে তোমাকে কখনও আমি গাল দিয়েছি? নাহ্, তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াটা আমারই বোকামি। যাই, হে। হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, চিন্তা করে দেখি তোমাদের কী ব্যবস্থা করা যায়।'

'তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমার পাঁচটা শাটল নিউ টার্নিং পয়েন্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা হলো, সিদ্ধান্ত নিলাম আমার বিদায়ের আগুনে তোমাদেরকে পুড়িয়ে মারব।' প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর আবার শোনা গেল কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। একই সঙ্গে ওদের মাথার উপর থেকে দু'ফাঁক হয়ে দু'দিকে সরে গেল সিলিংটা। দম আটকাল রানা। ও তাকিয়ে আছে সাতটা ব্যারেল-এর দিকে, যেগুলোর ভিতর প্রকাণ্ড আকারের রকেট ইঞ্জিন রয়েছে। রকেটগুলোর উপরে দেখা যাচ্ছে আবাবিল স্পেস শাটল, প্রোপেলেন্ট ট্যাংক আর বুস্টার রকেট সহ।

রানার মনে পড়ল, গার্ডদের কবীর চৌধুরী নির্দেশ দিয়েছিল: ওকে তোমরা এমন জায়গায় নিয়ে যাও যেখানে একটু আঁচ পাবে। রকেট লঞ্চ করবার জন্য যে এগজস্ট চেম্বার দরকার হয়, গার্ড ওদেরকে সেখানে রেখে গেছে। স্পেস শাটলের মাথার উপর থেকেও প্রকাণ্ড আকারের প্যানেলগুলো সরে গেল। অনেক উঁচুতে ভোরবেলার আকাশ দেখা যাচ্ছে।

গহ্বরের কিনারায় কবীর চৌধুরীর ছায়া-ছায়া কায়াটা দেখা গেল। গর্বিত ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে নাড়ল সে। 'এই রকেট যখন রওনা হবে, তোমরাও তখন পুড়ে মরবে।' আবার হাত নাড়ল সে। স্পেস শাটলের ফ্লাইট ডেক থেকে একটা এলিভেটর নেমে আসছে। 'বিদায়, রানা। বিদায়, তাপসী।' ব্যঙ্গ করে ওদেরকে একটা স্যালুট ঠুকল সে, তারপর উঠে পড়ল এলিভেটরে। এলিভেটর যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে উপরে উঠে যাচ্ছে। রকেট ব্যারেলগুলোর দিকে তাকিয়ে কল্পনার চোখে বিশাল মেঘের মত আলোড়িত আগুন দেখতে পাচ্ছে রানা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাড় পর্যন্ত মিহিন ছাই হয়ে যাবে।

'আবাবিল সিক্স! ফোর মিনিটস টু লিফট-অফ,' একজন টেকনিশিয়ানের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

তাপসীর মরিয়া দৃষ্টি এড়িয়ে চেম্বারের চারদিকের দেয়ালে চোখ বুলাচ্ছে রানা। জানালা ও ভেন্টিলেটর না থাকা সত্ত্বেও অক্সিজেনের অভাবে ওদের দম আটকে আসছে না। দেয়ালঘেঁষা একটা স্টীল কেবিনেট ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে রানা।

'তুমি মনে করো দেয়াল বেয়ে ওপরে ওঠা যাবে?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল তাপসী।

'দেয়াল বেয়ে–নাহ্! কোনও এয়ার শ্যাফট পাওয়া যায় কি না দেখছি আমি ।' মেঝেতে হাঁটু গাড়ল রানা। মেঝে থেকে এক ফুট উপরের দেয়ালে চৌকো একটা ফাঁক পেয়েছে ও। এক গাদা মেটাল বার-এর ফাঁকে সরু একটা শ্যাফট সত্যিই দেখা যাচ্ছে। লম্বায় সম্ভবত ত্রিশ ফুট হবে। শেষ মাথায় জঙ্গলের আভাস উৎসাহ জাগাল মনে। বারগুলো ধরে দাঁতে দাঁত পিষল রানা। টানছে তো টানছেই, সারা মুখ ঘামে ভিজে গেল, কিন্তু বার নড়ে না। চোখে আশার আলো নিভে যাচ্ছে, ওর পাশে হাঁটু গাড়ল তাপসী।

'থ্রী মিনিটস টু লিফট-অফ!'

এক এক করে মেটাল আর্মগুলো রকেটের গা থেকে খুলে আসছে। এরইমধ্যে কয়েকটা রকেটের ইঞ্জিন থেকে পাতলা ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে। রকেটগুলোকে নিয়ে গোটা স্ট্রাকচার যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে।

'সরো, আমাকে দেখতে দাও!' বলে রানাকে একরকম ঠেলে সরিয়ে দিল তাপসী। হাতঘড়িটা খুলে ফেলল সে। সেটা উল্টো করে বারগুলোর গায়ে ছোঁয়াল, আঙুল দিয়ে খুঁটে ঘড়ির ব্যাক কাভার আগেই খুলে ফেলেছে। এরপর খুদে একটা বোতামে চাপ দিতেই খানিকটা অ্যাসিড ঝরে পড়ল বারগুলোয়। হিসহিস করে শব্দের সঙ্গে গলে যাচ্ছে বারগুলো।

'টু মিনিটস্ টু লিফট-অফ!'

'ঢোকো!' শ্যাফটের ভেতর ঢুকতে তাপসী ইতস্তত করছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

ওর চোখ বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করেছে। চেম্বারের ভিতরটা বাষ্প আর ধোঁয়ায় ভরাট হয়ে গেছে। এবার পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ভেসে আসছে ফাইনাল কাউন্টডাউন।

'ওয়ান মিনিট টু লিফট-অফ!'

রানার কানে মৃত্যুঘণ্টা বাজছে। শ্যাফটে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে তাপসীকে অনুসরণ করছে ও। ষাট সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ধাওয়া করবে ওদেরকে। লোহার একটা গোঁজ হাঁটু থেকে খানিকটা মাংস তুলে নিল, কিন্তু সেদিকে রানার খেয়ালই নেই। পিছন থেকে প্রচণ্ড গর্জন ভেসে আসছে। তাপসীর শরীর বাতাস আর আলো আটকে রেখেছে, সামনের কিছুই রানা দেখতে পাচ্ছে না। নতুন একটা আতঙ্কের সঙ্গে উপলব্ধি করল শ্যাফটটা ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে। ওর কাঁধ দু'পাশের পাথরে ঘষা খাচ্ছে। আরও বোধহয় পনেরো ফুট এগোতে হবে। নাহ, শেষ রক্ষা বুঝি হলো না।

'টেন…নাইন…এইট–'

'তাড়াতাড়ি! জলদি!' গর্জে উঠল রানা।

'সিক্স…ফাইভ…'

সামনে থেকে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল তাপসী। তার বদলে সবুজ ও চৌকো একটা আলো দেখতে পেল রানা। ওরা যে শ্যাফটে রয়েছে সেটার সঙ্গে আরেকটা শ্যাফট যুক্ত হয়েছে এখানে, বাঁকটা ঘুরে গেছে ডান দিকে।

'থ্রী...টু...ওয়ান...ইগনিশন...লিফট-অফ!'

প্রায় ব্যাঙের মত লাফিয়ে এক শ্যাফট থেকে আরেক শ্যাফটে চলে এল রানা, দেখল ওর সামনে দ্রুত ক্রল করছে তাপসী। এই মাত্র ছেড়ে আসা শ্যাফট ধরে সগর্জনে ছুটে গেল কমলা রঙের অগ্নিস্রোত। আঁচ লাগায় চিৎকার করে উঠল রানা। মুহূর্তের জন্য ভয় হলো, এই গরমে নির্ঘাত মারা যাবে ও।

'রানা!'

'আমি ঠিকই আছি।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'থেমো না!' শ্যাফটের সামনে কোথাও আলো আর বাতাস পাওয়া যাবে, এই আশায় আহত পিঁপড়ের মত এগোচ্ছে রানা। এভাবে কতক্ষণ এগিয়েছে বলতে পারবে না। এক সময় দেখল সামনে একটা গ্রিল। গ্রিলের সামনে পাথরের একটা কারনিস। একটা হেলিকপ্টার রোটরের আওয়াজ ঢুকল কানে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ভেসে আসা আওয়াজ এখনও শোনা যাচ্ছে, তবে অস্পষ্ট।

রানা পৌঁছবার আগেই টানাটানি করে গ্রিলটা ভেঙে ফেলেছে তাপসী। গ্রিল মানে, তারের জাল। হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসে চারদিকে তাকাল ওরা। ওদের ডান পাশে ছোট একটা এয়ারস্ট্রিপ দেখা যাচ্ছে। স্ট্রিপের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা কার্গো প্লেন। আরেক পাশে একটা হেলিকপ্টার এইমাত্র ল্যান্ড করল, ককপিট থেকে নেমে একটা দালানের দিকে হাঁটছে পাইলট।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়ার একটা রেখা দেখতে পেল রানা। সেদিকে ইঙ্গিত করে তাপসীকে বলল, 'কবীর চৌধুরী চলে গেছে। এবার তুমি বলতে পারো কথাটা।'

'আগে তুমি,' বলল তাপসী। 'কী নাকি বদলালে আমরা কেউ বাঁচব না...'

'শাটলে যে ভ্যাটগুলো আছে,' বলল রানা, 'সেগুলোয় নার্ভ গ্যাসের বদলে আমি পানি ভরে দিয়েছি।'

'ওয়ান্ডারফুল!'

'সত্যি ওয়ান্ডারফুল কি না বোঝা যাবে খানিক পর। কবীর চৌধুরীর ফেলা ভ্যাট থেকে নার্ভ গ্যাস ছড়িয়ে পড়লে আমরা সবাই মারাও যেতে পারি।'

'কী আশ্চর্য! এই না তুমি বললে ওগুলোয় নার্ভ গ্যাসের বদলে তুমি পানি ভরেছ?'

'আমি তো পানিই ভরেছি, কিন্তু কবীর চৌধুরী সেই পানি ফেলে তার বদলে নার্ভ গ্যাস ভরেনি তো? এক-আধটু নয়, হাতে ছয় ঘণ্টা সময় পেয়েছে সে। তার জানামতে ভ্যাটগুলো খালি থাকার কথা। কিন্তু যখন দেখল ওগুলো ভরা তখন কী সে পরীক্ষা করবে না? আর পরীক্ষা করলেই তো জেনে ফেলবে নার্ভ গ্যাস নয়, ওগুলোয় পানি রয়েছে। ফলে পানি ফেলে দিয়ে...'

'সর্বনাশ!'

'কী হলো?'

আকাশের দিকে একটা হাত তুলল তাপসী। 'ওই দেখো, কালো একটা বিন্দু! এ নিশ্চয়ই কবীর চৌধুরীর কাজ। শাটল থেকে কিছু একটা ফেলেছে সে।'

খপ করে তাপসীর একটা হাত ধরে এয়ারস্ট্রিপের দিকে ছুটল রানা। 'চলো, কপ্টারে চড়ি!'

'তাতে লাভ?'

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, তাপসী। পিরামিডের ভেতর নার্ভ গ্যাসের ভ্যাট আছে, ব্রাজিলিয়ান সেনাবাহিনী না পৌঁছানো পর্যন্ত ওগুলোকে আমাদেরই পাহারা দিয়ে রাখতে হবে...'

'মেসেজ পাঠাবে কীভাবে?' আকাশের দিকে বারবার তাকাচ্ছে তাপসী।

'কপ্টারে রেডিও আছে না!'

'রানা! থামো!' হঠাৎ আঁতকে উঠল তাপসী।

'কী হলো?' তাপসীর দৃষ্টি অনুসরণ করে আকাশের দিকে তাকাল রানা।

'বিশ্বাস করো, ওটা আমাদেরকে অনুসরণ করছে!' আতঙ্কে হাঁপাচ্ছে তাপসী।

'ওরকম মনে হয়,' অভয় দিল রানা, তবে কথাটা ওরও মনে হলো—কালো বিন্দুটা ইতোমধ্যে একটা ফুটবলের আকৃতি পেয়েছে। সরাসরি যেন ওদের দিকেই নেমে আসছে ওটা।

স্থির পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। স্বর্গ থেকে খসে পড়া জিনিসটা ওদেরকে যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে আকৃতিটা পরিচিত হয়ে উঠল। তবে তা মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ডের জন্য। হ্যাঁ, ওটা ইস্পাতের তৈরি ছোট একটা ভ্যাটই। শাটলে যেগুলো ছিল, পঁচিশটার একটা। কাকতালীয়ই বটে যে ভ্যাটটা ওদের একেবারে কাছে এসে পড়ল। পড়েই বিস্ফোরিত হলো। নার্ভ গ্যাস হোক বা পানি, ছিটকে এসে বৃষ্টির মত ভিজিয়ে দিল ওদেরকে।

স্থির ও অনড় মূর্তি ওরা। এক মিনিট পর নীরবতা ভেঙে রানা বলল, 'আমরা, দেখা যাচ্ছে, পানিতেই ভিজেছি। এবার শোনা যাক তোমার গোপন কথা।'

তাপসীর তরফ থেকে প্রথমে উষ্ণ আলিঙ্গন, তারপর দীর্ঘ চুম্বন। তারপর প্রায় কৌতুকের মত কয়েকটি বাক্য। 'এবার শোনো আমার গোপন কথা। ছয়টা শাটলের সবগুলো রকেটের ফুয়েল দ্বিগুণ হারে পোড়াবার ব্যবস্থা করেছি আমি। এর মানে হলো, কবীর চৌধুরী আর তার সাইবর্গরা নিউ টার্নিং পয়েন্ট থেকে জীবনে কোনদিন আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পারবে না।'

একসঙ্গে হেসে উঠল দুজন।

***

High Quality Aohor Arsalan Scan

scan with canon

Aohor Arsalan

ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION

Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET